প্রত্যাশা • একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক • বর্ষ ১, সংখ্যা ১, এপ্রিল-জুন, ২০১০ • ১

প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

- আল কুরআনের আলোকে মানুষ
  মোহাম্মাদ জাওয়াদ রুদগার
- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াত-পূর্ব জীবন
  ড. আহমাদ রাহনূমায়ী
- জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে পাঁচটি বক্তৃতা
  শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মুতাহ্হারী
- ভাবনায় মনুষ্যজীবন
  আব্দুল কুদ্দুস বাদশা
- সুবিচার, ঐক্য ও নিরাপত্তার মধ্যে সম্পর্ক
  সাইয়্যেদ আলী আব্বাস মূসাভী
- মুসলিম বিশ্ব : একটি পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গি
  জারগেন টডেনহফার

বর্ষ ১, সংখ্যা ১, এপ্রিল-জুন, ২০১০

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু

আল্লাহর নামে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ১, সংখ্যা ১, এপ্রিল-জুন, ২০১০

সম্পাদক	:	**এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর**
সহযোগী সম্পাদক	:	**ড. জহির উদ্দিন মাহমুদ**
নির্বাহী সম্পাদক	:	**মো. আশিফুর রহমান**
উপদেষ্টামণ্ডলী	:	মোহাম্মদ মুনীর হুসাইন খান
		মোহাম্মাদ আব্দুল কুদ্দুস বাদশা
		এস.এম. আশেক ইয়ামিন
প্রকাশক	:	মো. আশিকুর রহমান
প্রকাশকাল	:	বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১৭ বাং
		জমাদিউল আউয়াল-রজব ১৪৩১ হি.
		এপ্রিল-জুন ২০১০ ইং
মূল্য	:	৫০ (পঞ্চাশ) টাকা
যোগাযোগের ঠিকানা :		২৯৯, গাউসুল আযম মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
ই-মেইল	:	prottasha.2010@yahoo.com

Prottasha

Vol. 1, No. 1, April-June, 2010

Editor	:	A.K.M. Anwarul Kabir
Associate Editor	:	Dr. Zahiruddin Mahmud
Executive Editor	:	Md. Asifur Rahman
Advisors	:	Mohammad Munir Hossain Khan
		Mohammad Abdul Quddus Badsha
		S.M. Asheque Yamin
Publisher	:	Md. Ashiqur Rahman
Published on	:	Baishakh-Ashar 1417
		Zamadiul Awwal-Razab 1431
		April-June 2010
Price	:	50 (Fifty) Taka
Address	:	299, Gausul Azam Market, Nilkhet, Dhaka-1205
E-mail	:	prottasha.2010@yahoo.com

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৫

আল কুরআনের আলোকে মানুষ ১৩

মোহাম্মাদ জাওয়াদ রুদগার

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াত-পূর্ব জীবন ২৩

ড. আহমাদ রাহনূমায়ী

জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে পাঁচটি বক্তৃতা ৪৩

শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মুতাহ্হারী

ভাবনায় মনুষ্যজীবন ৭১

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

সুবিচার, ঐক্য ও নিরাপত্তার মধ্যে সম্পর্ক ৮৫

সাইয়্যেদ আলী আব্বাস মূসাভী

মুসলিম বিশ্ব : একটি পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গি ১০৬

জারগেন টডেনহফার

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Prottasha

A Quarterly Journal of Human Development
Vol. 1, No. 1, April-June, 2010

S`akd ne Bnmsdmsr

Editorial 5

Man in the light of Quran 13
Mohammad Zawad Rudgar

Life of the Prophet (S.A.) before starting the Mission 23
Dr. Ahmad Rahnamaei

Goal of life – Five Lectures 43
Shaheed Ayatullah Murtaza Mutahhari

Human life in Thought 71
Abdul Quddus Badsha

Relationship among Justice, Unity and Security 85
Sayyed Ali Abbas Musavi

The Muslim World : An Unbaised Perspective 106
Jurgen Todenhofer

গ্রাহক চাঁদার হার		
	প্রতি কপি	বাৎসরিক
ডাকযোগে (পোস্টাল চার্জ সহ)	৬০ টাকা	২৪০ টাকা

ডাকযোগে পত্রিকা পেতে গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার করে নিচের ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে :

মো. আশিফুর রহমান
বাড়ী নং-৪ (পশ্চিম পাশ, নিচতলা), রোড নং-৩, ব্লক সি, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সম্পাদকীয়

মানব-পরিচিতির সংকট

মানবেতিহাসের সকল পর্যায়ে সকল সমাজে স্রষ্টা, মানুষ ও বিশ্ব এ তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে মানুষের চিন্তা আবর্তিত হয়েছে। দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের মনে এ তিনটি বিষয়ে মৌলিক প্রশ্নসমূহের উদ্রেক হয়েছে এবং তাঁরা এর জন্য সঠিক ও উপযোগী উত্তর খুঁজে পেতে প্রয়াস চালিয়েছেন। এ তিন বিষয়ের মধ্যে মানব-পরিচিতি ও মানুষের মধ্যে বিদ্যমান রহস্যের জট উন্মোচন তাঁদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মনীষীদেরকে এ বিষয়ে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করেছে। সকল ঐশী ধর্মে বিশেষত ইসলাম ধর্মে মহান আল্লাহ্‌র পর মানুষ সবচেয়ে আলোচিত সত্তা এবং তার প্রতিই সকল দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। এমনকি জগৎ সৃষ্টি, নবিগণকে প্রেরণ ও ঐশী গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণকরণ এ সকল কিছুই মানুষকে তার চূড়ান্ত সাফল্য ও পূর্ণতায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়েছে। যদিও কুরআনী বিশ্বদৃষ্টিতে সকল কিছুই মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং কোনো কিছুই তাঁর পাশাপাশি স্থান পেতে পারে না তদুপরি জাপানী মনীষী তোশি হিকো ইজুটসুর সাথে সুর মিলিয়ে বলা যেতে পারে : সমগ্র বিশ্বকে যদি একটি বৃত্তের রূপে চিত্রায়িত করা হয় তবে কুরআনের দৃষ্টিতে এ বৃত্তের দু'টি বিন্দু যা তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে তার একটি ওপরে (স্রষ্টা) এবং একটি নিচে (মানুষ) অবস্থান করছে।[১] অন্যদিকে মানবজাতির জ্ঞানের ইতিহাসের প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত যদিও মানুষ মানব-পরিচিতির ক্ষেত্রে ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছে, কিন্তু বিখ্যাত দার্শনিক ও মনীষীরাও স্বীকার করেছেন যে, মানব অস্তিত্বের বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটন ও মানব সম্পর্কিত অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য তাঁরা যে সকল পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার করেছেন তা মানুষের পূর্ণ ও সঠিক পরিচয় দানে সক্ষম হয়নি। তাই মানুষ যে অচেনা এক অস্তিত্ব এবং বিশ্ব যে মানব-পরিচিতির সংকটে ভুগছে তাঁরা তা স্বীকার করছেন।

মানব-পরিচিতির সংকট ও তার বিভিন্ন দিক

ইউরোপে রেনেসাঁর পর থেকে মানব অস্তিত্বের বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটনে ব্যাপক চিন্তাগত প্রচেষ্টা ও গবেষণা চালানো হয়েছে এবং এ বিষয়ে অসংখ্য উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। যদিও এ উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, কিন্তু তন্মধ্যে পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষালব্ধ উপাত্তের ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করা হয়েছে। তাই বলা যেতে পারে, বর্তমান মানব-পরিচিতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণানির্ভর। বর্তমানে মানব-পরিচিতির

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসংখ্য উপাত্ত রয়েছে যা মানব অস্তিত্বের অনেক অন্ধকার দিককে গবেষণার আওতায় এনেছে। কিন্তু এ গবেষণা মানব অস্তিত্বের অচেনা দিকগুলোকে যথার্থভাবে উদ্ঘাটনে এবং মানুষের সামনে বিদ্যমান সমস্যার সমাধানে সক্ষম হয়নি, এমনকি এ পদ্ধতি ও জ্ঞান নিজেই সংকটের সম্মুখীন হয়েছে।[২]

জ্ঞানের কোনো একটি শাখায় সংকটের অর্থ হলো ঐ জ্ঞান যে সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে তার সমাধানে ব্যর্থ হওয়া। মানব-পরিচিতির ওপর সার্বিক দৃষ্টি দিলে স্পষ্ট হয় যে, এ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সংগৃহীত উপাত্তসমূহ সংকটগ্রস্ত। জার্মান দার্শনিক ও নৃতত্ত্ববিদ ম্যাকস শেলার বলেন :

> 'মানবেতিহাসের কোনো সময়েই... বর্তমানের ন্যায় মানুষ নিজের জন্য এতটা সমস্যা বলে পরিগণিত হয়নি... জ্ঞান দিন দিন বিশেষায়িত ও বিভাজিত হচ্ছে এবং জ্ঞানের শাখা প্রতিদিনই বাড়ছে, কিন্তু মানব-পরিচিতির সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের সামনে মানুষের সত্তার অজ্ঞাত দিক সম্পর্কে পর্দা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।'[৩]

বর্তমানে মানব-পরিচিতির সংকটকে চার ভাগে ভাগ করা যায় : মানব-পরিচিতি সংক্রান্ত তত্ত্ব ও মতবাদগুলোর মধ্যে অসংলগ্নতা ও অন্তর্গত দ্বন্দ্ব, সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর মানদণ্ডের অভাব, মানুষের অতীত ও ভবিষ্যতকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখা এবং মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ব্যাখ্যায় অক্ষমতা।

ক. তত্ত্বসমূহের মধ্যে অসংলগ্নতা ও অন্তর্গত দ্বন্দ্ব

যদিও পাশ্চাত্য মনীষীদের দাবী হলো তাঁরা মানুষের যে চিত্র তুলে ধরেছেন এবং এ সম্পর্কে যে মত ব্যক্ত করেছেন– এ তত্ত্বসমূহ অভিজ্ঞতালব্ধ উপাত্ত ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের ওপর নির্ভরশীল এবং বাস্তবতা থেকে গৃহীত, কিন্তু এ মতবাদসমূহ এ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা প্রদান করে তাতে দেখা যায় মানুষের প্রকৃতিগত ঐক্যের বিষয়টি অজ্ঞাত এবং এতে মানুষ সম্পর্কে বিভিন্নরূপ চিত্রের এক সমষ্টির আমরা মুখোমুখি হই যার মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব নয়।[৪] যেমন আমরা যদি বি. এফ. স্কিনারের ন্যায় Social Behaviourist, কার্ল মার্কসের ন্যায় অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী এ্যামিল দুরখিম এর ন্যায় প্রকৃতি বা নিসর্গবাদের অনুসারী (Naturalist) এবং জ্যাঁ পল সাঁত্রের ন্যায় অস্তিত্ববাদীদের দৃষ্টিতে মানুষের স্বাধীনতা ও ইচ্ছাশক্তির বিষয়টি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব এ বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, এমনকি সেগুলো পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক। Social Behaviorists বিশেষত Skinner মানুষের স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন।[৫] মার্কস মানুষের স্বাধীনতাকে ঐতিহাসিক অনিবার্যতা (historical determinism) এবং উৎপাদনের সম্পর্কের অধীন বলেছেন।[৬] দুরখিমের মতে মানুষের ইচ্ছাশক্তি সামাজিক ও সামষ্টিক বিবেকের (collective conscience) বাধ্যবাধকতার অনুগামী।[৭] নিসর্গবাদীরা মানুষের ওপর পরিবেশগত উপাদানের অলঙ্ঘনীয় প্রভাবের কথা বলছেন।[৮] জ্যাঁ পল সাঁত্রে মানুষের এমন বন্ধনহীন স্বাধীনতার

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কথা বলেছেন যা তার পরিবেশগত উপযোগিতাকে ছাড়িয়ে প্রকৃতি জগতের অপরিবর্তনীয় বিধানকে পদদলিত করতে পারে।[৯] ম্যাকস শেলার এক্ষেত্রে বলেন :

> 'বর্তমানে এমনকি বিজ্ঞানভিত্তিক ও অভিজ্ঞতানির্ভর নৃতত্ত্ব (মানব-পরিচিতি) ও মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা পরস্পরের বিপরীত মত প্রদান করছে এবং একে অপরের মতের প্রতি উপেক্ষার ভাব দেখাচ্ছে। তাদের কাছে মানুষের একক কোনো ধারণা ও চিত্র নেই।'[১০]

খ. সর্বজনগ্রাহ্য ও কার্যকর মানদণ্ডের (ও বিচারকের) অভাব

প্রকৃতিবিজ্ঞানের যে সকল নীতি প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের প্রায় সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য তার অন্যতম হলো পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতি যদিও এর কার্যকারিতার বিষয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশ্ন রয়েছে। কিন্তু এর বিপরীতে মানবিক বিজ্ঞানের–আর্নেস্ট কেসিরারের মতে–একটি শাখার মধ্যেও এমন কোনো মৌলনীতি খুঁজে পাওয়া যাবে না যে ব্যাপারে সকলের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে।[১১] তাই এক্ষেত্রে একটি কার্যকর মানদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, যদিও বর্তমানের প্রত্যেক নৃবিজ্ঞানীই দাবি করেন যে, তিনি বাস্তবনির্ভর ও পরীক্ষাযোগ্য প্রামাণ্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মত প্রদান করছেন, কিন্তু স্বয়ং বৈজ্ঞানিক এ পদ্ধতি যা বিশ্লেষণের চূড়ান্ত মানদণ্ড বলে গণ্য হয়ে থাকে তা গবেষকের সামনে বৈপরীত্যসম্পন্ন উপাত্তসমূহ উপস্থাপন করে। এ বিষয়টি প্রমাণ করে স্বয়ং এ পদ্ধতি এ বৈপরীত্যের সমাধান দানে সক্ষম নয় এবং এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের উপযোগিতা রাখে না। এ কারণেই পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের অনেকেই অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষানির্ভর পদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে, এমনকি যে ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ে একই ধরনের উপাত্ত সকল গবেষকের হস্তগত হয় সেক্ষেত্রেও সঠিক ও একক সিদ্ধান্তে পৌঁছার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন। এজন্যই তাঁরা প্রপঞ্চভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Phenomenological Method) অবলম্বনের পক্ষপাতি এবং স্বয়ং বিষয়সমূহকে অনুধাবনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

গ. মানুষের বিশ্লেষণে অতীত ও ভবিষ্যতকে উপেক্ষা ও বর্জন

বর্তমানের অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানভিত্তিক নৃতত্ত্ব মানুষকে সম্পূর্ণরূপে বস্তুনির্ভর এক সত্তা বলে পরিচিত করিয়েছে যার মধ্যে অবস্তু ও পর বস্তু (Metaphysics) বলে কোনো কিছু নেই। মানব-পরিচিতির ক্ষেত্রে বর্তমান মনস্তত্ত্ববিদ্যা মানুষের সমগ্র কর্মকাণ্ড ও তার পেছনে বিদ্যমান উদ্দীপনার কারণকে বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে উৎসারিত বলছে। জ্ঞান ও পরিচিতিবিদ্যা বুদ্ধিবৃত্তিকে অস্বীকার করে যুক্তির ভিত্তিকে ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির সীমায় সীমায়িত করেছে। মানব-পরিচিতির অঙ্গনে সংঘটিত এ বিভ্রান্তি মানুষকে তার উৎস (আল্লাহ্) থেকে যেমন বিচ্ছিন্ন করেছে তেমনি তার ভবিষ্যৎ দৃষ্টিকেও করেছে সীমিত। ফলে তার জীবনের পরিধি বস্তু থেকে উৎপত্তি ও বস্তুতে বিনাশে পর্যবসিত

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হয়েছে। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ তার অতীত সর্ম্পকেও উদাস ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও নির্লিপ্ত। যেহেতু এ দর্শন অপার্থিব ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে বিশ্বাসী নয় সেহেতু চায় মানুষ তার অসীম চাওয়া-পাওয়াকে এ স্বল্পকালীন জীবনে লাভ করুক, অথচ মানুষের পক্ষে সীমিত সুবিধার এ বিশ্বে তার এ অবান্তর আশায় পৌঁছানো কখনই সম্ভব নয়। এমনকি এ সংক্ষিপ্ত সময়ের জীবনে যতটুকু আনন্দ লাভ ও সফলতার যে পর্যায়ে পৌঁছা সম্ভব মানুষ তার সীমিত জ্ঞানের কারণে ততটুকু অর্জনেও সক্ষম নয়। উপরন্তু মানুষের সকল চাহিদা তার বস্তুগত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার আত্মিক চাহিদাও রয়েছে যা বস্তুগত উপকরণে পূরণ হয় না এবং তা পূরণের জন্য বস্তুর ঊর্ধ্বের উপকরণের প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়গুলোই মানুষের সাথে অস্তিত্ব জগতের সম্পর্ককে রূপায়িত করে।

মানুষকে তার উৎসমূল থেকে বিচ্ছিন্ন করলে সে পরিচিতির ক্ষেত্রে সংকটে পতিত হবে। কারণ, বিশ্বজগতে বিদ্যমান সকল দৃশ্যমান বস্তু ও বিষয়কে সে যে মাধ্যম দিয়ে চিনতে চায় সে নিজেই সে মাধ্যমের সঙ্গে পরিচিত নয় ও তার সকল দিক সম্পর্কে অবগত নয়। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষ যখন নিজের পরিচয় সম্পর্কে অনবহিত তখন কীভাবে সে বিশ্ব সম্পর্কে তার পরিচয়কে সঠিক বলে দাবী করবে। মানুষ তখনই নিজের সঠিক পরিচয় লাভে সক্ষম হবে যখন সে এমন সত্তা থেকে নিজের পরিচয় সম্পর্কে জানবে যে তার বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত, ঐ সত্তা থেকে নয় যে নিজেই নিজের সম্পর্কে অনবহিত।

মোট কথা, অভিজ্ঞতালব্ধ নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে মানুষ প্রকৃতিতে বিদ্যমান অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের ন্যায় একটি বস্তু যার স্থায়িত্ব ও অসীম কোনো লক্ষ্য নেই। কিন্তু যদি প্রকৃতই মানুষ চিরন্তন এক সত্তা হয়ে থাকে এবং তার অসীম লক্ষ্য থাকে ও মৃত্যুর মাধ্যমে তার বিনাশ না ঘটে–বাস্তবেও তা এরূপ–তাহলে শুধুই বস্তুনির্ভর তত্ত্বের ভিত্তিতে মানুষের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং এ বিশ্বের সাথে তার সম্পর্কের বিষয়কে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তেমনি অস্তিত্বজগতে যদি বস্তু জগতের ঊর্ধ্বের এক জগৎ থাকে এবং সে জগৎ মানুষের জীবনের ভাগ্য নির্ধারণে (তার কর্মের ভিত্তিতে) প্রভাব রাখে ও ভূমিকা পালন করে সেক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাভিত্তিক নৃতত্ত্ব ও মানব পরিচিতি বিজ্ঞান মানুষকে আদৌ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয়।

ঘ. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানবীয় উপাদানকে ব্যাখ্যায় অক্ষমতা

বর্তমান মানব-পরিচিতি বিষয়ক মতবাদসমূহ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক উপাদানকে ব্যাখ্যা করতেও অক্ষম এবং এক্ষেত্রে সংকটের মুখোমুখি। ভাষা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি মানবীয় ও সামাজিক উপাদান যার গুরুত্ব এত অধিক যে, নৃবিজ্ঞানের কোনো কোনো মনীষী মনে করেন, যে মতবাদ ভাষাকে উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করতে পারবে সে মতবাদ মানব সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়কে বিশ্লেষণে সক্ষম। অথচ বর্তমান মানব-পরিচিতির ক্ষেত্রে গবেষণারত মতসমূহ ভাষার অনেক দিককেই ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয়। যেমন, যে সকল বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন মানুষ প্রকৃতিতে বিদ্যমান উন্নততর এক যন্ত্র বিশেষ (যার কর্মক্রিয়া যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সংঘটিত হয়) অথবা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মানুষ বিবর্তিত উন্নত এক প্রাণী তারা কীভাবে মানুষের ভাষার মাধ্যমে–শব্দগঠন, শব্দ বিন্যাস ও নতুন অর্থগত কাঠামো থেকে–এমন বিষয়কে বোঝার ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করবে যা সে প্রথম বারের মতো শুনছে। সুতরাং এ ধরনের কাঠামোকে বুঝতে তার পেছনে মানুষের সৃষ্টিশীল চিন্তার যে ভূমিকা রয়েছে তাকে ব্যাখ্যা করা এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অসম্ভব ব্যাপার। মানুষ অন্যের বক্তব্য বুঝতে ও নিজের বক্তব্য বুঝাতে যে ব্যাপক হারে প্রতীকের ব্যবহার করে ও সাহায্য নেয় তা অন্য সকল প্রাণীর ভাব আদান-প্রদানের ধ্বনির অনেক ঊর্ধ্বের বিষয়। সাংকেতিক ধ্বনি, রূপক শব্দ, ভাষার আলংকারিক দিক এ সবই ভাষার একেকটি মাত্রা যার রহস্যময়তার পর্দা অনুন্মোচিত। নোয়াম চমোস্কি বলেন :

> 'সৃষ্টিশীলতা, শৈল্পিক কাঠামো ও বুনট মানুষের ভাষার বৈশিষ্ট্য। আমরা সকলেই কথা বলতে পারি এবং অভিধান ও ব্যাকরণ রীতির সাহায্যে আমরা এমন বাক্যমালার অর্থও বুঝি যার বিষয়বস্তু ইতোপূর্বে কখনও শুনিনি। এ বিশেষত্বের কারণে মানবীয় ভাষার স্বরূপ অন্যান্য প্রাণীর পরিচিত সকল আচরণ থেকে ভিন্ন একটি বিষয়।'[১২]

ইসলামে মানব-পরিচিতির বৈশিষ্ট্যসমূহ

ধর্ম বিশেষত ইসলামভিত্তিক মানব-পরিচিতি তার স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্যান্য মানব-পরিচিতি জ্ঞানের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। এখানে আমরা এরূপ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করব।

ক. পূর্ণতা ও সামগ্রিকতা

ধর্মভিত্তিক মানব-পরিচিতি মানুষের পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তি ছাড়াও ঐশী প্রত্যাদেশের সাহায্য গ্রহণ করে। যেহেতু ঐশী প্রত্যাদেশভিত্তিক জ্ঞান ও পদ্ধতির কোনো সীমাবদ্ধতা নেই বরং সকল বিষয়ের জ্ঞানকে শামিল করে সেহেতু অন্যান্য পদ্ধতির ন্যায় এককেন্দ্রিক ও অপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির দোষে দুষ্ট নয়।

সর্বব্যাপী ও সামগ্রিকতার এ বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামভিত্তিক মানব-পরিচিতি যখন মানুষের বিশেষ একটি দিক নিয়ে কথা বলে তখনও মানব অস্তিত্বের সার্বিক দিককে তার দৃষ্টিতে রাখে, ফলে মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল মত উপস্থাপন করে। কারণ, এ পরিচিতির উপস্থাপক স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা যিনি পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। ইসলাম কর্তৃক উপস্থাপিত মানব-পরিচিতি মানুষের দৈহিক, জৈবিক, পরিবেশগত, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, পার্থিব, উৎপত্তি ও পরিণতিগত, আবেগ ও উদ্দীপনা, আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা, বস্তুগত ও অবস্তুগত চাহিদা, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও পারলৌকিকসহ সকল দিককে শামিল করে। এ পদ্ধতি উল্লিখিত বিষয়গুলোর কোনো কোনোটির ক্ষেত্রে মানব পরিচিতির এমন অনেক দিককে উন্মোচিত করে অন্য কোনো পদ্ধতির মাধ্যমে যা অর্জন করা সম্ভব

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নয়। ইসলামের মানব-পরিচিতিতে মানুষের বিভিন্ন দিককে ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উপস্থাপন করা হয় এবং প্রতিটি দিকের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখা হয় যে, তা মানুষের প্রকৃত সৌভাগ্য ও সফলতা অর্জনের পথে কতটুকু ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু একই সাথে অন্যান্য দিকগুলোর প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয় (অর্থাৎ সেগুলোকেও খর্ব করা হয় না) যাতে সামগ্রিকতা ও পূর্ণতার বিষয়টিও প্রয়োজন অনুযায়ী সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও পর্যবেক্ষণমূলক পরিচিতি ও জ্ঞানে মানুষকে একটি দৃষ্টিকোণ থেকেই শুধু দেখা হয় এবং অন্য প্রকার মানব-পরিচিতির সাথে সম্পর্কিত ক্ষেত্র এর পরিধির বাইরে থাকে।

খ. নির্ভুলতা ও স্থায়িত্ব

ধর্মীয় বিশেষত ইসলামী মানব-পরিচিতি ওহী বা ঐশী প্রত্যাদেশনির্ভর এবং এ উৎসটি ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে। সেহেতু এ ধরনের মানব-পরিচিতি স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার অধিকারী। কিন্তু মানব-পরিচিতির পদ্ধতির মধ্যে দার্শনিক, অভিজ্ঞতানির্ভর মানব-পরিচিতি, এমনকি দিব্যদৃষ্টি ও অন্তঃকরণ দ্বারা অর্জিত আধ্যাত্মিক পদ্ধতিও এরূপ দৃঢ়তা ও নির্ভুলতার দাবি করতে পারে না। ইসলামী মানব-পরিচিতিতে যদি উপস্থাপিত বিষয়টি ইসলামের স্বীকৃত ও নির্ভরযোগ্য উৎস হতে গৃহীত হয় এবং অকাট্যভাবে তাকে ইসলামী বলে দাবি করা যায় তবে নিঃসন্দেহে তাকে নির্ভুল ও সঠিক বলা যায়। কিন্তু মানব-পরিচিতির অন্যান্য উৎস যদিও পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক উপাত্ত অথবা বুদ্ধিনির্ভর অথবা আধ্যাত্মিক চর্চার মাধ্যমে অর্জিত তদুপরি ভুলের সম্ভাবনাকে নাকচ করা যায় না।

গ. মানুষের সৃষ্টির উৎস ও শেষ পরিণতির প্রতি দৃষ্টি দান

ধর্মহীন মানব-পরিচিতিতে হয় মানুষকে তার উৎসমূল ও চিরস্থায়ী গন্তব্যের বিষয় দু'টি থেকে বিচ্ছিন্ন করে খণ্ডিত রূপে দেখা হয় যেমনটি বিজ্ঞানভিত্তিক ও অভিজ্ঞতানির্ভর মানব-পরিচিতি এবং বস্তুবাদী দর্শন ও কোনো কোনো আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় লক্ষণীয় অথবা মানুষের উৎপত্তি ও পরিণতির বিষয়কে এতটা সার্বিকভাবে দেখা হয় যে, তার জীবন যাত্রার পদ্ধতি ও পূর্ণতায় পৌঁছার পথ অস্পষ্ট পরিগণিত হয় যা ব্যবহারিক জীবনে কোনো ফল দান করে না। কিন্তু ইসলামের মানব-পরিচিতিতে মানুষের উৎসমূল ও শেষ গন্তব্য এ দু'টি মৌলিক দিকের প্রতিই দৃষ্টি দান ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং মানুষের বর্তমান জীবনের সাথে সৃষ্টির উৎসমূল ও শেষ পরিণতির সম্পর্কের বিষয়টিকে খুঁটিনাটি দিকসহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই মুসলিম দার্শনিকরা নবী প্রেরণের অপরিহার্যতার সপক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে জানার আবশ্যকতা, মানুষের সৌভাগ্য ও সফলতার পথে অবশ্যকরণীয় ও বর্জনীয় বিষয় সম্পর্কে অবগতির অপরিহার্যতা এবং ঐ বিষয়গুলো অনুধাবনে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়নির্ভর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের পক্ষে অক্ষমতার প্রমাণসমূহের ওপর এ মানব-পরিচিতির তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।[১৩]

ঘ. কাঠামোগত পূর্ণতা

ইসলামী মানব-পরিচিতির অন্যতম শ্রেষ্ঠত্ব এটা যে, এ দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের অস্তিত্বগত বিভিন্ন দিক ও ক্ষেত্রের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়েছে।

এ দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের অস্তিত্বের বিভিন্ন দিকের মধ্যে সম্পর্ক একটি সার্বিক কাঠামোতে সুন্দরভাবে স্থাপিত ও চিত্রায়িত হয়েছে। এ কাঠামোতে মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, দেহ ও মন, বস্তুগত ও অবস্তুগত, দৈহিক ও আত্মিক, দৃষ্টিভঙ্গি, ঝোঁক-প্রবণতা, আচরণ ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগত সম্পর্ক ও প্রভাবের প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। কিন্তু দর্শন, বিজ্ঞান, সুফিবাদী ও অন্যান্য মানব-পরিচিতিতে এ দিকগুলোর মধ্যে সম্পর্কের বিষয়কে হয় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয় অথবা যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টি দেয়া হয় না অথবা শুধু কয়েকটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দিকের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দান ও অন্য দিকগুলোকে উপেক্ষা ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করে এবং মানুষকে খণ্ডিত ও বিকৃত রূপে উপস্থাপন করে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. Toshihiko Isutsu, God and Human in Koran;

২. বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকে এ বিষয়টি পাশ্চাত্য মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। হোসেরেল প্রথম বারের মতো মানব-পরিচিতির ক্ষেত্রে সংকটের বিষয়টি উপস্থাপন করেন। তিনি ১৯৩৫ সালের মে মাসে ভিয়েনায় 'ইউরোপে মানব-পরিচিতির সংকটে দর্শন' শীর্ষক এক বক্তব্য প্রদান করেন। ইতোপূর্বে ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বরে প্রাগে তিনি 'মনোবিজ্ঞান ও ইউরোপীয় জ্ঞানের সংকট' বিষয়ে একটি বক্তব্য দান করেছিলেন যা তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৪৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়;

৩. Max Scheler, lasituation de l' hommo dans la monde;

৪. Ernest Cassirer, Philosophy and Culture;

৫-৯. George Ritzer, Contemporary Sociological Theory;

১০. Ernest Cassirer, Philosophy and Culture;

১১. Max Scheler, lasituation de l' hommo dans la monde;

১২. Lesly Stevenson, Seven Theories about Human Nature;

১৩. মোহাম্মাদ তাকী মেসবাহ ইয়াযদি, রাহ্ ওয়া রাহ্নামা শেনাসি।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আল কুরআনের আলোকে মানুষ

মোহাম্মাদ জাওয়াদ রুদগার*

অনুবাদ : এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর

সার সংক্ষেপ

আল কুরআনের আলোকে উদ্বুদ্ধ মানুষ জ্ঞান ও পরিচিতিবিদ্যা (Epistemology) এবং অস্তিত্ববিদ্যার (Ontology) দৃষ্টিকোণ থেকে ঐশী প্রত্যাদেশের (ওহী) স্বচ্ছ আয়নায় নিজের অস্তিত্ব ও সত্তাকে অনুসন্ধান করে। তার আত্মপরিচিতির শুরু 'আল্লাহ্ থেকে' এবং শেষ হলো 'আল্লাহ্য়'। তার যাত্রার উদ্দেশ্যও হলো আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ লাভ এ অর্থে যে, এ ধরনের মানুষ ঐশী প্রকৃতি, একত্ববাদী প্রবণতা ও স্বর্গীয় সত্তার অধিকারী। তাই কুরআনী মানুষ খোদা প্রত্যাশী ও ঐশী চিন্তার অধিকারী জীবিত সত্তা এবং সৃষ্টিগত (তাকভীনী বা বাধ্যতামূলকভাবে) ও বিধানগত (তাশরিয়ী বা স্বাধীনভাবে) উভয় ক্ষেত্রে সত্তাগত পূর্ণতাকামী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সে অভ্যন্তরীণ ও বহির্জগতকে একই সঙ্গে পর্যায়ক্রমে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে। কারণ, সে আল্লাহ্র খলিফা (প্রতিনিধি), ঐশী আমানতের রক্ষক এবং ঐশী সৌন্দর্য ও শক্তিমত্তার নামকে ধারণ ও বহন করে। তাই সে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর শরীয়তের রশ্মিতে নিজেকে আলোকিত করে ও সকল অন্ধকার থেকে নিজেকে সংরক্ষিত রাখে। সে ওহী ও বুদ্ধিবৃত্তির অনুমোদিত পথে সার্বক্ষণিকভাবে নিজেকে গঠনের পথে নিয়োজিত রাখে যাতে ঐশী চরিত্র ও কুরআনী বৈশিষ্ট্যে নিজেকে অলংকৃত করতে পারে।

এ ধরনের মানুষ চিন্তাপ্রবণ, বুদ্ধিনির্ভর, আত্মসচেতন, আত্মগঠিত, চিরন্তন পবিত্র জীবনের অধিকারী, স্রষ্টার উপাসক ও তাঁর প্রতি নিবেদিত, সঠিক জ্ঞানের অধিকারী, সৎ, উপযুক্ত, কর্মশীল এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের সকল দিকে ভারসাম্য রক্ষাকারী।

---

* লেখক ইরানের ইসলামী উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালযের শিক্ষক

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আলোচ্য প্রবন্ধটি কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের সত্তাগত পরিচয় তুলে ধরেছে, এ ধরনের মানুষের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ও তার কেন্দ্রীয় কাঠামোকে কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে যাতে করে মানুষের পরিচয়, পূর্ণতাকামিতা, নৈতিকতা ও প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ দিকসমূহ ওহীর আলোকে সকলের সামনে স্পষ্ট হয় এবং তার ভিত্তিতে সচেতন ও দায়িত্ববোধ সম্পন্ন মানুষ সর্বোত্তম সৃষ্টি ব্যবস্থায় তার প্রকৃত অবস্থান ও পথ খুঁজে পায় ও নিজেকে সেভাবে আলোকিত করতে পারে।

ভূমিকা

কুরআনী চিন্তাধারা অনুসারে মানুষ শারীরিক ও আত্মিক উভয় দিক দিয়ে সর্বোত্তম আকৃতি ও গঠনে সৃষ্ট। (সূরা তীন : ৪) স্বয়ং স্রষ্টা তাঁর ঐশী হাতে (সূরা সাদ : ৭৫) তার রূপ দিয়েছেন যাতে সে তাঁর সকল সৌন্দর্য ও শক্তিমত্তার নাম ও গুণবাচক বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে পারে। মানুষ ব্যতীত সকল সৃষ্টি, যেমন স্থায়ী ও অস্থায়ী জগৎ (পরজগৎ ও ইহজগৎ), ফেরেশতা ও বস্তুজগৎ, দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ সকল কিছু তার (মানুষের) উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকৃতি ও অতি প্রাকৃতিক, ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়, বস্তু ও অবস্তু জগতের প্রতিফলন তার মধ্যে ঘটেছে। তুচ্ছ কাদা মাটি থেকে ঐশী আত্মার সমন্বয় মানুষের অস্তিত্বে ঘটেছে। আল্লাহ্ বলেন : 'অতঃপর যখন তার গঠন কার্য সুসম্পন্ন করি তখন নিজের আত্মা থেকে তাতে ফুঁকে দেই' (সূরা হিজর : ২৯ ও সূরা সাদ : ৭২) যাতে মানুষ তার সত্তাগত পূর্ণতায় পৌঁছার মাধ্যমে ঐশী সত্য ও বাস্তবতাকে ধারণের যোগ্যতা লাভ করে। এরূপ ঐশী সম্পদ লাভের কারণে মানুষ সৃষ্টির মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক অবস্থানে পৌঁছায়। তখন সে সৃষ্টজগতের সকল রহস্য অনুধাবন ও সকল নাম আল্লাহ্র নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করে– 'তিনি আদমকে সকল নাম শিক্ষা দান করলেন।' (সূরা বাকারা : ৩১)।

মানুষ একদিকে ওহীর মাধ্যমে তার অস্তিত্বের রূপকে চিনতে পারে অন্যদিকে এমন এক প্রকৃতির (ফিতরাতের) অধিকারী যা অদ্বিতীয় ও অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এ দুই ব্যতিক্রমী ও অতি প্রাকৃতিক সম্পদ কেবল মানুষকেই দেয়া হয়েছে। কুরআন মানুষকে আল্লাহ্র প্রতিনিধি ও তার আমানতের সংরক্ষক হিসাবে পরিচিত করিয়েছে যাতে মানুষ তার প্রকৃত মর্যাদাকে যথার্থ ও গভীরভাবে অনুধাবন করে। পবিত্র কুরআন মানব-পরিচিতি ও মানুষ তৈরির পূর্ণতম গ্রন্থ যা সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে (সূরা মুমিনূন : ১৪) ব্যাখ্যা করা, শিক্ষা দান ও প্রশিক্ষিত করার সর্বোত্তম বাণী (সূরা যুমার : ২৩) নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এ গ্রন্থে সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় পথনির্দেশনা (সূরা বনি ইসরাইল : ৯) সুন্দরতম গঠনের সৃষ্টির জন্য বর্ণিত হয়েছে। এ মানুষের মধ্যে যেমন সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বিষয় (পবিত্র কুরআনের মুহকাম বা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াতের ন্যায়) রয়েছে তেমনি তার মধ্যে অস্পষ্ট বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যামূলক বৈশিষ্ট্যও (কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াতের ন্যায়) রয়েছে। মানুষের অস্তিত্বের প্রাকৃতিক ও প্রবৃত্তিগত (জৈবিক) দিক যা তার অস্পষ্ট

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ও বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যাকারী দিক তাকে তার অস্তিত্বের সুদৃঢ় ও দ্ব্যর্থহীন ঐশী প্রকৃতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে ওহীর ভিত্তিতে মানুষকে চেনার ক্ষেত্রে কোনো রূপ শূন্যতা, অস্পষ্টতা ও ঘাটতি না থাকে। মানুষ কুরআনের আলোতে তার করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়কে জানবে এবং তার সত্তাগত রূপ ওহীর মধ্যে অনুসন্ধান করবে। কারণ, মানুষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যাখ্যা কুরআনের আলোয় বাস্তবরূপে আবির্ভূত হয়।'[১]

মানুষের পরিবর্তন, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও পূর্ণতার উপকরণসমূহ সম্পর্কে জানতে চাইলে মানুষের সত্তাগত পরিচয় ও অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে জানতে হবে। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না জানব যে, মানুষ কী এবং তার অস্তিত্ব ও সত্তাগত পরিচয় কী, ততক্ষণ তার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রবণতা ইত্যাদির প্রকৃতি ও ধরন নির্ধারণে সক্ষম হবো না। মোট কথা, মানুষের জ্ঞান, কর্ম ও ব্যবহারিক বিকাশ ও আত্মগঠনের জন্য তার পরিচয় লাভ অপরিহার্য। বর্তমান পৃথিবীতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যে বিভিন্নতা (চিন্তাগত, কাঠামোগত ও পরিকল্পনাগত রূপে) লক্ষ্য করা যায় তার মূলে রয়েছে মানুষ সম্পর্কে প্রত্যেক চিন্তাধারার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। তাই এক্ষেত্রে সর্বোত্তম হলো মানুষের পরিচয়কে তার সৃষ্টিকর্তার বাণী থেকে উদ্‌ঘাটন করা। এ উদ্দেশ্যেই মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি বিশ্বাসীদের উদ্দেশে বলেছেন : 'হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের নিজেদের (সম্পর্কে জানা ও আত্মগঠনের) দায়িত্ব তোমাদের ওপরই ন্যস্ত' (সূরা মায়েদা : ১০৫)। অর্থাৎ তোমাদের অস্তিত্বের গভীরে অনুসন্ধান কর এবং নিজেদের সম্পর্কে জ্ঞানগত ধারণা অর্জন ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে স্বীয় বাস্তব রূপকে দর্শন কর যাতে তোমাদের সঠিক দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে পার। এ কারণেই কোনো কোনো মনীষী বলেছেন : 'আত্মপরিচিতি সবচেয়ে কল্যাণকর জ্ঞান।'[২] পূর্ণতা ও বিকাশ লাভ এবং আত্মপরিশুদ্ধির পথকে মসৃণ করার উপকরণ হলো আত্মপরিচিতি। আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমুলীর ভাষায় :

> 'এ জ্ঞান (আত্মপরিচিতির জ্ঞান) একদিকে চিন্তাগত ও তাত্ত্বিকভাবে বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ করে অন্যদিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিশুদ্ধতা দান করে।'[৩]

অতএব, মানুষের সর্বোত্তম পরিচয় দানকারী হলো পবিত্র কুরআন এবং তার সর্বোত্তম প্রশিক্ষক ও পূর্ণতা বিধায়ক হলো 'পূর্ণ মানব' যিনি ঐশী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত। যদি মানুষ নির্বাক কুরআন (ঐশী গ্রন্থ) এবং সবাক কুরআনের (পূর্ণ মানব) মাধ্যমে নিজেকে চিনে ও তাদের নির্দেশিত পথে চলে তবে সাফল্য ও সৌভাগ্য লাভ করবে। কারণ, পবিত্র কুরআন ও পূর্ণ মানব (ইনসানে কামেল) মানুষের পূর্ণতা ও বিকাশের সহযোগী (প্রভাবক) ও প্রতিবন্ধক উপাদানসমূহ, তার উত্থান ও পতন এবং পথপ্রাপ্তি ও বিচ্যুতির কারণসমূহকে সর্বোত্তমরূপে বর্ণনা করেছে।

কুরআনী পরিচয়ে মানুষ হলো ঐশী চিন্তাশীল জীবন্ত সত্তা। আরো যথার্থভাবে বলা যায় যে, সে হলো খোদাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন (চিন্তাশীল) প্রাণী। আল্লামা জাওয়াদী আমুলী মানুষ সম্পর্কিত তাঁর এ সংজ্ঞাকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন এভাবে : 'এ সংজ্ঞার ভিত্তিতে মানুষের জাতি (Genus) হলো বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী (যদিও প্রচলিত সংজ্ঞায় মানুষের জাতি 'প্রাণী' এবং উপজাতি বা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Species 'বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন বা চিন্তাশীল সত্তা' ধরা হয়ে থাকে; কিন্তু এ সংজ্ঞায় এ দুটি জাতির অন্তর্ভুক্ত গণ্য হয়েছে) যার মধ্যে মানুষ, স্বেচ্ছায় চলনশক্তির অধিকারী প্রাণীসমূহ ও উদ্ভিদ এ তিন সত্তার সমন্বয় ঘটেছে। এ সংজ্ঞায় মানুষের উপজাতি হলো 'খোদাকাঙ্ক্ষী বা প্রত্যাশী' অর্থাৎ তার মধ্যে (সত্তায়) খোদা পরিচিতি ও খোদার মধ্যে বিলীন হওয়ার বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাকে খোদাপ্রেমিকে পরিণত করেছে। পবিত্র কুরআন বুদ্ধিবৃত্তিকে মানুষের চূড়ান্ত ও পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্য বলে মনে করে না যদিও তার জন্য এ বৈশিষ্ট্যটি অপরিহার্য কিন্তু তা মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ, কোনো মানুষ যদি রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত কলা-কৌশল ও অন্যান্য ক্ষেত্রে শৈল্পিক ও সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী হয়, কিন্তু তার এ জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা তার প্রবৃত্তির সেবায় রত হয় তবে সে (হয়) চতুষ্পদ নিরীহ প্রাণী, (অথবা) চতুষ্পদ হিংস্র প্রাণী অথবা প্রাণীরূপী শয়তান (এ অবস্থায় সে প্রাণী থেকেও নিকৃষ্ট ও নিকৃষ্টতম সৃষ্টি)। সুতরাং সাধারণত যে মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন বা চিন্তাশীল প্রাণী হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় এ সংজ্ঞা এ দু'টি বৈশিষ্ট্য একত্রে তার জাতির (Genus) অন্তর্ভুক্ত ও খোদামুখিতা হলো প্রকৃতপক্ষে অন্য উপজাতি থেকে স্বতন্ত্রকারী বৈশিষ্ট্য।'[৪] যদি ইসলামী জ্ঞান বিদ্যার (Epistemology) দৃষ্টিতে মানুষের প্রকৃত পরিচয় এটিই হয় তবে সেক্ষেত্রে তার শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং পূর্ণতা ও বিকাশের পদ্ধতি যা তাকে কল্যাণ, সফলতা ও সৌভাগ্যের দিকে নিয়ে যাবে তা কি ভিন্নতর হবে? কুরআনের দৃষ্টিতে যদিও মানুষ আল্লাহ্‌র খলিফা, ঐশী আমানতের রক্ষক ও স্রষ্টার আত্মা থেকে জীবন লাভ করেছে, কিন্তু এ বৈশিষ্ট্যগুলো তার সত্তাগত নয়; বরং স্রষ্টার বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলক ও প্রকাশস্থল মাত্র। কুরআনের আলোকে আলোকিত মানুষের অস্তিত্বের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে ঐশী এবং তাকে মৌলিক বৈশিষ্ট্যের- আল্লাহ্‌র সত্তাকে প্রকাশকারী– বিকিরণকারী এক সূর্য রূপে চিত্রায়িত করা যায়।

কুরআনী দৃষ্টিতে খোদাকাঙ্ক্ষী চিন্তাশীল সত্তার বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি (খলিফা)- (সূরা বাকারা : ৩১)
২. আল্লাহ্‌র আমানতের রক্ষক- (সূরা আহযাব : ৭২)
৩. আল্লাহ্‌র দিকে যাত্রাশীল- (সূরা ইনশিকাক : ৬)
৪. এমন ঐশী প্রকৃতির অধিকারী যা কখনই পরিবর্তনশীল নয়- (সূরা রূম : ৩০)
৫. স্বাধীনভাবে তার পথ বেছে নিতে পারে তাই সে দায়িত্বশীল- (সূরা দাহ্‌র : ৩)
৬. মহান আল্লাহ্‌র সৌন্দর্যময় ও শক্তিমত্তার সকল নাম তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে- (সূরা হিজর : ২৯ ও সূরা সাদ : ৭২)
৭. প্রশিক্ষণ ও বিকাশ লাভের যোগ্যতাসম্পন্ন- (সূরা দাহর : ৩ ও সূরা জুমআ : ২)
৮. অস্তিত্ব ও সৃষ্টিগত মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী- (সূরা বনি ইসরাইল : ৭০)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৯. বিশ্বকে তার পদানত করা হয়েছে অর্থাৎ তার সেবায় নিয়োজিত রয়েছে (সূরা ইবরাহীম - ৩৩, সূরা নাহ্‌ল : ১৪, সূরা লুকমান : ২০, সূরা জাসিয়া : ১২ ও ...)

১০. ফেরেশতাগণ তার জন্য সিজদারত- (সূরা বাকারা : ৩৪)

কুরআনের আলোকে উদ্বুদ্ধ মানুষ হলো স্রষ্টায় বিশ্বাসী, নবুওয়াতের চিন্তাধারায় পুষ্ট, কুরআনমুখী, নিষ্পাপ ইমামকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, আখেরাতের উদ্দীপনায় কাজ করে, কুরআনের শিক্ষায় প্রশিক্ষিত। এ মানুষ তার জীবন পদ্ধতিতে যে উপাদানগুলো ব্যবহার করে ও যে বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করা নিজের জন্য অপরিহার্য জ্ঞান করে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা এখানে উপস্থাপন করছি।

কুরআনের আলোকে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যসমূহ

ধর্মীয় বুদ্ধিবৃত্তি : মানুষ তার অস্তিত্বের সত্তা ও সার নির্যাস অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে অবহিত এবং একে তার জ্ঞানগত ও ব্যবহারিক জীবনে পূর্ণতার জন্য ভিত্তি ও চালিকা শক্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে। ইসলামে বুদ্ধিবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানই হলো মূল। বুদ্ধিবৃত্তির প্রমাণের বিষয়টি ইসলামে প্রমাণিত একটি বিষয়। কুরআন বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তিকে একদিকে ইতিবাচকভাবে সমর্থন দিয়ে এর ওপর পুনঃপুনঃ তাগিদ করেছে, অন্যদিকে যারা তাদের কথা, কর্ম ও পদক্ষেপে বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তিকে ব্যবহার করে না তাদেরকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছে ও তিরস্কার করেছে। এমনকি যারা বিচার-বুদ্ধিকে প্রয়োগ করে না তারা আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম জীব বলে বিবেচিত হয়েছে (সূরা আনফাল : ২২)। সুতরাং কুরআন অনুসরণকারী মানুষ সৃষ্টিশীল চিন্তা ও বিকশিত বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী এবং সে জ্ঞানগত ও নৈতিক বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তিকে সঠিক ও ভুল, সত্য ও মিথ্যা এবং সুন্দর ও অসুন্দরকে বিবেচনার জন্য ব্যবহার করে। তার জীবনরূপ প্রতিষ্ঠান ও চিন্তার কাঠামোতে বুদ্ধিবৃত্তির উচ্চতর অবস্থান রয়েছে। ইসলামী শিক্ষা বিশ্বপরিচিতি ও মানবপরিচিতি অর্জনে বুদ্ধিবৃত্তিকে অত্যন্ত মূল্যবান জ্ঞান করে। আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমুলীর ভাষায় :

> 'বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ ও সার্বিক জ্ঞান (দার্শনিক জ্ঞান) এবং বিশেষ ও বস্তুনির্ভর জ্ঞান (অভিজ্ঞতা ও গবেষণালব্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান) অর্জনের মাধ্যম হিসাবে ইসলামী শরীয়তের অন্যতম প্রামাণ্য দলিল এবং চিন্তাগত কাঠামোতে ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিকতা, বিধি-বিধান ও আইনের অন্যতম উৎস বলে গণ্য। কুরআন ও হাদীসভিত্তিক দলিলের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। তাই বুদ্ধিবৃত্তি কখনও ধর্মের বিপরীত অবস্থানে থাকতে পারে না।'[৫]

তিনি অন্যত্র বলেন :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

> 'জ্ঞানের সঠিকতা যাচাইয়ের একমাত্র মানদণ্ড হলো বুদ্ধিবৃত্তি। প্রথম শ্রেণীর (স্বতঃসিদ্ধ) সকল জ্ঞান এবং অন্য যে সকল জ্ঞানের প্রত্যাবর্তন প্রথম পর্যায়ের জ্ঞানে ঘটে অর্থাৎ তার ওপর নির্ভরশীল সেগুলোর ভিত্তিও হলো বুদ্ধিবৃত্তি। কারণ, ঐ জ্ঞানগুলোও ইন্দ্রিয়, অভিজ্ঞতা, বর্ণনা ও শ্রবণের মাধ্যমে অর্জিত হয় না; বরং তাকে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে অনুধাবন করতে হয়। সুতরাং সত্য জ্ঞান পরিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় যে বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে কল্পনা, ঝোঁকপ্রবণতা ও সন্দেহের লেশমাত্র নেই। ইবনে সিক্কিত ইমাম রেযা (আ.)-কে যখন প্রশ্ন করেন : বর্তমানে সৃষ্টির ওপর আল্লাহ্‌র হুজ্জাত (সুস্পষ্ট প্রমাণ) কী? তখন ইমাম বলেন : আক্‌ল (বুদ্ধিবৃত্তি) যার মাধ্যমে কে আল্লাহ্‌র বিষয়ে সত্য বলছে বোঝা যায় ও তাকে তা (আক্‌ল) সত্যায়ন করে এবং কে আল্লাহ্‌র ওপর মিথ্যা আরোপ করছে তার মাধ্যমে তা বোঝা ও মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা যায়।'[৬] তিনি আরো বলেন : দীনী দায়িত্বের মানদণ্ড হলো বুদ্ধিবৃত্তি (আক্‌ল)।'[৭]

অতঃপর আয়াতুল্লাহ্‌ জাওয়াদী আমুলী মহানবী (সা.) ও পবিত্র ইমামদের নিকট থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ এবং অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ থেকে বুদ্ধিবৃত্তির একশ তেত্রিশটি কল্যাণকর প্রভাব এবং বুদ্ধিবৃত্তির অনুপস্থিতির উনত্রিশটি মন্দ প্রভাব উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করেছেন।[৮]

ইসলাম ও কুরআনের শিক্ষায় প্রশিক্ষিত মানুষ নিশ্চিত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি (সূরা ইউসুফ : ১০৮), গভীর বুৎপত্তি (সূরা তাওবা : ১২২) ও সর্বাঙ্গীন চিন্তা দ্বারা সকল কিছুকে অনুধাবন করে এবং ধর্মীয় বিষয়কে বুঝতে ও বুদ্ধিমত্তাকে উৎস ও বিশ্লেষক হিসাবে ব্যবহার করে অর্থাৎ তার ধর্মীয় জ্ঞান-চিন্তাভাবনাও বুদ্ধিবৃত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, শ্রবণ ও অনুকরণের ওপর নির্ভরশীল নয়। হযরত আলী (আ.) বলেছেন :

> '(শ্রেষ্ঠ মানুষের বৈশিষ্ট্য এমন যে) তারা দীনকে বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি দিয়ে অনুধাবন করেছে ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করেছে (পালন করেছে), শুধু শ্রবণ করে ও অন্যের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে দীনকে গ্রহণ করেনি। নিশ্চয়ই জ্ঞানের বর্ণনাকারী অধিক, কিন্তু গভীরভাবে তা অনুধাবনকারী ও পালনকারীর সংখ্যা স্বল্প।'[৯]

মহানবী (সা.) বলেছেন :

> 'মানুষের ভিত্তি হলো তার বুদ্ধিবৃত্তি। যার বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তি নেই তার কোনো ধর্ম নেই।'[১০]

সুতরাং কুরআনের আলোকে গঠিত মানুষ বিশ্বের সকল সৃষ্টি ও তাতে সংঘটিত সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং ঘটনাপ্রবাহকে বিশ্লেষণে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগায় এবং বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন ও প্রশিক্ষণকে তার দায়িত্ব বলে জ্ঞান করে। সুতরাং মানুষের বিশ্ব, মানুষ ও ইসলামের পরিচিতির মানদণ্ড হলো বুদ্ধিবৃত্তি (বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ)। কুরআন দ্বারা পরিচালিত মানুষ হলো চিন্তানির্ভর। তাই কখনই সে নিজেকে এ ঐশী নিয়ামত–যা অভ্যন্তরীণ নবী ও দিক-নির্দেশক–থেকে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বঞ্চিত করতে চায় না; বরং তার অভ্যন্তরীণ এ প্রদীপ ও আলোকবর্তিকা সবসময় জ্বালিয়ে রাখে ও এর আলোকরশ্মিতেই জ্ঞান ও নৈতিকতাকে অন্বেষণ করে। এ অভ্যন্তরীণ দিশারীই তাকে ঐশী প্রত্যাদেশের (ওহীর) দিকে পরিচালিত করে এবং বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহারকে ওহী ও ধর্মীয় বুদ্ধিবৃত্তির অধীনে পরিচালিত করার মাধ্যমে ঐশী অভিভাবকত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে ও মেনে নিতে বাধ্য করে এবং প্রতারক ও মন্দকর্মপ্রবণ আত্মাকে বুদ্ধিবৃত্তির অধীনে নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে যেমন বুদ্ধিবৃত্তিকে জ্ঞানের জন্য বিসর্জন দেয় না, তেমনি জ্ঞানকেও বুদ্ধিবৃত্তির খাতিরে পরিত্যাগ করে না। ইসলামে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিকে ওহীর জন্য বিসর্জনের কোনো প্রশ্নই উত্থাপিত হয় না। কারণ, ইসলামের দৃষ্টিতে কুরআন ও সুন্নাত (রাসূল ও নিষ্পাপ ইমামদের বাণী, কর্ম ও নীরবতাসূচক অনুমোদন) যেমনভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতিফলক, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিক বিচার, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ (যার মধ্যে কল্পনা, ঝোঁক প্রবণতা, প্রবৃত্তিগত চাওয়া-পাওয়ার অনুপ্রবেশ ঘটেনি) ঐশী ইচ্ছা ও বিধানের প্রকাশক। অর্থাৎ কোনো কোনো বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তি স্বতন্ত্রভাবে শরীয়তের বিধান প্রণয়ণের অধিকার রাখে ও ইসলামী বিধি-বিধানের অন্যতম মাধ্যম বলে গণ্য হয়। অর্থাৎ যুক্তিনির্ভর বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে অর্জিত যে কোনো নির্দেশ কুরআন ও হাদীসের বাণীর ন্যায় ইসলামী বিধানের স্বতন্ত্র উৎস বলে বিবেচিত। এ বুদ্ধিবৃত্তিই শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে সার্বিকভাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তাঁর একত্বকে প্রমাণ, ওহী ও নবুওয়াতের প্রয়োজনীয়তা ও কিয়ামতের অপরিহার্যতাকে প্রমাণে সক্ষম। এটা স্পষ্ট যে, এরূপ বুদ্ধিবৃত্তি নিজেকে ওহীর অনুগত জ্ঞান করে এবং ওহীর পরিপন্থী সকল চিন্তাকে অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে। বুদ্ধিবৃত্তি নিজেই স্বীকার করে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা বুদ্ধিবৃত্তির ঊর্ধ্বের বিষয়। এক্ষেত্রে স্বয়ং বুদ্ধিবৃত্তি এমন বিষয়ের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে যদিও তার স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত নয়।

কুরআন দ্বারা পরিচালিত মানুষ স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী। কুরআনী পরিভাষায় তাকে 'উলুল আলবাব' (বুদ্ধিবৃত্তিক কর্তৃত্বের অধিকারী) বলে অভিহিত করা হয়েছে–যে বুদ্ধিবৃত্তি নিরঙ্কুশ সত্তার কাছে মানুষকে আত্মসমর্পিতও অনুগত করে। এ বুদ্ধিবৃত্তি বস্তুর বন্ধনমুক্ত। খোদা অভিমুখী এ সত্তা বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাতে ভুল করে না, তার চিন্তা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সকল প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্বচ্ছ ও নির্মল সরোবরে পৌঁছেছে এবং এ সরোবর থেকে পান করে নিজের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিককে সতেজ ও প্রাণবন্ত করেছে। সে পূর্ণতার ধাপগুলোকে একের পর এক অতিক্রম করেছে অর্থাৎ তার সুপ্ত বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয়ে কার্যকর বুদ্ধিবৃত্তিতে (عقل فعال) পরিণত হয়েছে এবং সে সমগ্র সৃষ্টিজগতকে তার প্রকৃতরূপে প্রত্যক্ষ করার যোগ্যতা লাভ করেছে, সকল কিছুর (দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতের) বাস্তবতা তার সামনে ফুটে উঠেছে। 'আমরা এভাবে ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা দেখাই যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।' (সূরা আনফাল : ৭৫)

কুরআন দ্বারা পরিচালিত মানুষের জীবনে বুদ্ধিবৃত্তি কখনও অস্তমিত হয় না, কখনও তার গ্রহণ (eclipse) হয় না ও অন্ধকার তার ওপর ছায়া ফেলে না; বরং তার জীবনে বুদ্ধিবৃত্তির সূর্য সবসময়ই

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আলো বিচ্ছুরণ করে এবং তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, বস্তুগত, নৈতিক, পার্থিব, অপার্থিব, আধ্যাত্মিক সকল জীবনের ওপর তার কিরণ পতিত হয়। মোটকথা, তার সমগ্র জীবনে বুদ্ধিবৃত্তির উপস্থিতি লক্ষণীয়।

আত্মপরিচিতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণ

এরূপ মানুষ ওহী ও বুদ্ধিবৃত্তির আলোতে স্বীয় সত্তার পরিচয় লাভ করে এবং নিজের সত্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। যে মানুষ নিজেকে খুঁজে পেয়েছে ও নিজের পরিচয় লাভ করেছে এবং এ পরিচয়ের আলোকে আত্মগঠন ও পূর্ণতা লাভের প্রচেষ্টায় রত সে মহান আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ– 'হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের নিজেদের (সম্পর্কে জানা, আত্মগঠন ও আত্মরক্ষার) দায়িত্ব তোমাদের ওপরই ন্যস্ত'– অনুযায়ী কাজ করেছে। এমন ব্যক্তি কখনও নিজের সত্তার বিষয়ে উদাসীন নয়, তার সত্তাকে সে কখনও ভুলে যায় না; ফলে সে আত্মপ্রবঞ্চনা, আত্মবিস্মৃতি ও স্বার্থপরতার শিকার হয় না। কখনই সে আত্মপ্রশংসা ও আত্মগর্বে রত হয় না; বরং সে মহান আল্লাহ্‌র এ বাণীকে স্মরণ রাখে : 'অতএব, তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র জ্ঞান কর না। তিনি তাকে সবচেয়ে ভালোভাবে জানেন যে তাকওয়া অবলম্বন করে (আল্লাহ্‌র ভয়ে নিজেকে সংযত রাখে)' (সূরা নাজ্‌ম : ৩২)। পবিত্র কুরআন হযরত ইউসুফের ভাষায় বলেছে : 'এবং আমি আমার সত্তাকে ত্রুটিমুক্ত মনে করি না– নিশ্চয় প্রবৃত্তি মন্দ কাজের আদেশ প্রদানে অত্যন্ত তৎপর – কেবল ঐ ব্যক্তি ব্যতিরেকে যার ওপর আমার প্রভু অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। (সূরা ইউসুফ : ৫৩) অর্থাৎ যে তার সৎ গুণাবলীকে ঐশী অনুগ্রহ বলে বিশ্বাস করে সে আত্মপরিশুদ্ধি ও আত্মগঠনের প্রচেষ্টায় রত যাতে সফলকাম হতে পারে।

'সে-ই সফলকাম যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে।' (সূরা শাম্‌স : ৯) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কুরআন দ্বারা উদ্বুদ্ধ মানুষ আত্মপরিচিতির মাধ্যমে খোদা পরিচিতিতে পৌঁছেছে। অর্থাৎ তার ঐশী মানবীয় অবস্থানকে চিহ্নিত করে আল্লাহ্‌র প্রনিনিধিত্বের দিকে ধাবমান এবং প্রতি মুহূর্তে ঐশী আমানতকে রক্ষা ও তার সংরক্ষণে তৎপর। সে তার এ অনুপম মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানকে কখনই হাতছাড়া করতে রাজী নয়। তাই কখনই এমন কর্মে লিপ্ত হয় না যা তাকে এ স্থান থেকে বিচ্যুত করে।

এ মানুষ আত্মপরিচিতি, আত্মসমালোচনা ও আত্মসিদ্ধির মাধ্যমে নিষ্পাপ ফেরেশতাদের চরিত্র লাভ করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং সে আল্লাহ্‌র পরিচয়, ভালোবাসা ও ইবাদাতের ছায়ায় আল্লাহ্‌তে বিলীন (ফানাফিল্লাহ্‌) ও স্থায়িত্ব (বাকাবিল্লাহ্‌) লাভ করে আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছে। আল্লামা তাবাতাবায়ী সূরা হাশরের ১৮ নং আয়াত– 'হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করো এবং প্রত্যেকেরই চিন্তা করে দেখা উচিত যে, আগামীকালের জন্য সে অগ্রে কি প্রেরণ করেছে এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করো, তোমরা যে কর্মই করো সে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সম্পর্কে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত আছেন' এবং সূরা হুজুরাতের ১নং আয়াতের– 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সামনে তোমরা কোনো বিষয়ে অগ্রবর্তী হয়ো না'– তাফসীরে বলেছেন : 'এখানে যে ঈমানদারদের কথা বলা হয়েছে তারা বিশেষ শ্রেণীর মুমিন এবং তাদের সংখ্যা খুবই কম। কারণ, অধিকাংশ ঈমানদারই পার্থিব প্রয়োজন পূরণে ব্যস্ত থাকায় নিজের সত্তার দিকে তাকানোর অবকাশ পায় না ও নিজেকে খতিয়ে দেখে না যে, ভবিষ্যতের চিরন্তন জীবনের জন্য কী প্রেরণ করেছে। তাই এ আয়াতে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সূরা হুজুরাতের আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিরা সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র দাসত্বের জন্য নিজেদেরকে নিবেদিত ও সমর্পিত করেছে এবং সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্র কর্তৃত্ব ও বেলায়াতের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। তারা তাদের ইচ্ছা শক্তিকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীন করেছে যেমনি সূরা দাহরের ২৯ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ; 'আল্লাহ্ যা চান তোমরা তা ব্যতীত কিছুই চাও না' ফলে একমাত্র আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক, 'আল্লাহ্ই হলেন মুমিনদের অভিভাবক' (সূরা আলে ইমরান : ৬৮) এবং 'আল্লাহ্ই হলেন মুত্তাকীদের অভিভাবক' (সূরা জাসিয়া : ৪৫)[১১]

সুতরাং কুরআনের আলোকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত মানুষ তার উৎসের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে তার ও তার স্রষ্টার মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধানকে ঘুচিয়েছে এবং সে তার স্রষ্টার প্রতি মুখাপেক্ষিতার স্বরূপকে উন্মোচন করেছে ও বুঝতে পেরেছে যে, তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র ওপর নির্ভরশীলই শুধু নয়, এমনকি তার বিদ্যমানতা তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা ব্যতীত কিছু নয়। যে মানুষ নিজের এ পরিচয় লাভ করে প্রকৃতপক্ষে সে ঐশী সত্তার বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলক, তখন সে তার বর্তমান ও স্থিতির অবস্থায় থাকতে পারে না; সে গতিশীল এক সত্তায় পরিণত হয় যার যাত্রার লক্ষ্য পূর্ণতা– কখনই অবক্ষয় নয়, উত্তরণ– কখনই পতন নয়, আরোহণ– কখনই অবতরণ নয়, তার গন্তব্যস্থল স্থায়ী অবিনশ্বর বাসস্থান– অস্থায়ী ও নশ্বর বাসস্থান নয়, সে সকল প্রেমের আধার পরম প্রেমাস্পদ অসীম সত্তার ভালোবাসা ও তার সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষী ও এতে পৌঁছতে সে সকল প্রকার প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে ও সকল কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। তাই তার চিন্তা তাঁকে (স্রষ্টাকে) কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়।

কুরআনী মানুষ খোদাপ্রেম ও ঐশী অভিভাবকত্বের সামনে নিজেকে নিবেদিত করেছে। সে নিজের গর্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে আল্লাহ্র দাস ও বান্দা হওয়া এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভ বলে মনে করে। যে মানুষ এরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয় আল্লামা হাসানযাদে আমুলীর ভাষায় 'এমন ব্যক্তি বাক্শক্তি সম্পন্ন প্রাণী বৈ কিছু নয়... মানুষ হলো সে-ই যে আল্লাহ্র খলিফা ও প্রতিনিধিতে পরিণত হয়েছে।'

আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমুলীর মতে পবিত্র কুরআনের সৃষ্টি সম্পর্কিত এবং মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্বের ধারণাবাহী আয়াতসমূহ এ উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে যে, মানুষ এর মাধ্যমে স্বীয় পরিচয় লাভ করবে এবং কীভাবে এ পৃথিবীতে তার উৎপত্তি সে সম্পর্কে জানবে। আর যখন সে এ জ্ঞান লাভ করবে তখন ঐশী প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব কীভাবে পালন করবে ও কীভাবে স্রষ্টায় পৌঁছবে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সে সম্পর্কে অবহিত হবে। এ কারণেই আত্মপরিচিতি সকল মর্যাদার উৎস এবং সকল জ্ঞানের মূল।

(চলবে)

তথ্যসূত্র

১. তাফসীরে ইনসান বে ইনসান, আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমুলী, পৃ. ২২-২৪, মারকাযে নাশরে ইসরা প্রকাশনী, কোম, ১৩৮৪ ফারসি সাল;

২. শারহে গুরারুল হিকাম, মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন খুনসারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৮, তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ১৩৬৬ ফারসি সাল;

৩. তাফসীরে ইনসান বে ইনসান, পৃ. ৬৫;

৪. তাফসীরে মওজুয়ী, আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমুলী, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ১৫-২০ এবং ৩৯-৬৫, মারকাযে নাশরে ইসরা প্রকাশনী, ১৩৮৩ ফারসি সাল;

৫. তাফসীরে ইনসান বে ইনসান, পৃ. ৩২;

৬. আলী ইবনে মূসা আর রিযা ওয়াল ফালসাফাতুল ইলাহিয়া, আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমুলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০, নাশরে ইসরা, ১৩৭৪ ফারসি সাল;

৭. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫;

৮. তাফসীরে ইনসান বে ইনসান, পৃ. ২৬-৭০;

৯. নাহজুল বালাগা, খুতবা নং ২৩৯;

১০. নাহজুল ফাসাহা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১১;

১১. আল মিজান ফি তাফসীরিল কুরআন, আল্লামা মুহাম্মাদ হুসাইন তাবাতাবায়ী, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫-৩৭৭, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ৪৫৫-৪৫৮, কোম, মুয়াসসাসায়ে মাতবুয়াতে ইসমাঈলীয়ান, ১৪২২ হিজরী।

(তেহরান থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'কাবাসাত', ১২তম বর্ষ ২য় সংখ্যা থেকে অনূদিত)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াত-পূর্ব জীবন

ড. আহমাদ রাহ্‌নূমায়ী

অনুবাদ : ড. মো. আলতাফ হোসেন

বক্ষ্যমান নিবন্ধটি রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াত-পূর্ব জীবনের ওপর আলোকপাত করার একটি প্রচেষ্টা। এখানে রাসূল (সা.)-এর জন্ম, শৈশব, তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ হওয়া এবং পৌত্তলিকতা বিরোধী যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নবী (সা.)-এর জন্ম

নবী (সা.)-এর জীবনীকারদের মধ্যে তাঁর জন্মতারিখ নিয়ে সবচেয়ে বেশি ভিন্নমত রয়েছে। সবগুলো একত্র করলে জন্মতারিখ নিয়ে প্রায় বিশটি মত পাওয়া যায়[১] যদিও সুন্নী ও শিয়া ঐতিহাসিক ও হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে এক বিরাট সংখ্যক হাতিবর্ষ অর্থাৎ ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের[২] রবিউল আউয়াল মাসে রাসূল (সা.) জন্মগ্রহণ করেন এ ব্যাপারে ঐকমত্য[৩] পোষণ করেন। শুরু থেকেই সুন্নী ও শিয়াদের মধ্যে রাসূল (সা.)-এর জন্মতারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে এবং এ মতভেদ তাদের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে– যেখানে তাঁরা রাসূল (সা.)-এর জন্মতারিখ নিয়ে আলোচনা করেছেন[৪]।

শিয়ারা ১৭ রবিউল আউয়ালকে আর অধিকাংশ সুন্নী ১২ রবিউল আউয়ালকে রাসূল (সা.)-এর জন্মদিন হিসাবে গণ্য করে। শিয়াদের মধ্যে শুধু আল্-কুলাইনী[৫] ১২ রবিউল আউয়ালকে[৬] রাসূল (সা.)-এর জন্মদিন বলে সমর্থন করেছেন।

সুন্নী জীবনীকারগণ রাসূল (সা.)-এর জন্মদিন নিয়ে ঐতিহাসিকদের[৭] মধ্যে মতভেদের কথা উল্লেখ করলেও ইবনে ইসহাক এবং অন্য জীবনীকারগণ[৮] বলেন, অধিকাংশ ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, মুহাম্মাদ (সা.) ১২ রবিউল আউয়াল জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে ইসহাকের মতে রাসূল (সা.) হাতিবর্ষের[৯] ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। সুন্নীরা সাধারণভাবে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সোমবারকে রাসূলের জন্মদিন[১০] হিসাবে মানে অন্যদিকে শিয়ারা শুক্রবারকে[১১] জন্মদিন হিসাবে গণ্য করে। বর্তমানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে প্রতি বছর ১২ থেকে ১৭ রবিউল আউয়াল রাসূল (সা.)-এর জন্মবার্ষিকী হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। এ সপ্তাহকে 'ঐক্য সপ্তাহ' ঘোষণা করা হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ বিশ্বাসের পাশাপাশি অন্যদের বিশ্বাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে।

তের শতকের শিয়া জীবনীকার আল্-ইরবিলি[১২] বলেন যে, তিনি মনে করেন রাসূল (সা.)-এর জন্মদিন নিয়ে এরকম মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। কারণ, দিন ও পঞ্জিকা সম্পর্কে ধারণা না থাকায় তখন আরবরা শিশুদের জন্মতারিখ সংরক্ষণ করতে পারত না। তাঁর কাছে বরং রাসূল (সা.)-এর মৃত্যুদিবস[১৩] নিয়ে জীবনীকারদের মধ্যে মতভেদকে অযৌক্তিক বলে মনে হয়।

অলৌকিক ঘটনাবলী

কিছু সংখ্যক জীবনীকারের মতে রাসূল (সা.)-এর জন্মের আগে-পরে কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটেনি। তাঁদের মতে আমেনার গর্ভধারণ এবং প্রসবের[১৪] আগে-পরে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেনি। তথাপি কিছু সংখ্যক সুন্নী ও শিয়া জীবনীকার রাসূল (সা.)-এর জন্মের পূর্বে ও পরে[১৫] কিছু অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

রাসূল (সা.)-এর দুধপান

রাসূল (সা.) তাঁর মা ব্যতীত অন্য মহিলার দুধ কেনো পান করেছেন। জীবনীকারগণ একমত যে, রাসুল (সা.) স্বল্প সময়ের জন্য আবু লাহাবের দাসী শুয়াইবার দুধ পান করেছেন। অতঃপর আবু যোআইব-এর কন্যা হালিমা আল্ সাদিয়া এ ইয়াতিম ব্যতীত অন্য কোনো শিশু না পাওয়ায় রাসূল (সা.)-কে প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হালিমা বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ (সা.)-কে গ্রহণের পরপরই তিনি সব ধরনের আশীর্বাদ এবং কল্যাণপ্রাপ্ত হন। তিনি রাসূল (সা.)-কে পূর্ণ দুই বছর প্রতিপালন করে তাঁর মায়ের কাছে ফেরত দেন।[১৬]

ইবনে ইসহাক হালিমা সম্পর্কে বলেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল (সা.) অন্য শিশুদের থেকে আলাদাভাবে বেড়ে ওঠেন। তাঁর কারণে প্রাপ্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা সত্ত্বেও দুই বছর পর আমরা তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে ফেরত দিতে আসলাম। আমি তাকে বললাম, 'আপনার শিশুটিকে আমার সাথে থাকতে দিন যতদিন না সে পরিপূর্ণ বালকে পরিণত হয়। কারণ, মক্কার দূষিত পরিবেশ তার ক্ষতি করবে বলে আশংকা করছি।' আমাদের কাছে তাকে ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত এভাবে আমরা তাঁর মায়ের কাছে আবদার করতে থাকলাম।[১৭]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

রাসূল (সা.) কি ইয়াতিম বলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন?

হালিমা এবং অন্য ধাত্রী মায়েরা রাসূল (সা.) ইয়াতিম বলে তাঁর প্রতিপালনের বিনিময় পাওয়া যাবে না এ আশংকায় তাঁকে নিতে অস্বীকার করে। মোহাম্মদ হুসাইন হাইকেল (সুন্নী জীবনীকার) বলেন, ধাত্রী মায়েরা শিশুর পিতার[১৮] কাছ থেকে ভালো বিনিময় না পাওয়ার আশংকায় ইয়াতিম শিশুদের প্রতিপালনে আগ্রহ দেখাত না। বিধবা মায়ের সন্তান মুহাম্মাদ এ জন্যই তাদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল না। তাদের মধ্যে কেউই জীবিত ও ধনী পিতাদের সন্তান রেখে মুহাম্মাদকে গ্রহণ করতে রাজী হচ্ছিল না।[১৯] সীরাত গ্রন্থে ইবনে ইসহাক হালিমার সম্পর্কে বলেন, 'একজন ইয়াতিম! তার মা ও দাদা কি বিনিময় দিতে পারবে? সে জন্যই আমরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান[২০] করলাম।'

সাইয়্যেদ জাফর মুরতাজা (শিয়া জীবনীকার) একইভাবে বর্ণনা করেন যে, হালিমা প্রথমে মুহাম্মাদ (সা.)-কে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে ব্যতীত[২১] অন্য কোনো বাচ্চা না পাওয়ায় তাঁকে গ্রহণ করেন। তথাপি তিনি অন্য শিয়া মনীষীদের মতো এ বর্ণনাকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে পারেননি। কারণ, কেউ বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.)-এর পিতা আবদুল্লাহ তাঁর জন্মের সময় বেচে ছিলেন এবং তাঁর জন্মের কয়েক মাস পর মৃত্যুবরণ করেন। কেউ বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা রাসূল (সা.)-এর জন্মের ৭ মাস বা ১৭ মাস[২২] পর মৃত্যুবরণ করেন। আবার কেউ বলেন, রাসূল (সা.)-এর জন্মের[২৩] ২৮ মাস পর তাঁর পিতা আবদুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। সুতরাং রাসূল (সা.) জন্মের সময় ইয়াতিম ছিলেন কিনা এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই। যদিও আমরা ধরে নেই যে, তিনি জন্মের সময় ইয়াতিম ছিলেন তথাপি তিনি এক সম্মানিত এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি আবদুল মুত্তালিব-এর উত্তরাধিকারী ছিলেন। হাতিবর্ষে[২৪] যাঁর সম্পদের মধ্যে শুধু উটের সংখ্যা ছিল ২০০টি। লোকেরা তাঁকে দাতা এবং মহান ব্যক্তি হিসাবে জানত। তারা এও জানত যে, তাঁর পুত্রবধূ এক ধনী পরিবারের সন্তান। সুতরাং অন্যান্য ধনী পরিবারের শিশুদের মোকাবিলায় মুহাম্মাদ (সা.)-এর মতো একজন ইয়াতিম ধাত্রী মাতাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হবার কোনো যুক্তি নেই। দাদার আশ্রয়ে[২৫] থাকাকালে সম্পদের ওপর তাঁর অধিকার সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তদুপরি আমাদের এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, মক্কায় শিশুদের ধাত্রী মায়ের কাছে রেখে প্রতিপালনকে আভিজাত্যের[২৬] অংশ হিসাবে দেখা হতো যার অগ্রভাগে ছিলেন আবদুল মুত্তালিব।

ধাত্রী মা নিয়োগের রেওয়াজ

অন্যান্য শিশুর মতো রাসূল (সা.) মরুচারী গোত্রের এক ধাত্রী মায়ের দুধ পান করেছেন। এটি ছিল তৎকালীন মক্কার অভিজাত পরিবারের একটি রেওয়াজ। তারা তাদের আট দিন বয়সের বাচ্চাকে দুধ পানের জন্য কোনো এক মরু পরিবারে পাঠাতো এবং সেখানে তারা আট/দশ বছর পর্যন্ত প্রতিপালিত হতো। কোনো কোনো মরু গোত্রের বিশেষ করে বনু সা'দ[২৭] গোত্রের ধাত্রী মায়েদের এ কাজে বেশ সুনাম ছিল। এ রেওয়াজের পেছনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণও নিহিত ছিল :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১. মরুভূমির নির্মল বায়ু সেবনের ফলে শিশুরা দ্রুত বেড়ে ওঠে এবং মরুজীবনের কষ্টকর পরিবেশে বড় হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে বিভিন্ন পরিবেশে[২৮] খাপ খাইয়ে চলার যোগ্যতা তৈরি হয়;

২. মক্কার মিশ্র সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং হজ্ব ও বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে মেশার সুযোগ থেকে বহু দূরে মরুভূমির এককেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তারা শুদ্ধ এবং ধ্রুপদী আরবি ভাষা রপ্ত করার সুযোগ পায়। মক্কাবাসী অধিকাংশ ক্ষেত্রে বনু সা'দ গোত্রের ধাত্রীদের কাছে বাচ্চা প্রতিপালনের দায়িত্ব দিতে পছন্দ করত। কারণ, আরবের শহর ও মরু[২৯] এলাকার বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বনু সা'দ ছিল শুদ্ধ আরবি সংস্কৃতির ধারক। সেজন্য রাসূল (সা.) তাঁর অনুসারীদের বলতেন, 'আমি তোমাদের সবার চাইতে খাঁটি আরব। আমি কুরাইশ এবং বনু সা'দ বিন বকর[৩০] গোত্রের ধাত্রী মায়ের দুধ পান করেছি এবং তাদের মাঝে বড় হয়েছি।'

৩. মরুভূমির নির্মল পরিবেশ বেড়ে ওঠা শিশুরা সাহসী ও সিংহ হৃদয়ের অধিকারী হয় এবং স্বাধীন ও মুক্ত[৩১] মনের মানুষ হয়ে ওঠে;

৪. মরুভূমির সরল এবং নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশ শিশুদের মানসিক বিকাশের সহায়ক এবং এটি তাদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং মেধা তৈরি করে। তারা হয় প্রকৃত বুদ্ধিমান ও মেধাবী। কারণ, তারা শহরের গ্লানি ও ক্লেশ থেকে মুক্ত এক সাধারণ ও অধিকতর প্রাকৃতিক পরিবেশে[৩২] বাস করে;

৫. বর্ণিত আছে যে, হালিমা যখন দুই বছর পর মুহাম্মাদ (সা.)-কে তাঁর মায়ের কাছে ফেরত দিতে আসেন তখন মক্কায়[৩৩] মহামারী ছড়িয়ে পড়েছিল বলে তিনি আবার তাঁকে সাথে নিয়ে যেতে চেয়েছেন।

গরমকালে মক্কায় উষ্ণ এবং খারাপ আবহাওয়া থাকায় শিশুরা বড়দের চাইতে বেশি রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকায় থাকে সেজন্য গরমকালে মক্কা নবজাতকদের জন্য মোটেই উপযোগী থাকে না। সেজন্য মক্কাবাসী তাদের নবজাতক বাচ্চাদের মরুভূমিতে পাঠায় যাতে তারা মক্কার গরম, উষ্ণ এবং অস্বাস্থ্যকর হাওয়া থেকে নিরাপদ থাকে। এজন্য তারা তাদের শিশুদের জন্য ধাত্রী মায়ের খোঁজ করে– যাতে তারা কয়েক বছর মক্কার বাইরে থেকে বেড়ে উঠতে পারে। উপরোল্লিখিত দু'টি কারণ নির্ভরযোগ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় কারণটি ইবনে ইসহাকের 'সিরাত'[৩৪] গ্রন্থে একটি হাদীস হিসাবে এবং পঞ্চমটি ইবনে আসির হাদীস[৩৫] হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এটি তাবারী তাঁর নবীর ইতিহাস[৩৬] গ্রন্থে এবং হাইকেল তাঁর হায়াত[৩৭] গ্রন্থে হালিমা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। বাকী কারণগুলো জীবনীকারগণ তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করেছেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

রাসূলের বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা

সুন্নী এবং শিয়া উভয় সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে রাসূল (সা.)-এর বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা জানা যায়। যদিও ঘটনাটি মূলত সুন্নীদের সংকলিত হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে; তথাপি এটি শিয়াদের গ্রন্থেও স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন জীবনীকার এ অস্বাভাবিক ঘটনা সম্পর্কে নানা অভিমত পোষণ করেছেন। মোটের ওপর অধিকাংশ সুন্নী পণ্ডিত এটিকে নির্ভরযোগ্য হিসাবে গণ্য করেছেন অপরদিকে শিয়া পণ্ডিতগণ এ ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করেছেন।

ইবনে ইসহাক হালিমা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, হালিমা বলেন,

> 'আমরা ফেরত আসার কয়েক মাস পর সে এবং তাঁর ভাই ভেড়া চরানোর জন্য তাঁবুর আড়ালে গিয়েছিল। হঠাৎ তার ভাই দৌড়ে আসল এবং বলল, 'সাদা পোশাকধারী দু'জন লোক আমার কুরাইশ ভাইকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁর পেট চিরে ফেলেছে।' আমরা দৌড়ে তাঁর নিকট গেলাম এবং দেখতে পেলাম সে মলিন চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা তাঁর হাত ধরে কি ঘটেছিল তা জানতে চাই। সে বলল, দুজন সাদা পরিচ্ছদধারী ব্যক্তি এসে আমাকে শুইয়ে দিল এবং আমার পেট চিরে কি যেন খোঁজাখুঁজি করল। অতঃপর আমরা তাঁকে তাবুতে ফেরত নিয়ে গেলাম।[৩৮]

এ ঘটনার পর হালিমা মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে তার মায়ের কাছে ফেরত দেয়ার জন্য উদগ্রীব হলেন। ইবনে ইসহাক খালিদ বিন মাদান নামক এক ব্যক্তি থেকে রাসূল (সা.)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূল বলেন :

> 'আমি যখন বনু সাদ বিন বকর গোত্রে দুগ্ধপোষ্য ছিলাম তখন একদিন আমার দুধ ভাইসহ ভেড়ার পাল চরানোর জন্য তাঁবুর আড়ালে গেলাম। হঠাৎ দু'জন সাদা পোশাকধারী লোক হাতে বরফ ভর্তি সোনার থালাসহ আমার নিকট আসল। তারা আমাকে ধরে শুইয়ে দিল এবং আমার পেট চিরে ফেলল; আমার হৃদয় বের করে চিরে ফেলল; ওটার ভেতর থেকে কালো কোনো বস্তু বের করে ছুঁড়ে ফেলল; আমার হৃদয় এবং পেট পূর্ণ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত বরফ দিয়ে ধৌত করল[৩৯]।'

মুসলিমের সহীহ গ্রন্থে ঘটনাটি বর্ণনার ধারাক্রমে আনাস বিন মালিক থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। আনাসের হাদীস মতে কালো বস্তুটি ছিল রাসূল (সা.)-এর হৃদয়ে শয়তানের অংশ। বর্ণনার শেষের দিকে আনাস বলেন যে, তিনি রাসূল (সা.)-এর বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ার দাগ প্রায়ই দেখতে পেতেন।[৪০]

এ কাহিনী সম্পর্কে নেতিবাচক মূল্যায়ন

হাইকেল এ কাহিনী মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, 'প্রাচ্যবিদগণ এবং অনেক মুসলিম পণ্ডিত এটা বিশ্বাস করেন না এবং এটিকে বানানো গল্প বলে মনে করেন। জীবনীকারগণ এ ব্যাপারে একমত

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

যে, দু'বছরের এক বালক সাদা পোশাকধারী দুজন লোক দেখেছেন বলে যে দাবী করা হয় তা মোটেও নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ, মুহাম্মদ (সা.) মরুভূমির বনু সাদ গোত্রের সাথে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত বাস করেন। মুহাম্মদ (সা.)-এর আড়াই বছর বয়সে এ ঘটনা ঘটার পর হালিমা এবং তাঁর স্বামী তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে ফেরত দিতে যান বলে যে দাবি করা হয় তা এ সাধারণ ঐকমত্যের বিপরীত। অপরদিকে কোনো কোনো লেখক এ ব্যাপারে নিশ্চিত করেছেন যে, মুহাম্মাদ (সা.) হালিমার কাছে তৃতীয় বারের[৪১] মতো ফেরত আসেন।

বাড়তি প্রমাণ হিসাবে হাইকেল দু'জন প্রাচ্যবিদ ম্যুর এবং ডারমেনহেম-এর ধারণা তুলে ধরেছেন। ম্যুর বলেছেন, প্রকৃত ঘটনা উদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন; কারণ, এ গল্পে অসংখ্য সুন্দর উপাখ্যান রয়েছে। তিনি ইতি টানেন এই বলে যে, মুহাম্মাদ (সা.)-এর স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক ধারণা পোষণ না করেও বলা যায় যে, এ গল্পের উৎপত্তি সম্ভবত ভীতি বা মৃগী রোগের উপসর্গ।[৪২] ডারমেনহেম বিশ্বাস করেন যে, কুরআনের সূরা আল্ ইনশিরাহ-র একটি আয়াতের ধারণাগত ব্যাখ্যা থেকে এ গল্পের উৎপত্তি হয়েছে– 'আমরা কি তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করিনি এবং আমরা কি তোমার পৃষ্ঠদেশে চেপে থাকা বোঝা লাঘব করিনি?'[৪৩] ডারমেনহেম-এর কুরআনের আয়াতের[৪৪] ব্যাখ্যাগত এ ধারণা থেকে হাইকেল এ বলে উপসংহার টেনেছেন যে, নিশ্চয়ই এ আয়াতে কুরআন কোনো একটি অলৌকিক ঘটনার প্রতি ইংগিত করেছে। এটি মুহাম্মাদ (সা.)-কে নবুওয়াতের দায়িত্ব ও বোঝা বহনের উপযোগী করার জন্য তাঁর আত্মিক পরিশুদ্ধিকে বুঝিয়েছে। এ সমস্ত প্রাচ্যবিদ এবং মুসলিম চিন্তাবিদের এ রকম ধারণার পেছনে অন্তর্নিহিত কারণ হলো তাঁরা মনে করতেন মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবন ছিল একজন মানুষের স্বাভাবিক জীবন এবং তাঁর নবুওয়াত এবং তিনি নিজে কখনও পূর্ববর্তী নবীদের অনেকের মতো অলৌকিকতার পেছনে ছুটতেন না।

এ আবিষ্কার আরব ও মুসলিম ঐতিহাসিকদের দ্বারা সমর্থিত যারা ক্রমাগত জোর দিয়ে এসেছেন যে, নবীর জীবন যে কোনো অযৌক্তিক বিষয় বা রহস্য থেকে মুক্ত এবং উল্লিখিত ঘটনা 'আল্লাহর সৃষ্টি যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণযোগ্য, তাঁর আইন অপরিবর্তনীয় এবং বিধর্মীরা ঘটনার স্বাভাবিকতায় বিশ্বাসী নয়[৪৫] বলে নিন্দনীয়'– কুরআনের এ দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত। হাইকেলের মতে নবী (সা.) কখনও অযৌক্তিক এবং অলৌকিক কোনো ব্যাপারে জড়িত ছিলেন না।

সহীহ মুসলিম থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এস. জাফর মুরতাজা মন্তব্য করেন যে, সুন্নী হাদীস ও সিরাত গ্রন্থে সাধারণত এ গল্প বর্ণিত আছে। এ সকল গ্রন্থের বর্ণনা মোতাবেক নবী (সা.)-এর বক্ষ বহুবার বিদীর্ণ করা হয়েছে। প্রথমবার তাঁর তিন বছর বয়সে যখন তিনি বনু সা'দ গোত্রে বাস করেন; দ্বিতীয়ত তাঁর ১০ বছর বয়সে; তৃতীয়বার তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় এবং চতুর্থবার তাঁর মেরাজে গমন এবং বেহেশতে ভ্রমণের সময়। বর্ণনাকারিগণ সম্ভবত তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির চিন্তা করে একই ঘটনা বারংবার বর্ণনা করেছেন। মুরতাজা এ কাহিনীর মাধ্যমে কিছু দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা করেছেন যা নিম্নরূপ :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১. এ কাহিনীর মাধ্যমে নবুওয়াত প্রাপ্তির বহু পূর্বেই তাঁর নবুওয়াতের নিশানা এবং এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তি সম্পর্কে ধারণা দেয়া;

২. এটি আল্ কুরআনের সূরা ইনশিরাহর একটি আয়াতের ধারণাগত ব্যাখ্যা, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে;

৩. এ কাহিনী সত্য ও নির্ভরযোগ্য নয় বলেই প্রতিপন্ন হয়। কারণ, নবী (সা.) পবিত্র সত্তা নিয়ে এবং সকল ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন এবং

৪. এটি অমুসলিম পণ্ডিতদের বানানো একটি অসত্য কাহিনী যা তাঁরা পরিহাসচ্ছলে অথবা তাঁদের কোনো অসত্য ধারণার প্রমাণ স্বরূপ দাঁড় করিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, খ্রিস্টানরা এটি বলে থাকে যে, কোনো মানুষ এমনকি ইসলাম ধর্মের নবী অভ্রান্ত নয় বরং যীশু (যাঁকে কখনই শয়তান স্পর্শ করেনি) ছাড়া প্রত্যেকেই ত্রুটিপূর্ণ কাজ করেছেন। তারা উপসংহার টানে এভাবে যে, একমাত্র যিশু ছিলেন মানব সত্তার ঊর্ধ্বে এবং প্রকৃত অর্থে তিনি মানবের আকৃতিতে ছিলেন এক ঐশী সত্তা। সুতরাং তাদের মতে মুহাম্মাদ (সা,) ছিলেন অপবিত্র যা বক্ষ বিদীর্ণের গল্প ফেদে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাচ্যবিদদের মধ্যে ডারমেনহেম তাঁর 'দি লাইফ অব মোহামেট' গ্রন্থে লিখেছেন,

> 'বক্ষ বিদীর্ণের উপাখ্যানের মাধ্যমে একটি গোঁড়া মতবাদ তুলে ধরা হয়েছে। কালো দাগ মুছে ফেলার মাধ্যমে আদমের আদি পাপের সাথে এর যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে যা থেকে তাদের দাবি মতে শুধু মেরী ও যীশু মুক্ত ছিলেন।'

অন্যদিকে মুরতাজা এ কাহিনীর সত্যতা সরাসরি অস্বীকার করে একে একটি জাহেলী হাদীস বলেছেন যার শিকড় জাহেল লোকের জাহেলী চিন্তার মধ্যে নিহিত। 'আগানী'-কে উদ্ধৃত করে তিনি দেখিয়েছেন যে, জাহেলী যুগে এ ধরনের গল্পের অস্তিত্ব ছিল। আগানীর মতে উমাইয়্যা বিন আবি আল্ সালত নামক এক জাহেল (অজ্ঞ) লোকের ক্ষেত্রে চার বার এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে যখন সে তার বোনের বাড়িতে ঘুমাচ্ছিল। তার বেলায় দুটি পাখি অবতীর্ণ হয় এবং এদের মধ্যে একটি তার বক্ষ বিদীর্ণ করে। তার দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে এস. জাফর মুরতাজা প্রশ্নাকারে সাতটি কারণ উল্লেখ করেছেন যা নিম্নরূপ :

১. ইবনে ইসহাক-এর সিরাত গ্রন্থে এক জ্ঞানী ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, যে ঘটনার কারণে হালিমা নবী (সা.)-কে তাঁর মায়ের কাছে ফেরত দিতে যান তা উপরোল্লিখিত কাহিনীর কারণের চাইতে ভিন্ন ছিল। তাঁর মতে কারণটি ছিল- 'কিছু সংখ্যক আবিসিনীয় খ্রিস্টান তাঁকে দুধ ছাড়ানোর পর ফেরত দেয়ার সময় হালিমার সাথে দেখেছে। তারা হালিমার দিকে তাকিয়ে তাঁর সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল এবং তাঁকে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করেছিল এবং হালিমাকে বলেছিল, 'চল আমরা বালকটিকে আমাদের দেশের রাজার কাছে নিয়ে যাই; কারণ, তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আমরা তাঁর সম্পর্কে সবই জানি।' যে লোক আমাকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছে সে বলেছে, হালিমা তাঁকে কোনোক্রমে তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছিল।

সুতরাং যে হাদীস দ্বারা এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, তাঁর দুধ-মা তাঁকে মরুভূমিতে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনার পর তাঁর মায়ের কাছে ফেরত দিতে আসেন তা সন্দেহযুক্ত।

২. এটি কি করে সম্ভব যে, নবী (সা.)-কে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণের কারণে মায়ের কাছে ফেরত প্রদান করা হলো? একদিকে বলা হচ্ছে এ ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল দুই বা তিন বছর কয়েক মাস। অন্যদিকে বলা হচ্ছে তাঁর পাঁচ বছর বয়সের সময় মায়ের কাছে ফেরত দেয়া হয়। এ দু'টি বর্ণনাকে কী করে এক করা সম্ভব?

৩. এটি কি বিশ্বাসযোগ্য যে, হৃদয়ের কালো দাগ যা আদি পাপের সাথে সংশ্লিষ্ট তা অপসারণের জন্য বক্ষ বিদীর্ণের মতো দৈহিক অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন? এতে কি প্রমাণ হয় যে, কোনো ব্যক্তি যার হৃদয়ে কালো দাগ রয়েছে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তা অপসারণ করা হলে সে পবিত্র হয়ে যাবে? অথবা এটি কি বিশ্বাসযোগ্য যে, এমন একটি ঘটনার শুধু নবীজী (সা.) ছাড়া আর কেউ প্রত্যক্ষদর্শী থাকবে না? তাহলে কি মানবজাতির মধ্যে শুধু নবী (সা.) ব্যতীত আর কারো হৃদয়ে কালো দাগ ছিল না?

৪. একই অস্ত্রোপচার কেনো দীর্ঘ বিরতি দিয়ে বারংবার (চার বা পাঁচ) করা হলো, এমনকি তাঁর নবুয়োত প্রাপ্তির বেশ কিছু বছর পর এবং ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ এবং মেরাজের সময়? এটি কি এজন্য প্রয়োজন ছিল যে, শয়তানের কালো দাগ নবীর হৃদয়ে এত গভীরভাবে লেগে ছিল যে, তা বার বার পরিদৃষ্ট হচ্ছিল? এটি কি ক্যান্সারের মতো যে, একবার অস্ত্রোপচারে তা অপসারণ না হওয়ায় বার বার অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে? উপরন্তু, আল্লাহতা'আলা কেনো তাঁর নবীকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য বার বার নির্যাতন ও শাস্তির সম্মুখীন করবেন? তাঁর পক্ষে তাঁর নবীকে শয়তানি কালো দাগমুক্ত করে কি সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না?

৫. যদি আল্লাহতা'আলা তাঁর কোনো বান্দা নীতিহীন এবং পাপী যেন না হয় এটা চান তাহলে এটা কি জরুরি যে, তার ওপর এমন ভয়ানক শুদ্ধিকরণ ব্যবস্থা চালাবেন যা অন্যের দৃষ্টিগোচর হয়? এবং এটি কি প্রমাণ করে না যে, নবী (সা.) অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোনো ভালো কাজ করতে বাধ্য ছিলেন যেহেতু তাঁকে এ প্রক্রিয়ায় অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পবিত্র করা হয়?

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৬. নবীদের মধ্যে কেনো শুধু মুহাম্মাদ (সা.)-কে এ ধরনের অস্ত্রোপচারের জন্য বেছে নেয়া হয়? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পাশাপাশি তিনিই হলেন একমাত্র নবী যাঁর হৃদয়ের কালো দাগ মোচনের জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ছিল? অথবা এটা কি সম্ভব যে, অন্য নবীদের হৃদয়েও এরকম শয়তানি ছাপ ছিল, কিন্তু যে সমস্ত ফেরেশতা অস্ত্রোপচারের জন্য দায়িত্ববান ছিলেন তাঁরা তখনও জানতেন না কী করে তা করতে হয়?

৭. সর্বশেষ, এ কি কুরআনের সে আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নয় যেখানে নিশ্চয়তা দিয়ে বলা হয়েছে : 'যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর ওপর যাদের আস্থা আছে তাদের ওপর শয়তানের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই'[৬১]; 'না তাঁর খাঁটি বান্দা'[৬২], 'না তাদের ওপর যারা দায়িত্ববান এবং যাদেরকে পবিত্র করা হয়েছে?'[৬৩] ইসলামী চিন্তাধারা অনুযায়ী রাসূলসহ সকল নবী আল্লাহর সবচেয়ে দায়িত্ববান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত যাঁদেরকে আল্লাহ মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন। তাহলে শয়তান কি করে নবী (সা.)-এর ওপর রাত্রিকালে (মেরাজের রাত্রে) ঊর্ধ্বাকাশে যাত্রা এবং বেহেশতে আরোহণ[৬৪] করার সময়ও তাঁর ওপর আধিপত্য এবং প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হয়?

যা হোক, কাহিনীটি শুধু সুন্নীদের দ্বারা বর্ণিত হাদীসে স্থান পেয়েছে এবং এটি কখনই শিয়াদের ইমামদের নিকট থেকে বর্ণিত হয়নি।[৬৫]

নবী (সা.) এবং অপবিত্র যুদ্ধ (হারব আল্ ফিজার)

যুদ্ধটি অপবিত্র যুদ্ধ হিসাবে পরিচিত ছিল। কারণ, সে যুদ্ধে কিনানা এবং কায়েস আইনাল গোত্র পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিষেধাজ্ঞা ভংগ করেছে। অধিকাংশ সুন্নী জীবনীকার এটি বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মাদ (সা.) ফিজার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি তাঁর চাচার পাশে দাঁড়িয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, হাইকেল বলেন যে, মুহাম্মাদ (সা.) এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এ ব্যাপারে মোটামুটি ঐকমত্য রয়েছে। কেউ কেউ দাবি করেন যে, তিনি যে সমস্ত তীর মক্কার ঘাঁটিতে পড়েছিল তা সংগ্রহ করে পুনরায় ব্যবহারের জন্য তাঁর চাচাকে দিতেন। অন্যরা দাবি করে যে, তিনি নিজে তীর ছুঁড়ে সে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

সে যুদ্ধের সময় রাসূল (সা.)-এর বয়স বিবেচনা করে হাইকেল আরও বলেন যে, ইতিহাস থেকে ফিজার যুদ্ধের সময় রাসূল (সা.)-এর বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো কিছু জানা যায় না। কোনো কোনো বর্ণনায় তখন তাঁর বয়স পনের বা বিশ বলা হয়েছে। সম্ভবত বয়স বর্ণনায় এ পার্থক্যের কারণ ফিজার যুদ্ধ প্রায় চার বছর ধরে চলে। যদি মুহাম্মাদ (সা.) এর শুরু দেখে থাকেন তাহলে যুদ্ধ শেষে শান্তির[৭০] সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ২০ বছর।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইবনে ইসহাক-এর 'সিরাত' গ্রন্থে যুদ্ধের সময় নবী (সা.)-এর বয়স চৌদ্দ বা পনের এবং বিশ বছরের উল্লেখ রয়েছে। ইবনে হিশাম-এর মতে মুহাম্মাদ (সা.) যখন যুদ্ধে অংশগ্রহণ[৭১] করেন তখন তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বা পনের। কিন্তু, একই সিরাত গ্রন্থে ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত, অপবিত্র যুদ্ধের সময় রাসূল (সা.)-এর বয়স ছিল বিশ[৭২]। দু'টি বর্ণনা একত্র করে হাইকেল বলেন, 'যেহেতু কথিত যুদ্ধ চার বছরব্যাপী চলেছে সেহেতু দু'টি বর্ণনাই সঠিক এরকম হওয়ার সম্ভাবনা নেই।'[৭৩] অতঃপর হাইকেল নবী (সা.)-এর এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং কতটুকু অংশগ্রহণ করেছেন তার সমর্থনে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির বেশ কয়েক বছর পর তিনি বলেন, 'আমি আমার চাচার সাথে সে যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছি এবং কিছু তীরও ছুড়েছি। আফসোস! আমি যদি এটা না করতাম!'[৭৪]

রাসূল (সা.) ফিজার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এটি কিছু সংখ্যক শিয়া মনীষীর কাছে অগ্রহণযোগ্য। এসব মনীষী তাঁদের দাবির সপক্ষে নিম্নের ৪টি প্রমাণ পেশ করেছেন :

১. এ যুদ্ধ পবিত্র মাসে শুরু হয় এবং রাসূল (সা.) ও তাঁর চাচা আবু তালিব কখনই এ মাসসমূহের পবিত্রতা ভংগ করেননি। যে কেউ রাসূল (সা.) এবং আবু তালিব-এর জীবনী পড়েছে তারা জানে রাসূল (সা.) ও তাঁর চাচা কীভাবে পবিত্র মাসসমূহের মর্যাদা রক্ষা করতেন। আল্ কাফি, আল্ গাদির এবং অন্য উৎসে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, আবু তালিব বিশুদ্ধ ইবরাহীমী ধর্মে বিশ্বাস করতেন। উপরন্তু তিনি ইবরাহীমের ইচ্ছা এবং বিশ্বাসের বাস্তবায়ন করতেন। সুতরাং আবু তালিবের মতো একজন ধার্মিক ব্যক্তির ওপর কি করে পবিত্র মাসসমূহের অপবিত্রতা সাধনের অভিযোগ আনা যায়? আবু তালিবের যুদ্ধে অংশগ্রহণ অস্বীকার করা হলে এর অর্থ দাঁড়ায় মুহাম্মাদ (সা.) যিনি তার তত্ত্বাবধানে এবং নির্দেশে চলতেন তিনি এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।[৭৬]

২. ইয়াকুবী বলেন : বর্ণিত আছে যে, আবু তালিব বনু হাশিম-এর কারো ফিজার যুদ্ধে যোগদান নিষিদ্ধ করে বলেন 'এটি একটি অত্যাচার, একটি বৈরী আচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং পবিত্র মাসসমূহের মর্যদার পরিপন্থী।' আবু তালিব জোর দিয়ে বলেন, আমি এবং আমার পরিবারের কেউ এ যুদ্ধে অংশ নিবে না। বনু হাশিম-এর একমাত্র জুবায়ের বিন আবদ আল্ মুত্তালিব তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং মিত্রদের চাপে পড়ে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইয়াকুবী আরও বলেন যে, আবদুল্লাহ বিন জাদান আল্ তাইমি এবং হারব বিন উমাইয়্যা বলে যে, তারা কোনো ব্যাপারে এমন কোনো অবস্থান কখনও বেছে নেবে না যা বনু হাশিম-এর অবস্থানের বিপরীত।[৭৭]

৩. হাদীসের বৈপরীত্য আর একটি কারণ। কোনো কোনো হাদীসে তাঁর ভূমিকা সীমাবদ্ধ করেছে মক্কা শিবিরে যে সমস্ত তীর পড়ত তা কুড়ানো এবং বহন করার মধ্যে যাতে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সেগুলো তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে পুনরায় ব্যবহার করা যায় এবং তাঁকে এ বলে অভিযুক্ত করা হয় যে, তিনি তাঁর চাচার অস্ত্রশস্ত্র পাহারা দিতেন।[৭৮] একদল বর্ণনাকারী এটি বলেন যে, তিনি শত্রুর দিকে কিছু তীর ছুঁড়েছেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি আক্ষেপ করতেন এ বলে যে, তিনি যদি এটা না করে থাকতেন।[৭৯] তৃতীয় এক দল বর্ণনাকারী বলেন, নবী (সা.) আবু বারা (বনু কায়েস এর প্রধান এবং বর্শা নিক্ষেপক)-কে এমনভাবে আহত করেন যে সে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়।[৮০]

৪. কোনো কোনো বর্ণনা যেমন ইবনে হিশাম-এর বর্ণনা পরস্পর বিরোধী। প্রথমত তিনি বলেন যে, নবী (সা.) তাঁর চৌদ্দ বছর বয়সে ফিজার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু শেষের দিকে ইবনে ইসহাক এ অভিমত তুলে ধরে বলেন যে, নবী (সা.)-এর বয়স যখন ২০ অর্থাৎ হাতি বর্ষের বিশ বছর পর ফিজারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। [৮১] পরস্পর বিরোধিতার আর একটি উদাহরণ হলো ইয়াকুবীর বর্ণনা যাতে বলা হয়েছে হারব বিন উমাইয়্যা ফিজার-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। অথচ অন্য বর্ণনাকারীদের মতে হারব যখন কুরাইশ এবং কিয়ানা গোত্রের প্রধান ছিলেন তখন এ যুদ্ধে অংশ্রগহণ করেন।[৮২]

উপসংহারে আমরা বলতে পারি, রাসূল (সা.) না ফিজারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, না এ যুদ্ধে কোনো পক্ষ অবলম্বন করেছেন। বর্ণনাকারীদের বর্ণনার বৈপরীত্যের কারণ হলো উমাইয়্যারা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য এ ধরনের অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়েছে।

রাসূল (সা.)-এর শাম যাত্রা

অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে আমরা এমন একটি বিখ্যাত ঘটনার উল্লেখ করতে পারি যেটি প্রায় সকল ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার গ্রহণ করেছেন। সেটি হলো চাচা আবু তালিব-এর সাথে প্রথম শাম সফরে ধর্মযাজক বাহিরা কর্তৃক তাঁর নবী হওয়ার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণীর কথা। ইবনে ইসহাক-এর মতে ঘটনাটি ছিল এরকম- তিনি (বাহিরা) কাফেলার লোকদের মধ্যে মেঘের ছায়াসহ আল্লাহর নবীকে দেখতে পেলেন। তারা ধর্মযাজকের নিকটবর্তী একটি গাছের ছায়ায় এসে থামল। তিনি মেঘের দিকে তাকিয়ে দেখলেন মেঘ গাছটিকে ছায়ায় ঢেকে দিয়েছে এবং ছায়ায় অবস্থান করা পর্যন্ত গাছের ডালগুলো নবী (সা.)-এর ওপর নুয়ে পড়েছিল।[৮৪] বাহিরা এ অসাধারণ ঘটনা দেখার পর নবী (সা.)-এর দিকে ভালো করে তাকিয়ে 'বাইবেলে বর্ণিত লক্ষণসমূহ খুঁজছিলেন'। তিনি তাঁকে অনেক প্রশ্ন করলেন 'এবং নবী (সা.) তাঁকে যা বললেন তার সাথে বাহিরা যা জানতেন তাঁর মিল খুঁজে পেলেন।'[৮৫] বাহিরা তাঁর নবুওয়াত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন এবং আবু তালিবকে পরামর্শ দিলেন : 'আল্লাহর ওয়াস্তে তাঁকে ইয়াহুদীদের থেকে রক্ষা করেন! কারণ, যদি তারা তাঁকে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

দেখতে পায় এবং আমি যা জানি তা যদি জানতে পায় তাহলে তারা তাঁর ক্ষতি করবে; আপনার এ ভাতিজার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে, সুতরাং তাঁকে তাড়াতাড়ি বাড়ি নিয়ে যান।'[৮৬]

সারাংশ

১. রাসূল (সা.)-এর জন্মতারিখ নিয়ে মতভেদের কারণ হলো সুন্নী এবং শিয়া উভয় উৎস হতে বর্ণিত হাদীস এবং সিরাত-এর বৈপরীত্য।

২. রাসূল (সা.)-এর জন্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বর্ণিত কোনো অস্বাভাবিক ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। মোটের ওপর যে সমস্ত উদ্ধৃতিতে এরকম অস্বাভাবিক ঘটনার বর্ণনা রয়েছে তা একটি সম্ভাবনার ইংগিত বহন করে যে, হযরত আমিনার গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসবের মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল। তারা দেখাতে চায় অন্য নবীদের জন্মের[৮৭] মতো মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্মলগ্নেও কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। এ অলৌকিক ঘটনাসমূহ তাঁর নবুওয়াতের চিহ্ন বহন করছিল। নবী (সা.)-এর নবুওয়াত-পূর্ব জীবনের বর্ণনায় এটি তুলে ধরা হয়েছে যে, তাঁর নবুওয়াত কোনো আকস্মিক বা দৈব ঘটনা নয়; বরং এমন অনেক ঘটনা ঘটেছিল যা ক্রমান্বয়ে তাঁর আল্লাহর নবী হওয়াকে নিশ্চিত করেছে। যে কেউ নবী (সা.)-এর জন্মের সময় বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাসমূহ সম্পর্কেও একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারে। সংক্ষেপে, এগুলোকে ইরহাস (এক ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী) বলে বিবেচনা করা যায়। 'নবীদের জীবন অন্য মানুষের মতোই' এ কল্পিত মতের সাথে বিরোধ না করেও পূর্ববর্তী নবীদের সম্পর্কে এ ধরনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

৩. রাসূল (সা.)-এর শৈশবের বর্ণনায় তৎকালে শিশুদের জন্য ধাত্রী মায়ের ব্যবস্থা করা মক্কাবাসীর আভিজাত্যের লক্ষণ হিসাবে দেখানোর পরও কোনো কোনো জীবনীকার কিভাবে বলার চেষ্টা করেছেন যে, মুহাম্মাদ (সা.) ইয়াতিম এবং গরীব বিধায় ধাত্রীরা তাঁর দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে? মূলত যদি ধরে নেয়া হয় যে, মুহাম্মাদ (সা.)-কে ধাত্রীদের সামনে হাজির করা হয়েছে তাহলে এটি প্রমাণ করে যে, তিনি মক্কার অভিজাত পরিবারের সন্তান। আর এটি সত্য হয়ে থাকলে দানশীলতা, সম্মান এবং কুরাইশ সর্দার[৮৮] হিসাবে সকল গোত্রের মধ্যে তাঁর দাদার ব্যাপক পরিচিতি থাকার পরও এটি কি করে সম্ভব যে, ধাত্রীরা তাঁর দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছিল? এটাও বলা হয় যে, নবী (সা.) তাঁর পিতা আবদুল্লাহর কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে কমপক্ষে ৫টি উট, একপাল ভেড়া, একটি তলোয়ার এবং কিছু নগদ অর্থ পান যা তাঁর ধাত্রী রাখার জন্য যথেষ্ট। আসলে মুহাম্মাদ (সা.) হালিমা সাদিয়া কর্তৃক প্রতিপালিত হওয়ার পেছনে প্রকৃত কারণ হলো তিনি হালিমা ব্যতীত অন্য কোনো

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ধাত্রীর দুধ পান করছিলেন না। যখন হালিমা কুরাইশ শিশুটিকে দুধ পানের জন্য বুকে তুলে নিলেন তখন অকস্মাৎ শিশুটি তাঁর ধাত্রী মায়ের দুধ আঁকড়ে ধরে যা তাঁর পরিবারকে উৎফুল্ল করেছিল। আবদুল মুত্তালিব তখন হালিমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোন্ গোত্রের অন্তর্গত?' উত্তর দিলেন, 'আমি বনু সাদ গোত্রের।' তিনি তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন তাঁর নাম হালিমা। মুত্তালিব এতে খুবই খুশী হলেন এবং বললেন : 'চমৎকার, চমৎকার! দু'টি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য : পরিত্রাণ (সা'দ-সাআদা) এবং ধৈর্য (হিলম)। দু'টি চমৎকার গুণ যা চিরস্থায়ী সুখ এবং ঔজ্জ্বল্য[৮৯] প্রকাশ করে তার জন্য তোমাকে শুভ সংবাদ হালিমা!'

৪. নবী (সা.)-এর বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, কাহিনীটি অসত্য এবং অযৌক্তিক এবং এটি রাসূল (সা.)-এর ব্যক্তিত্বের জন্য ধ্বংসাত্মক।

৫. অপবিত্র যুদ্ধে (যা আক্রমণাত্মক ছিল) আমরা রাসূলের অংশগ্রহণ নাকচ করি। কারণ, এ যুদ্ধ পবিত্র মাসসমূহের পবিত্রতা বিনষ্টকারী, যা নবী (সা.) এবং তাঁর চাচা কুরাইশ সর্দার আবু তালিব সব সময় রক্ষা করেছেন। এ কারণে ইসলাম-পূর্ব একটি সামাজিক আচারকে ইসলাম অনুমোদন করেছে এবং মুসলমানদের পবিত্র মাসে যুদ্ধ না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৬. জীবনীকারগণ রাসূল (সা.)-এর প্রথম শাম সফর সম্পর্কে জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, ধর্মযাজক কী করে মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাঝে বাইবেলে[৯০] বর্ণিত নবুওয়াতের চিহ্ন আবিষ্কার করলো। ধর্মযাজক নবীর চাচা আবু তালিবকে জানালেন যে, তাঁর ভাতিজা আল্লাহর নবী হবেন।[৯১] এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চিতভাবে নবী জীবনের কোনো অসাধারণ ঘটনার ইংগিত করে যা বেশির ভাগ জীবনীকার না অস্বীকার করেছেন, না অবহেলা করেছেন। এ ঘটনা আবু তালিবকে নিশ্চিত করেছে যে, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর নবী হবেন।[৯২]

গ্রন্থপঞ্জী

আবু আল্ ফারাজ আল্ ইসফাহানী. আল্ আগানী. ভলিউম ৪, সামির যাবির কর্তৃক সম্পাদিত, বৈরুত, দার আল্ কুতুব আল্ ইসলামিয়া, ১৯৮৬;

আল্ বুতি, মুহাম্মাদ সাংরিদ রামাযা, ফিকহ্ আল্ সিরা, নতুন সংস্করণ বৈরুত: দার আল্ ফিকর, ১৯৮০;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আল্ হালাবি, আলী বুরহাম আল্ দীন, আল্ সিরা আল্ হালাবিয়া ফি সিরাত আল্ আমিন আল মা'মুন, ভলিউম ১ ও ২, বৈরুত : দার আল্ মা'আরিফ, ১৯৮০;

আল্ ইরবিলি, আলী বিন ঈসা, কাসফ আল্ গাম্মা ফি মা'আরিফাত আল্ আইম্মা. দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত : দার আল্ আদওয়া, ১৯৮৫;

আল্ কুলাইনী, মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব, আল্ কাফি, আল্ উসূল আর রাওযা. ভলিউম ৭, আল্ গাফফারী সম্পাদিত, তেহরান : আল্ মাকতাবা আল্ ইসলামিয়া, ১৯৬২;

আল্ কুলাইনী, মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব, আল্ কাফি, আল্ উসূল, ভলিউম ১, খণ্ড ১, দি বুক অব এক্সিলেন্স অব নলেজ, সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হাসান রিজভী কর্তৃক ইংরেজিত অনূদিত, তেহরান : ওয়াফিস, ১৯৭৮;

আল্ মাকরিজি, তাকি আল্ দীন আহমাদ বিন 'আলী ইমতা আল্ আসমা', ভলিউম ১, মাহমুদ মুহাম্মাদ শাকির সম্পাদিত, কায়রো : মাতবাআত লাজনা আল্ তালিফ ওয়াল তরজমা ওয়াল নশ্‌র, ১৯৪১;

আল্ মুরতাদা আল্ আমিলি, আল্ সাইয়্যেদ জাফর. আল্ সহিহ মিন সিরাত আল্ নবী আল্ আজমি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ভলিউম ১ ও ২, কোম : ১৯৮৩;

আল্ মুরতাদা আল্ আমিলি, আল্ সাইয়্যেদ জাফর, আল্ সহিহ মিন সিরাত আল্ নবী আল্ আজমি, তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা, অপ্রকাশিত, জুলাই : ১৯৯৩;

আল্ মুরতাদা আল্ আমিলি, আল্ সাইয়্যেদ জাফর, দিরাসাত ওয়া বুহুছ ফি আল্ তারিখ ওয়াল ইসলাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, ভলিউম ১, কোম : ১৯৮৩;

আল্ তাবারী, আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির, তারিখ আল্ রাসূল ওয়াল মুলুক, পঞ্চম সংস্করণ, ভলিউম ২, মুহাম্মাদ আবু আল্ ফজল ইবরাহিম, কায়রো : দার আল্ মাআরিফ, ১৯৭৭;

ডারমেনহেম, এমিল, দি লাইফ অব মোহামেট, আরবেল্লা ইয়র্কি অনূদিত, নিই ইয়র্ক : দি ডায়াল প্রেস, ১৯৩০;

হাইকেল, মুহাম্মাদ হুসাইন. দ্য লাইফ অব মুহাম্মাদ, হায়াত মুহাম্মাদ-এর অষ্টম সংস্করণ হতে ইসমাইল রাজি, এ. আল্ ফারুকি অনূদিত, নর্থ আমেরিকান ট্রাস্ট পাবলিকেশন, ১৯৭৬;

ইবনে আসির, ইজ্জ আল্ দিন আবি আল্ হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ, আল্ কামিল ফি আল্ তারিখ, ভলিউম ১ ও ৩, বৈরুত : দার সাদির, ১৯৬৫;

ইবনে আসির, ইজ্জ আল্ দিন আবি আল্ হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ, উসদ আল্ ঘাবা ফি মারিফাত আল্ সাহাবা, ভলিউম ১, কায়রো : আল্ সা'ব, ১৯৭০;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইবনে হিশাম, আবু মুহাম্মাদ আবদ আল্ মালিক, আল্ সিরা আল্ নবুবিয়াহ, ভলিউম ১, উমর আল্ সালাম তাদমুরি, বৈরুত : দার আল্ কিতাব আল্ আরাবি, ১৯৮৭;

ইবনে কাসির, ইসমাইল আবু আল্ ফিদা, আল্ বিদায়া ওয়া আল্ নিহায়া, ভলিউম ১, ২ ও ৩, আহমাদ আবু মুসলিম এট এল সম্পাদিত, বৈরুত : দার আল্ কুতুব আল্ ইলমিয়া, ১৯৮৫;

ইবনে কাসির, ইসমাইল আবু আল্ ফিদা, আল্ বিদায়া ওয়া আল্ নিহায়া, ভলিউম ১, মুসতফা আবদ আল্ ওয়াহিদ সম্পাদিত, বৈরুত : দার ইয়াহইয়া আল্ তুরাছ আল্ আরাবি, ১৯৮০;

মজলিসি, মুহাম্মাদ বাকির, বিহার আল্ আনওয়ার, ভলিউম ১১, ১৫, ১৮ ও ৪৬, বৈরুত : আল্ ওয়াফা. ১৯৮৩;

ম্যুর, স্যার উইলিয়াম, দি লাইফ অব মুহামেট ফ্রম অরিজিনাল সোর্সেস, নতুন সংস্করণ, প্রথম সংস্করণের চার ভলিউম হতে সংকলিত (১৮৬১ সনে প্রকাশিত), লন্ডন : ওয়াটারলু প্যালেস, ১৮৭৭;

মুসলিম বিন আল্ হাজ্জাজ, সহিহ মুসলিম, ভলিউম ১, মূসা শাহিন লাসিন এবং আহমাদ উমর হাশিম কর্তৃক সম্পাদিত, বৈরুত : মুআস্সাসাত ইজ্জ আল্ দীন, ১৯৮৭;

মুসলিম, আবু আল্ হুসাইন বিন আল্ হাজ্জাজ, সহিহ মুসলিম. ভলিউম ৮, কায়রো : আল্ আজহার, ১৯১৫;

রাসূলি মাহাল্লাতি. তারিখ তাহলিলি ইসলাম, ভলিউম ১ ও ২, তেহরান : ইরশাদ ইসলামি, ১৯৯২;

সাদুক, আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আলী, ইকমাল আল্ দীন ওয়া ইতমাম আল্ নিয়মা, নাজাফ : আল্ মাতবা আল্ হায়দারিয়া, ১৯৭০;

সুবহানি, জাফর, ফুরুগে আবাদিয়্যাত, ভলিউম ১, কোম : দাফতরে তাবলিগাতে ইসলামী, ১৯৯৩;

তাবারসি, আবু আলী আল্ ফজল বিন আল্ হাসান, মাজমা আল্ বায়ান ফি তাফসির আল্ কুরআন. ভলিউম ৩ ও ৫, কোম : মাকতাবাত, আয়াতুল্লাহ মারাসি, ১৯৮৩;

তাবাতাবাই, মুহাম্মাদ হুসাইন, আল্ মিজান ফি তাফসির আল্ কুরআন, ভলিউম ১৩, ১৪ ও ২০. বৈরুত : আল্ আ'লামি, ১৯৭০;

ইয়াকুবি, আহমাদ বিন আবি ইয়াকুবি, ভলিউম ২, মুহাম্মাদ ইবরাহীম আয়াতি কর্তৃক ফারসিতে অনূদিত. তেহরান : ১৯৬৫;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তথ্যসূত্র

১. সিএফ. রাসূলি, তারিখ, ভলিউম ১, পৃ. ১০৭;

২. ইবনে হিশাম, আল্ সিরা আল্ নবুবিয়াহ, প্রথম সংস্করণ, উমর আবদ আল্ সালঅম তাদমুরি (বৈরুত : দার আল্ কিতাব আল্ আরাবী, ১৯৮৭), ভলিউম ১, পৃ. ১৮৩-১৮৪; ইয়াকুবী, তারিখে ইয়াকুবী, মুহাম্মাদ ইবরাহীম আয়াতি (তেহরান) ভলিউম ১, পৃ. ৩৮৫। কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক হাতি বর্ষের বাহিরে অন্য তারিখের পক্ষে মত দেন। তাঁরা বলে থাকেন, এটি হাতির ঘটনার কয়েক বছর পূর্বেই ঘটেছিল। উদাহরণস্বরূপ, আল্ মাকরিজি তাঁর ইমতা আল্ আসমা গ্রন্থে হাতি বছরের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক জন্ম তারিখের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এ সকল ধারণার মধ্যে পার্থক্য পনের থেকে হাতি বর্ষের পর চল্লিশ বছর পর্যন্ত। আল্ মাকরিজি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে হাতি বর্ষকে সমর্থন করেন। দ্রষ্টব্য : রাসূলি, তারিখ, ভলিউম ১, পাদটীকা, পৃ. ১০৭-১০৮, আল্ মাকরিজি হতে, ভলিউম ১, পৃ. ৩-৪;

৩. হাইকেল, হায়াত, পৃ. ১০৮; মুরতাদা, আল্ সহিহ, ভলিউম ১, পৃ. ৭৮;

৪. মজলিসি উল্লেখ করেন, ইমামী মতানুসারীরা একমত যে, রাসূল (সা.) শুক্রবার, ১৭ রবিউল আউয়াল জন্মগ্রহণ করেন। সুন্নীরা মনে করেন যে, এটি ছিল সোমবার, ১২ রবিউল আউয়াল, যদিও কেউ কেউ ৮ এবং অন্যরা ১০ তারিখ; আবার কেউ রমজান মাসের উল্লেখ করেছেন;

মজলিশি, দি লাইফ এন্ড রিলিজিয়ন অব মুহাম্মাদ, হায়াত আল্ কুলুব-এর ইংরেজি অনুবাদ, ভলিউম ২, জেমস এল. মেরিক (১৯৮২), পৃ. ৩৪;

৫. আল্ কুলাইনী, (৯৩৯/৯৪০ খ্রি.) মুসলিম চতুর্থ শতকের প্রসিদ্ধ শিয়া ঐতিহ্যহাসিক, তাঁর আল্ কাফি, আল্ উসূল ওয়া আল্ রাওদা, ভলিউম ৭, পৃ. ১৩১ (মাওলিদ আল্ নবী), তিনি ১২ রবিউল আউয়াল নবীর জন্মদিন সুন্নীদের এ মত সমর্থন করেন। কিন্তু, তিনি বলেন, দিনটি ছিল শুক্রবার, সোমবার নয় যা সুন্নীরা বলে থাকে;

মজলিসি তাঁর বিহার গ্রন্থে সুন্নী এবং শিয়া ঐতিহ্যের পার্থক্য নির্ণয় করে বলেন যে, শিয়াদের মধ্যে আল্ কুলাইনী ইচ্ছাকৃত বা তাকিয়ার কারণে সুন্নী মতকে সমর্থন করেছেন। দ্রষ্টব্য : মজলিসি, বিহার আল্ আওনায়ার, (বৈরুত : আল্ ওয়াফা, ১৯৮৩), ভলিউম ১৫, পৃ. ২৪৮;

৬. মুরতাদা, আল্ সহীহ, ভলিউম ১, পৃ. ৭৮;

৭. হাইকাল, হায়াত, পৃ. ১০৯;

৮. হাইকাল, দি লাইফ, পৃ. ৪৮;

৯. ইবনে হিশাম, আল্ সিরা, ভলিউম ১, পৃ. ১৮৩; ইবনে কাসির, আল্ বিদায়া ওয়াল নাহিয়া, আহমাদ আবু মুসলিম এবং অন্যান্য সম্পাদিত (বৈরুত:আল্ তওরাত আল্ আরাবী,১৯৮০), ভলিউম ২, পৃ.২৪২-২৪৩; আল্ মাকরিজি, ইমতা আল্ আসমা, মাহমুদ মুহাম্মাদ সাকির (কায়রো : ১৯৪১), ভলিউম ১, পৃ. ৩-৪;

১০. ঐ;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১১. আল্ কুলাইনী, আল্ কাফি, আল্ উসূল ওয়াল রাওদা, গাফ্ফারি কর্তৃক সম্পাদিত (তেহরান : আল্ মাকতাবা আল্ ইসলামিয়া, ১৯৬২), ভলিউম ৭, পৃ. ১৩১; মজলিসি, বিহার, ভলিউম ১৫, পৃ. ২৪৮;

১২. একজন ইরাকী শিয়া জীবনীকার যাঁর মৃত্যু ১৯২৩ খ্রি.। তিনি কাসফ আল্ গাম্মা ফি মারিফাত আল্ আয়িম্মা নামক নবী এবং শিয়া ইমামদের জীবনী রচনা করেন।

১৩. মুরতাদা, আল্ সহীহ, ভলিউম ১, পৃ. ৭৯, আল্ ইরবিলির উদ্ধৃতি, কাসফ, দ্বিতীয় সংস্করণ (বৈরুত : দ্বার আল্ আদওয়া, ১৯৮৫), ভলিউম ১, পৃ. ১৪;

১৪. হাইকাল, দি লাইফ, পৃ. ৪৭ এবং ৫১;

১৫. বিস্তারিত জানতে দেখুন : ইবনে ইসহাক, দি লাইফ অব মুহাম্মাদ, এ. গুইলমী (লন্ডন-নিউ ইয়র্ক-টরেন্টো অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৫), পৃ. ৬৯; আল্ তাবারী, তারিখ, ভলিউম ২, পৃ. ১৫৬। এটি শিয়া পণ্ডিতদের দ্বারাও বর্ণিত হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ দেখুন : আল্ সাদুক, ইকমাল আল্ দিন ওয়া ইতমাম আল্ নিয়মা (নাজাফ : ১৯৭০), পৃ. ১৮৯-১৯০; আল্ ইরবিলি, কাসফ, ভলিউম ১, পৃ. ২০-২১;

১৬. ইবনে ইসহাক, দি লাইফ, পৃ. ৭১-৭২; হাইকেল, দি লাইফ, পৃ. ৪৯; মুরতাদা, আল্ সহীহ, ভলিউম ১, পৃ. ৮১;

১৭. ইবনে ইসহাক, দি লাইফ, পৃ. ৭১;

১৮. ঐ, পৃ.৭১;

১৯. হাইকাল, দি লাইফ, পৃ. ৪৯;

২০. ইবনে ইসহাক, দি লাইফ, পৃ. ৭১;

২১. মুরতাদা, আল্ সহীহ, ভলিউম ১, পৃ. ৮১;

২২. আল্ ইরবিলি, কাসফ, ভলিউম ১, পৃ. ১৫; মুরতাদা, আল্ সহীহ, ভলিউম ১, পৃ. ৮১;

ইয়াকুবী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বলেন, আবদুল্লাহ রাসূলের জন্মের দু'মাস পর ইন্তেকাল করেন। তিনি রাসূল (সা.)-এর জন্মের দু'মাস পূর্বে আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেন এ মতের বিরোধিতা করেন। তিনি আরও বলেন, এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, পুত্রের জন্মের পর পিতা ইন্তেকাল করেছেন। এমনকি কোনো কোনো ঐতিহাসিক পুত্রের জন্মের এক বছর পর পিতা ইন্তেকাল করেন এটি বিশ্বাস করতেন। দ্রষ্টব্য : ইয়াকুবী, তারিখ, ভলিউম ২, পৃ. ৩৬২;

২৩. মজলিসি, বিহার, ভলিউম ১৫, পৃ. ১২৫; মুরতাদা, আল্ সহীহ, ভলিউম ১, পৃ. ৮১; ইবনে আসির সংক্ষিপ্ত করে বলেন যে, আবদুল্লাহর মৃত্যু নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। দ্রষ্টব্য: ইবনে আসির, উসদুল গাবা, ভলিউম ১, পৃ. ২০;

২৪. রাসূলি, তারিখ, লিউম ১, পৃ. ১৮২;

২৫. সিএফ. মুরতাদা, আল্ সহীহ, ভলিউম ১, পৃ. ৮১; সুবহানি, ফুরুগে আবাদিয়াত, ৮ম সংস্করণ (কোম : ১৯৯৩), ভলিউম ১, পৃ.১৬০;

২৬. মুরতাদা, আল্ সহীহ, ভলিউম ১, পৃ. ৮১; হাইকাল, দি লাইফ, পৃ. ৪৯;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২৭. হাইকাল, দি লাইফ, পৃ. ৪৮; আরও দেখুন : মুরতাদা, আল্ সহীহ, ভলিউম ১, পৃ. ৮১;

২৮. হাইকেল, পৃ. ৮৯; মুরতাদা, ভলিউম ১, পৃ. ৮৮;

২৯. হাইকাল, পৃ. ৫২; মুরতাদা, ভলিউম ১, পৃ. ৮১-৮২;

৩০. ইবনে ইসহাক, দি লাইফ, পৃ. ৭২; হাইকাল, দি লাইফ, পৃ. ৫২;

৩১. হাইকেল, দি লাইফ, পৃ. ৫১-৫২, মুরতাদা, আল্ সহীহ, ভলিউম ১, পৃ. ৮২;

৩২. মুরতাদা, আল্ সহীহ, ভলিউম ১, পৃ. ৮২;

৩৩. সিএফ. হাইকাল, হায়াত, পৃ. ১১০; ইবনে আসির, উসদুল গাবা, ভলিউম ১ পৃ. ২১; দ্রষ্টব্য : তাবারী, তারিখ, ভলিউম ২, পৃ. ১৫৯; মজলিসি, বিহার, ভলিউম ১৫, পৃ. ৪০১ এবং রাসূলী, তারিখ, ভলিউম ১, পৃ. ১৮৩-১৮৪;

৩৪. ইবনে ইসহাক, দি লাইফ, পৃ. ৭২;

৩৫. ইবনে আসির, উসদুল গাবা, ভলিউম ১, পৃ. ২১;

৩৬. আল্ তাবারী, তারিখ, ভলিউম ২, পৃ. ১৫৯

৩৭. হাইকল, হায়াত, পৃ. ১১০;

৩৮. ইবনে ইসহাক, দি লাইফ, পৃ. ৭১-৭২;

৩৯. ঐ;

৪০. মুসলিম, সহীহ, ভলিউম ১, পৃ. ১৬৫-১৬৬, হাদিস ২৬১; মুরতাদা, আল্ সহীহ, ভলিউম ১, পৃ. ৮২-৮৩;

৪১. হাইকাল, দি লাইফ, পৃ. ৫০-৫১;

৪২. ম্যুর, দি লাইফ, পৃ. ৬-৭; হাইকাল, দি লাইফ, পৃ. ৫১;

৪৩. দি কুরআন, সূরা ইনশিরাহ : ১-২;

৪৪. হাইকেল, দি লাইফ, পৃ. ৫১;

ডারমেনহেম বলেন, 'একটি রহস্যময় অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে দ্বিধাহীন চিত্তে ঐশী বাণী ধারণ এবং প্রচারের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত এবং পরিষ্কার করা হয়েছে যাতে নবুওয়াতের কঠিন দায়িত্ব পালন সহজ হয়।' তিনি আরও বলেন, 'হৃদয় পরিষ্কার করার ঘটনাটি অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তার প্রতীক হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে।' ডারমেনহেম, দি লাইফ, পৃ.৩২-৩৩;

৪৫. হাইকাল, দি লাইফ, পৃ. ৫১;

৪৬. মুরতাদা, আল্-সহীহ, ভলিউম ১, পৃ. ৮৩-৮৪;

৪৭. মুরতাদা, আল্-সহীহ, ভলিউম ১, পৃ. ৮৪, উদ্ধৃতি : আল্ বুক্সি, ফিকাহ আল্ সিরা, পৃ. ৬২-৬৩;

৪৮. ঐ, উদ্ধৃতি : হাইকেল, হায়াত, পৃ. ১১১;

৪৯. ঐ, উদ্ধৃতি : তাবাতাবাই, আল্ মিজান, ভলিউম ১৩, পৃ. ৩২-৩৩, উদ্ধৃতি : আল্ তাবারসি, মাজমা আল্ বায়ান, ভলিউম ৩, পৃ. ৩৯৫;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৫০. ঐ, পৃ.৮৪ এবং ৮৭-৮৮;

৫১. ডারমেনহেম, দি লাইফ, পৃ.৩৩;

৫২. মুরতাদা, আল্ সহীহ, ভলিউম ১, পৃ. ৮৮-৮৯; আবু আল্ ফারাজ আল্ ইস্পাহানী, আল্ আঘানী, ভলিউম ৪, পৃ. ১৩২-১৩৫;

৫৩. ইবনে ইসহাক, দি লাইফ, পৃ.৭৩। দেখুন : মুরতাদা, আল্ সহীহ, ভলিউম ১, পৃ.৮৫;

৫৪. মুরতাদা, আল্ সহীহ, ভলিউম ১, পৃ.৮৫;

৫৫. ঐ;

৫৬. ঐ;

৫৭. ঐ, পৃ. ৮৫-৮৬;

৫৮. ঐ;

৫৯. হালাবি তাঁর সিরাহ গ্রন্থে বলেন যে, শুধু ইসলামের নবী (সা.)-কে এভাবে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। হালাবি এর দ্বারা নবী (সা.)-এর উচ্চ মর্যাদা এবং সম্মান বৃদ্ধির ব্যাপার দেখাতে চেয়েছেন। দেখুন : আল্ হালাবি, আল্ সিরা, ভলিউম ১, পৃ.১৬৭;

৬০. মুরতাদা, আল্ সহীহ, ভলিউম ১, পৃ. ৮৬;

৬১. দি কুরআন, সূরা নাহল : ৯৯।

৬২. ঐ, সূরা ইসরা : ৬৫।

৬৩. ঐ, হিজর : ৩৯-৪০।

৬৪. মুরতাদা, আল্ সহীহ, ভলিউম ১, পৃ.৮৭;

৬৫. মজলিসি, বিহার, ভলিউম ১৫, পৃ. ৩৪৯-৩৫৭;
বিহারের সমালোচক রব্বানী বলেন যে, 'নবী (সা.) এক অনন্য জীবনের অধিকারী ছিলেন এটি প্রমাণের জন্য এরকম একটি অস্বাভাবিক এবং অলৌকিক ঘটনার প্রয়োজন ছিল না।'

৬৬. অধিকাংশ মুসলিম ভাষ্যকার বিশ্বাস করেন যে, পবিত্র মাস চারটি এবং সেগুলো হলো জিলক্বাদ, জিলহাজ, মুহাররাম এবং রজব;

৬৭. ইবনে ইসহাক, দি লাইফ, পৃ. ৮২২; আরও দেখুন : হাইকাল, দি লাইফ, পৃ.৫৬ এবং মুরতাদা, আল্ সহীহ, ভলিউম ১, পৃ. ৯৫;

৬৮. হাইকাল, দি লাইফ, পৃ.৫৭; আরও দেখুন : ইবনে হিশাম, আল্ সিরাহ, ভলিউম ১, পৃ. ২১০;

৬৯. ঐ, পৃ. ৫৭;

৭০. ঐ;

৭১. ইবনে হিশাম, আল্ সিরাহ, ভলিউম ১, পৃ. ২০৮;

৭২. ঐ, পৃ. ২১১; ইবনে ইসহাক, দি লাইফ, পৃ. ৮২;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৭৩. হাইকেল, দি লাইফ, পৃ. ৫৭;

৭৪. ঐ;

৭৫. মুরতাদা, আল্ সহীহ, ভলিউম ১, পৃ. ৯৫;

৭৬. যেহেতু মুরতাদা পরিষ্কারভাবে স্বাভাবিক উপসংহার টানতে পেরেছেন তাই তাঁর প্রথম যুক্তির শেষে এটি উল্লেখ করেন নি;

৭৭. মুরতাদা, আল্ সহীহ, ভলিউম ১, পৃ. ৯৫-৯৬, উদ্ধৃতি আল্ ইয়াকুবি, তারিখ, ভলিউম ২, পৃ. ৩৭১;

৭৮. ঐ, পৃ. ৯৬, উদ্ধৃতি : ইবনে হিশাম, আল্ সিরাহ, ভলিউম ১, পৃ. ২১০;

৭৯. ঐ, উদ্ধৃতি : আল্ হালাবি, আল্ সিরাহ, ভলিউম ১, পৃ. ২০৭;

৮০. ঐ, উদ্ধৃতি : আল্ হালাবি, ইবনে হিসাম, আল্ সিরাহ, ভলিউম ১, পৃ. ২০৮;

৮১. ঐ, উদ্ধৃতি : ইবনে হিসাম, আল্ সিরাহ, ভলিউম ১, পৃ. ২০৮, ২১১;

৮২. ঐ, পৃ. ৯৬-৯৭;

৮৩. ঐ, পৃ.৯৭;

৮৪. ইবনে ইসহাক, দি লাইফ, পৃ.৮০;

৮৫. ঐ;

৮৬. ঐ, পৃ.৮১;

৮৭. যেহেতু কুরআনে উল্লিখিত নবিগণ, যেমন ইবনে মরিয়াম, ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া-র জন্ম কোনো না কোনোভাবে অস্বাভাবিক বা অলৌকিক ঘটনার সাথে জড়িত। দেখুন : আল্ কুরআন, ১৯ : ৭-৩৩;

৮৮. সিএফ, মুরতাদা, আল্ সহীহ, ভলিউম ১, পৃ. ১২৫;

৮৯. ইবনে আসির, উসদুল গাবা, ভলিউম ১, পৃ. ২১; রাসূলি, তারিখ, ভলিউম ১, পৃ. ১৮২; মজলিসি, বিহার, ভলিউম ১৫, পৃ. ১২৫ ও ৪৪২; সুবহানি, ফুরুগে আবাদিয়াত, ভলিউম ১, পৃ.১৬০; হালাবি, সিরাহ, ভলিউম ১, পৃ. ১৪৭;

৯০. হাইকাল, দি লাইফ, পৃ.৫৪;

৯১. মুরতাদা, আল্ সহীহ, ভলিউম ১, পৃ.৯১;

৯২. 'তারা পবিত্র মাসে যুদ্ধ সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে। বলুন, 'এ যুদ্ধ একটি সীমালঙ্ঘনকারী অত্যাচার যা আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধক; তার এবং কাবার প্রতি অবিশ্বাসের ফল।' আল্ কুরআন, ২ : ২১৭।

(আহলে বাইত ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী, তেহরান, ইরানের প্রকাশনা ত্রৈমাসিক ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল 'মেসেজ অব সাকালাইন', ভলিউম ১০ (১) : ১৭-৪৫ (১৪৩০/২০০৯)-এ প্রকাশিত ড. আহমাদ রাহ্নূমায়ী রচিত নিবন্ধ অবলম্বনে বঙ্গানুবাদ)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে পাঁচটি বক্তৃতা

শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহ্হারী

অনুবাদ : মো. শাহ্ নওয়াজ তাবিব

১. সৃষ্টির লক্ষ্য;
২. ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে নৈতিকতার ভিত্তি;
৩. বিশ্বাস, বিভিন্ন মতবাদ ও বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি;
৪. ইসলামী বিশ্বাস এবং মানবীয় পূর্ণতা ও
৫. ইসলামী একত্ববাদ : উপসংহার।

এ পাঁচটি বক্তৃতা, জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য– স্রষ্টাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। প্রথম বক্তৃতা একটি ভূমিকা আর শেষটিতে সারসংক্ষেপ ও উপসংহার টানা হয়েছে। প্রথম প্রকাশকের ভূমিকায় এ ভাষণগুলোর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, 'আজ মানবজাতির জীবনে এত বেশি তিক্ততা পরিদৃষ্ট হচ্ছে যে, দুঃখ-দুর্দশা, বেদনা, তা কি জীবনের লক্ষ্য নিরূপণে মানবজাতির ব্যর্থতার পরিণাম নয়?'

প্রথম বক্তৃতায় নবী-রাসূলগণের প্রথম লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে উপরিউক্ত প্রশ্ন নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, সৃষ্টির একটি লক্ষ্য রয়েছে যার একটি 'সৃষ্টি' হচ্ছে-এর জীবের পক্ষে পূর্ণতা অর্জন– স্রষ্টা যার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নবী-রাসূলগণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এ বিষয়টির অগ্রগতি সাধন করে বলে স্বীকৃত। ঐশী প্রত্যাদেশের আলোকে সবাইকে আহ্বান করা হয়েছে তার 'সম্ভাবনা' অনুধাবন করার এবং তাদের প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য অর্জন করার– স্রষ্টার উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত যাত্রার আগে যা পরিপূর্ণতা লাভ করবে। আর স্রষ্টার কাছে যাবার ব্যাপারটি সকল সৃষ্টির জন্যই অবধারিত।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

দ্বিতীয় বক্তৃতায় বা ভাষণে বলা হয়েছে যে, দার্শনিক মতবাদের সাথে আধ্যাত্মিক আদর্শেরও সমন্বয় থাকা প্রয়োজন যাতে ব্যক্তি কিংবা সমাজ সবারই অর্জনের জন্য সামনে কোনো লক্ষ্য থাকে। এখানে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় স্রষ্টার প্রতি তাদের সহজাত আধ্যাত্মিক দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে (যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব না থাকে তাহলে যে যার খুশীমতো চলতে পারে)। মানবজাতির অনন্য বৈশিষ্ট্য-পারস্পরিক সচেতনতার ভিত্তিতে এর পরিসমাপ্তির প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়।

তৃতীয় ভাষণ থেকে এ ব্যাখ্যাটিই উপস্থাপিত হয়েছে যে, কোনো মতবাদ বা সামাজিক আদর্শে বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ থেকে প্রেম, আকর্ষণ এবং অন্যান্য গুণ মানবের জীবনে বিকাশ লাভ করে। এ প্রেক্ষাপটে ইসলামের সাথে একত্ববাদের সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়, বিশেষ করে চিরন্তন প্রেক্ষাপটে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও মানবতাবাদের গণ্ডি পেরিয়ে তা এগিয়ে যায়।

চতুর্থ ভাষণে মানবীয় পূর্ণতা অর্জনে বিশেষ শক্তি হিসাবে ইসলামী বিশ্বাসকে নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। কিছু উপকারী প্রভাব বয়ে আনে বলেই শুধু বিশ্বাস স্থাপনকে আশীর্বাদ রূপে গণ্য করা যায় না; বরং ঐ বিশ্বাস স্থাপনের দাবি হলো নিরবচ্ছিন্নভাবে পূর্ণতার দিকে ধাবিত হওয়া। বস্তুত কিছু উপকার পাওয়া আমাদের জীবনের লক্ষ্য নয় বা লক্ষ্য হওয়াও উচিত নয়। ইবনে সিনার কথায় 'পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করার অর্থ হচ্ছে বেতন না থাকলে কাজ করার ইচ্ছেও থাকে না।' ইবাদাত নিয়ে হযরত আলী (আ.)-এর ভাষায় একটি ইসলামী যুক্তি এভাবে উপস্থাপন করা যায়। তিনি বলেন, 'হে প্রভু! তোমার জাহান্নামের আগুনের ভয়ে অথবা তোমার জান্নাত পাওয়ার লোভে আমি তোমার উপাসনা করি না। আমি তোমার উপাসনা করি তুমি উপাসনার যোগ্য বলে।'

পঞ্চম ভাষণে মানবীয় পূর্ণতা প্রসঙ্গে সক্রেটিস, প্লেটো, জেনো এবং প্রক্টোরাল দার্শনিকসহ অনান্য মতামত পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে বলা হয় : স্রষ্টা পিতা বা অন্য কোনো ব্যক্তি অথবা পিতৃজাতীয় কোনো সত্তার সাথে তুলনীয় নয়। তিনি তা-ই যা তিনি এবং অন্যান্য সবকিছুরও অধিকারী তিনি। যেরূপ বলা হয়েছে শেখ সা'দীর বুস্তানে : 'বুদ্ধির পথ হচ্ছে একটি গোলক ধাঁধা তবে জ্ঞানীদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া কেউ নেই'।

জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিচারক্ষমতা, সত্য, সৌন্দর্য, স্বাধীনতা এবং অন্যদের প্রতি ভালোবাসা এ সবকিছুই তাঁর বদৌলতে, এমনকি তাঁর (পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি) কল্যাণস্বরূপ আরোপিত। ফলে আমাদের প্রতি তাঁর দাবি হচ্ছে সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি–কেবল আনুষ্ঠানিক উপাসনা নয়। নিরবচ্ছিন্নভাবে সচেতন থেকে আমাদের আচার-আচরণ পরিশুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে তা পালন করা সম্ভব।

সৃষ্টির লক্ষ্য

অনুসন্ধান করার সময় যে সব মৌলিক সমস্যা সামনে এসে দাঁড়ায় তার অন্যতম হচ্ছে 'জীবনের লক্ষ্য'। মানুষ সব সময় জানতে চায় সে কেনো বেঁচে আছে এবং তার জীবনের লক্ষ্য কী হওয়া

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

উচিত। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন এমনও প্রশ্ন করতে পারে, নবী-রাসূল প্রেরণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী?

নবী-রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য, যাদের কাছে তাঁদের পাঠানো হয়েছে এমন লোকদের ব্যক্তিগত জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ নয়। কারণ, নবী-রাসূলদের পাঠানো হয়েছে নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যের প্রতি সাধারণ মানুষকে ধাবিত করার জন্য। আরও একধাপ এগিয়ে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি, মানবসহ অন্যান্য প্রাণী সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী?

এ বিষয়টির একটি সঠিক বিশ্লেষণ দরকার। এটা হয়তোবা সৃষ্টিতে স্রষ্টার লক্ষ্য বা তাঁর ইচ্ছে-উদ্দেশ্যের প্রকাশ সংক্রান্ত বিষয়। আমরা স্রষ্টার জন্য কোনো লক্ষ্য অনুমান করতে পারি না এবং বিশ্বাস করতে পারি না যে, তিনি কাজের মাধ্যমে কিছু অর্জন করার চেষ্টা করেন। এরকম কোনো ধারণা কর্ম সম্পাদনকারীর একটি ত্রুটি উত্থাপন করে যা ক্ষমতাবান কোনো সৃষ্টি বা প্রাণীর ক্ষেত্রে সত্য, তবে স্রষ্টার জন্য নয়; যেহেতু এর অর্থ দাঁড়ায় তিনি পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে চান এবং কিছু নিরাপদ রাখতে চান যা তাঁর নেই। তবে কখনও কখনও 'সৃষ্টির লক্ষ্য' বলতে সৃষ্টি কাজের লক্ষ্যকে বোঝায়, স্রষ্টাকে নয়। সেক্ষেত্রে পূর্ণতার উদ্দেশ্যে স্রষ্টার অভিযাত্রার সম্পর্ক পাওয়া যায়। স্রষ্টার নিজের পূর্ণতা নয়। যদি এভাবে আমরা চিন্তা করি যে, স্রষ্টার প্রকৃতি হলো সর্বদা পূর্ণতার অন্বেষণে অগ্রসর হওয়া; আর তখনই আমরা স্রষ্টার একটি উদ্দেশ্য খুঁজে পাই।

ব্যাপারটাও এরকম। সৃষ্ট প্রতিটি সত্তার সামনে অর্জনযোগ্য পূর্ণতার একটি পর্যায় বিরাজ করছে। আর প্রতিটি বস্তুর জন্যই রয়েছে অবনতি বা পূর্ণতার পর্যায়– সর্বোচ্চ সীমায় না পৌঁছানো পর্যন্ত। 'মানব সৃষ্টির লক্ষ্য' সংক্রান্ত প্রশ্নটি এমন এক মৌলিক প্রশ্ন যা 'মানব স্বভাব'-কেও তুলে ধরে–তার মধ্যে যত প্রতিভা-ই থাকুক বা যত ব্যক্তিগত পূর্ণতা-ই তার জন্য সম্ভব হোক না কেনো। যখন কেউ ঐ পূর্ণতা অর্জন করতে পারে, আমরা তখন বলতে পারি যে, ঐ জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় 'মানব সৃষ্টির লক্ষ্য'-কে আলাদা বিষয় রূপে বিশদভাবে আলোচনা করার দরকার নেই। মানুষ কী ধরনের প্রাণী এবং তার মধ্যে কী ক্ষমতা আছে এ টুকু জানাই যথেষ্ট। অন্য কথায় আমাদের দেখা উচিত ইসলাম কীভাবে মানব ও তার সক্ষমতার বিষয়টি তুলে ধরে। কেননা, আমরা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়; বরং ইসলামের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

স্বভাবতঃই নবী-রাসূলদের উদ্দেশ্যও ছিল মানুষকে পূর্ণতা উপহার দেয়া এবং তার সব দোষ-ত্রুটি দূর করা– যা ব্যক্তিগতভাবে তার অথবা তার সমাজের পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল ঐশী প্রত্যাদেশের সাহায্যেই মানব সমাজ সে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

অনুরূপভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির দেখা উচিত তার মধ্যকার সম্ভাব্য ক্ষমতা অনুধাবনের পর সে কী হতে পারে, যাতে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। আর এটাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। এতক্ষণ এ বিষয়কে সাধারণভাবে তুলে ধরা হলো। এখন আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাবো : কুরআনে কি মানবের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

লক্ষ্য নিয়ে কিছু বলা হয়েছে অথবা এতে মানব সৃষ্টির লক্ষ্য বা নবী-রাসূল প্রেরণের কোনো কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে?' প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, সুখ অন্বেষণের জন্যই মানবের সৃষ্টি এবং মানব-সৃষ্টি থেকে স্রষ্টা কোনো উপকার চান না বা পান না। প্রকৃতপক্ষে মানবকে তার পথ মুক্তভাবে বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে; তার প্রতি নির্দেশিকা আসলে দায়িত্ব ও বিশ্বাস মাত্র, এটা বাধ্যতামূলক বা স্বভাবজাত নয়। তাই যেহেতু সে স্বাধীন, তার উচিত সঠিক পথ বেছে নেয়া। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আমরা মানুষকে পথ দেখিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে বা অকৃতজ্ঞ হবে।' (সূরা দাহর : ৩)

কিন্তু পবিত্র কুরআন অনুসারে 'সুখ' কী? প্রায়ই বলা হয়, মানব সৃষ্টি এবং নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে জ্ঞান অর্জন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে শক্তিশালী করা যাতে সে অনেক বেশি শিখতে পারে এবং তার যা দরকার তা অর্জনের ক্ষমতা করায়ত্ত করতে পারে।

এভাবে একটি বীজ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সম্ভাবনার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে একটি পূর্ণ বৃক্ষে রূপায়ন করা। আবার একটি মেষশাবকের তৃণভোজন ও বিকাশের মধ্য দিয়ে পূর্ণবয়স্ক মেষ হওয়া- এ রূপান্তর সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে (মানবের জন্য উপযোগী)। মানুষের ক্ষমতা আরও উন্নত পর্যায়ের। মানুষ মানেই সে জ্ঞানী-সক্ষম। সে যত বেশি জানতে পারে তত বেশি তার জ্ঞান কাজে লাগাতে পারে, আর ততই সে তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী হয়।

কখনও বলা হয়, মানব জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে 'সুখ' লাভ করা। অর্থাৎ যতটা সময় একজন মানুষ বেঁচে থাকবে সে সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাবে, প্রকৃতি ও স্রষ্টার কল্যাণ উপভোগ করবে, প্রকৃতি বা অন্যান্য প্রাণীর ক্ষতি থেকে কম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করবে। একেই বিবেচনা করা হয় 'সুখ'। অর্থাৎ সর্বোচ্চ পরিমাণ 'সুখ' আর সর্বনিম্ন পরিমাণ দুঃখ-বেদনা-ই হলো সুখ।

এটাও বলা হয়, নবী-রাসূলদেরও পাঠানো হয়েছে যাতে মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ সুখ অর্জন ও ন্যূনতম দুঃখ-কষ্ট পাওয়া সম্ভব হয়। যদি নবী-রাসূলগণ পরকালের পরিচয় দিয়ে থাকেন তা হবে এ জীবনেরই ধারাবাহিকতা। অন্য কথায় যেহেতু মানব-সুখের পথ দেখানো হয়েছে এবং তা অনুসরণের পরিণামরূপে পুরস্কারও প্রয়োজন; আবার এর বিপরীতে শাস্তিরও বিধান থাকা প্রয়োজন, তাই এ পৃথিবীতেই এ শাস্তি ও পুরস্কারের মডেল উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে এ পৃথিবীর আইন-কানুন বিফল হবে না। যাহোক, নবী-রাসূলগণ এ পৃথিবীতে পুরস্কার বা শাস্তি দেবার মতো কোনো অবস্থানে ছিলেন না; তাই অন্য একটি জগৎ দরকার যেখানে ভালো লোকরা পুরস্কার লাভ করবে, আর অপরাধী ও পাপীরা শাস্তি ভোগ করবে।

কিন্তু আমরা পবিত্র কুরআনে এরকম কোনো কথা দেখতে পাই না। সেখানে জ্বীন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য রূপে বলা হয়েছে 'উপাসনা করা'। (সূরা যারিয়াত : ৫৬) মনে হচ্ছে এটা উপলব্ধি করা খুব কঠিন। স্রষ্টার উপাসনায় লাভ কী? এতে তাঁর (স্রষ্টার) কিছু যায়-আসে না। মানুষেরই বা এতে কী লাভ? তবে সৃষ্টির লক্ষ্য হিসাবে পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টিকে স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরবর্তী জীবন এ জীবনের মতো অতটা গুরুত্ববহ নয়–এমন ধারণার বিপক্ষে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা কি ধরে নিয়েছ তোমাদের এমনিতেই সৃষ্টি করা হয়েছে?' (সূরা মুমিনূন : ১৫৫) এতে প্রমাণ মেলে সবকিছু প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।

এমন ধারণা করা হয়ে থাকে যে, সৃষ্টির কোনো অর্থ হয় না, আর মানুষও স্রষ্টার সামনে ফিরে যাবে না! পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সৃষ্টির উপযুক্ততা প্রসঙ্গে পরকালের কথা বারবার ঘোষণা করা হয়েছে। এর যৌক্তিকতার ভিত্তি এরূপ– এ পৃথিবীর একজন স্রষ্টা আছেন, তিনি কোনো কিছুই বৃথা সৃষ্টি করেন না এবং যা করেন সবই সঠিক– খেলার জন্য নয় এবং তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের খবর রাখেন। আমরা পবিত্র কুরআনে এমন কথা পাই না যে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে সে বেশি বেশি জানতে পারে, ফলে তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেশি করে কাজ করতে পারে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে ইবাদাত করার জন্য, আর স্রষ্টার উপাসনা নিজেই একটি লক্ষ্য। যদি স্রষ্টাকে জানার বা চেনার কোনো প্রয়োজন না থাকতো–যা ইবাদাত করার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ, তাহলে সৃষ্টির লক্ষ্যপানে অভিযাত্রায় মানুষ ব্যর্থ হয়ে পড়তো আর আল-কুরআনের দৃষ্টিতে সে সুখী হতো না। পয়গাম্বরগণও এসেছেন তাকে সুখের দিকে এগিয়ে নেবার জন্য- যা কিনা স্রষ্টার ইবাদাত।

সুতরাং ইসলাম যে লক্ষ্য বা আদর্শের কথা বলে তা হলো স্রষ্টা এবং বাকী সবকিছুই এ লক্ষ্যে পৌঁছার প্রস্তুতিমাত্র– স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বা মৌলিকভাবে গুরুত্ববহও নয়। পবিত্র কুরআনের যে সব আয়াতে পূর্ণ মানবের কথা বলা হয়েছে বা তাদের পক্ষে বলা হয়েছে সে সব আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে যে, তারা সত্যিকার অর্থে জীবনের লক্ষ্য বুঝতে পেরেছে এবং তা অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> 'আমার ইবাদাত তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত, যিনি বেহেশত ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর আমি অবিশ্বাসী নই।' (সূরা আনআম : ৮০)

এ সূরায় আরও বলা হয় :

> 'আমার নামায, ইবাদাত, জীবন ও মৃত্যু আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সমস্ত বিশ্বজাহানের মালিক।' (সূরা আনআম : ১৬৩)

কুরআনের এ একেশ্বরবাদিতা কেবল একটি বুদ্ধিদীপ্ত বিষয় নয় যাতে ধারণা হয় বিশ্বজাহানের উৎস একটি, আর সৃষ্টি আরেক ভিন্ন সত্তা। এখানে মানুষের বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে যে, স্রষ্টা শুধু একজন এবং তার (মানুষের) লক্ষ্য (তার কাছে মূল্যবান একমাত্র লক্ষ্য) কেবলই ঐ স্রষ্টা। অন্য সব লক্ষ্য এ প্রধান লক্ষ্যের উপজাত ও ঐ লক্ষ্য অর্জনের সহযোগী মাত্র।

এভাবে ইসলামে সবকিছুই স্রষ্টাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। পয়গাম্বরগণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তি পর্যায়ের জীবনের লক্ষ্যও এর অন্তর্ভুক্ত।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এবার আমরা ইবাদাত প্রসঙ্গটি নিয়ে পর্যালোচনা করব। দ্বিতীয় আয়াতে ইবরাহীম (আ.)-এর কথায় সর্বাত্মক আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে এবং তিনি নিজেকে সার্বক্ষণিকভাবে স্রষ্টার অনুগত দাস রূপে তুলে ধরেছেন, যিনি অন্য কোনো চিন্তা-ভাবনা নয়; বরং শুধুই স্রষ্টা কর্তৃক চালিত হন।

পয়গাম্বরগণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বেশ কয়েকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সূরা আহযাবের ৪৫ এবং ৪৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

> 'হে নবী! আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বায়ক রূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।'

কাজেই একজন নবী হচ্ছেন সাধারণ মানুষের কর্মের সাক্ষী, ভালো কাজের সুসংবাদদাতা; মন্দ কাজের ব্যাপারে সতর্ককারী প্রতিনিধি এবং একজন মানুষ যিনি সাধারণ মানুষকে স্রষ্টার দিকে আহ্বান করেন– যা হচ্ছে চূড়ান্ত লক্ষ্য।

অন্য এক জায়গায় নবী-রাসূলগণের লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়েছে অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোর দিকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব পালন। সুতরাং এটা পরিষ্কার, মানবজাতিকে আল্লাহ্কে চিনতে আহ্বান করা হয়েছে, আর নবী-রাসূলগণ হচ্ছেন স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যোগসূত্র।

আরেকটি আয়াতে নবী-রাসূলগণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যরূপে অন্য একটি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে :

> 'সত্যই আমরা নবী-রাসূল পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সাথে আমরা কিতাব পাঠিয়েছি এবং সত্য পরিমাপ, যাতে মানুষ ন্যায়বিচারে উদ্বুদ্ধ হয় এবং আমরা লৌহ পাঠিয়েছি যাতে রয়েছে কঠিন দৃঢ়তা এবং মানুষের জন্য কল্যাণ...' (সূরা কিয়ামাহ : ২৫)

এ আয়াতে 'পরিমাপ' বলে সম্ভবত 'আইন' বুঝানো হয়েছে যাতে ন্যায়বিচার নিহিত রয়েছে। এভাবে নবী-রাসূলগণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এটা তাদের লক্ষ্যের আরেকটি দিক।

কেউ কেউ, যেমন ইবনে সিনা যুক্তি দেখান বৈষম্যহীন আইন ছাড়া মানব সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর এমন আইন দু'টি কারণে মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। প্রথমত মানুষ সম্পূর্ণরূপে সত্যকে চিহ্নিত করতে পারে না অথবা ব্যক্তিগত পক্ষপাত থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত এটা বাস্তবায়নের কোনো নিশ্চয়তা নেই; কারণ, মানুষের প্রকৃতিই তাকে একে অন্যের ওপর প্রাধান্য দিতে বাধ্য করে। তাই আইন-কানুন যখন তার পক্ষে, সে তা গ্রহণ করে, আর যখন তার স্বার্থের পরিপন্থী তখন সে তা প্রত্যাখ্যান করে।

একটা আইন এমন হওয়া উচিত যার প্রতি মানুষ শ্রদ্ধাশীল হবে আর এমন আইন অবশ্যই স্রষ্টা কর্তৃক রচিত হবে যার প্রতি চেতনার গভীর থেকে মানুষ অনুগত হবে। এমন উপযুক্ত আইন আসবে স্রষ্টার কাছ থেকে এবং তা বাস্তবায়নে পুরস্কারের নিশ্চয়তা থাকবে; অমান্য করায় শাস্তিও নির্ধারিত থাকবে, এর প্রতি মানুষের বিশ্বাসও থাকবে; তারা স্রষ্টাকে চিনতে পারবে। এভাবে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত রূপে স্রষ্টাকে চেনার অনেক উপাদান ও কার্যকারণ বিদ্যমান। এমনকি ইবাদাতও নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে এ আইন প্রণেতাকে মানুষ ভুলে যেতে না পারে। এ ছাড়াও প্রতি মুহূর্তে সর্বদর্শীরূপে স্রষ্টাকে মনে রাখবে। এ যুক্তিতে মানুষকে স্রষ্টার প্রতি আহ্বান করা আরেকটি লক্ষ্য, নচেৎ তাঁকে (স্রষ্টাকে) চেনার কোনো উদ্দেশ্য থাকে না।

এভাবে আমরা তিন প্রকার যুক্তি পেয়ে থাকি। প্রথমটি হচ্ছে, নবী-রাসূলদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো এ জগতে কেবল জনসাধারণের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের জন্য সুখী-সমৃদ্ধ জীবন নিশ্চিত করা। ফলে স্রষ্টাকে চেনা, তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখা ও পরকালে বিশ্বাস রাখা হচ্ছে পূর্বোক্ত লক্ষ্যের পূর্বশর্ত। দ্বিতীয় যুক্তি প্রায় বিপরীতধর্মী। স্রষ্টাকে চেনা, তাঁর উপাসনা করা হচ্ছে প্রধান উদ্দেশ্য, আর ন্যায় বিচার হচ্ছে এর পরিপূরক। এ জগতে মানুষের আধ্যাত্মিকতা সমাজ-জীবনের ওপর নির্ভরশীল, আর আইন ও ন্যায়বিচার ছাড়া সমাজ-জীবন সম্ভব নয়। তাই আইন ও ন্যায়বিচার হচ্ছে স্রষ্টার প্রতি উপাসনার পূর্বশর্ত। সুতরাং সামাজিক সমস্যাদি দূরীকরণ, যা আজ ন্যায়বিচার প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্ববহরূপে বিবেচিত তা নবী-রাসূলদেরও উদ্দেশ্য ছিল তবে তা গুরুত্বের দিক দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে থেকে যায়।

তৃতীয় মত অনুসারে নবী-রাসূলদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আলাদা হওয়া প্রয়োজন সৃষ্টি ও জীবনের লক্ষ্য থেকে। আর তাই এর একটি হবে প্রধান লক্ষ্য, আর অন্যটি হবে পরিপূরক। আমরা বলতে পারি, নবী-রাসূলগণের দু'টি স্বতন্ত্র লক্ষ্য ছিল : একটি হলো স্রষ্টার উপাসনা করার জন্য মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন; অন্যটি হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। কাজেই এর একটি অন্যটির পূর্বশর্ত হবে এমন ধারণা আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি।

পবিত্র কুরআনে এর উদাহরণ পাওয়া যায়, যেখানে আত্মশুদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে আর পরিত্রাণপ্রাপ্তি এর ওপর নির্ভরশীল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আত্মশুদ্ধি কি ইসলাম সমর্থিত একটি লক্ষ্য? এটা কি একটি লক্ষ্য না কি পূর্বশর্ত? কিসের পূর্বশর্ত? স্রষ্টাকে চেনার এবং তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপনের এবং তাঁর ইবাদাত করার নাকি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার? এ মতানুসারে, যেহেতু নবী-রাসূলগণ সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে এসেছেন, তাই সামাজিক কল্যাণ-অকল্যাণ চিহ্নিত হয়েছে। তাঁরা উপদেশ দিয়েছেন সামাজিক অকল্যাণ পরিহার করার; যেমন ঈর্ষা, অহংকার, স্বার্থপরতা, কামুকতা ইত্যাদি পরিহার করার; আর ভালো গুণাবলী, যেমন সত্যবাদিতা, পুণ্যকর্ম, সহানুভূতি, বিনয় ইত্যাদি লালন করার। অথবা এটা দাবি করা ঠিক হবে যে, আত্মশুদ্ধি নিজেই একটি স্বতন্ত্র লক্ষ্য?

ওপরের এ মতগুলোর কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য? আমাদের চিন্তার প্রতি কুরআন কখনও কোনো অবস্থাতেই দ্বৈততা অনুমোদন করে না। কুরআন সকল অবস্থাতেই একটি একেশ্বরবাদী ধর্মগ্রন্থ। এতে বলা হয়েছে 'স্রষ্টার মতো বা তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।' (সূরা শূরা : ১১)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এতে সকল গুণের চূড়ান্ত পূর্ণতা স্রষ্টার বলে বর্ণনা করে– 'সকল উত্তম নাম তাঁর।' (সূরা ত্বহা : ৬০) 'সর্বোত্তম মর্যাদাপূর্ণ গুণরাজি শুধুই স্রষ্টার।' (সূরা নাহল : ৬০)

কুরআন ঘোষণা দেয় তাঁর কোনো শরীক নেই, কোনো প্রতিপক্ষ নেই এবং সকল ক্ষমতা তাঁরা, অন্য কারও নয়। কুরআন স্রষ্টা ছাড়া আর কোনো লক্ষ্যকেই মৌলিক, স্বতন্ত্র বা বিশ্বজগতের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে অনুমোদন দেয় না, মানুষের জন্যও স্রষ্টা ছাড়া আর কোনো লক্ষ্যকেই মানুষের সৃষ্টি তার বাধ্যতা এবং কর্মের লক্ষ্য হিসাবে স্বীকার করে না।

এখানেই যে মানুষ ইসলাম চায়, আর যে শুধুই দার্শনিক ধারণায় বিশ্বাসী তার মধ্যে সকল ব্যবধান বিরাজ করে। ইসলাম সমর্থন করে এমন অনেক বিষয় অন্যরাও সমর্থন করে, তবে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। ইসলাম সব সময় একেশ্বরবাদী প্রেক্ষাপটেই সবকিছু বিবেচনা করে।

দর্শনে, যেমন আমরা আগে বলেছি, মানুষ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সে বলে: এ বিশ্বজগৎ এতটি ধারাবাহিক অপরিবর্তনীয় নিয়মে চালিত হচ্ছে। পবিত্র কুরআনও একই কথা বলে, কিন্তু ঐশী প্রেক্ষাপটে : 'আপনি কখনও স্রষ্টার নিয়মে পরিবর্তন পাবেন না।' (সূরা সাবা : ৪৩)

পবিত্র কুরআন শুধু সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতি গ্রহণ করে তা নয়; বরং তাকে অত্যন্ত গুরুত্ববহরূপে বিবেচনা করে যদিও চূড়ান্ত লক্ষ্য বা ইহজাগতিক সুখ বলতে যা বুঝি তার পূর্ব শর্তরূপে অনুমোদন দেয় না। ইসলাম ইহজাগতিক সুখকে গ্রহণ করে একেশ্বরবাদিতার বাস্তবধর্মী সীমারেখার গণ্ডিতে থেকে অর্থাৎ পূর্ণরূপে স্রষ্টার প্রতি অনুগত থাকাকে সুখ বলে চিহ্নিত করে।

কুরআন অনুযায়ী মানুষ কেবল স্রষ্টার কাছ থেকেই সুখ পায় এবং তিনিই তার জীবনের সমস্ত অপূর্ণতা পূর্ণ করে দেন এবং তাকে তৃপ্ত করেন। কুরআনে বলা হয়েছে : 'তারা যাদের বিশ্বাস আছে এবং স্মরণে যাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।' (সূরা রাদ : ২৪)

মানুষের উদ্বিগ্ন ও অস্থির হৃদয়ে কেবল স্রষ্টা-ই প্রশান্তি দেন। অন্যান্য বিষয় পরিপূরক ও প্রাথমিক; চূড়ান্ত পর্যায় নয়। ইবাদাত প্রসঙ্গে এরূপ বলা হয়েছে : 'স্রষ্টার স্মরণে, প্রার্থনা করা।' (সূরা ত্বহা : ১৪)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : 'প্রার্থনা পাপ ও অন্যায়কে প্রতিরোধ করে, আর স্রষ্টার স্মরণ আরও গুরুত্বপূর্ণ।'

ইসলাম অনুযায়ী মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্রষ্টার ইবাদাতের উদ্দেশ্যে– তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য এবং তাঁকে চেনার জন্য, এর সবকিছুই তাকে ক্ষমতাবান করে । তবে জ্ঞান বা ক্ষমতা যেমন, তেমনি আত্মশুদ্ধিও চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ব্যক্তিগত ও সামাজিক নৈতিকতার ভিত্তি

ব্যক্তিগত বা সামাজিক যে কোনো জীবনেই মানুষের কতকগুলো অবস্তুগত উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থায় কতকগুলো উদ্দেশ্য প্রয়োজন যা ব্যক্তিগত পর্যায়ের লক্ষ্যের অনুরূপ এবং যা ছাড়া সত্যিকার অর্থে সমাজ-জীবন গড়ে তোলা অসম্ভব। কাজেই সামাজিক জীবনের অর্থ হলো বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক-উভয় ক্ষেত্রে অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে সহযোগিতা।

কিছু সংখ্যক লোকের অভিন্ন লক্ষ্য বস্তুগত হতে পারে, যেমন বাণিজ্যিক বা শিল্প সংস্থা, যা বেশ কিছু সংখ্যক লোক মিলে গঠন করে যাদের কেউ মূলধন বিনিয়োগ করে, অপর কেউ শ্রম দিয়ে থাকে। কিন্তু মানব সমাজ একটি কোম্পানির মতো পরিচালনা করা সম্ভব নয়, যেহেতু এর ভিত্তি একটি সংগঠনের ভিত্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অবশ্য এটা আমাদের ধারণা। আরও অনেকে আছেন, যেমন বার্ট্রান্ড রাসেল মনে করেন সামাজিক নীতি-নৈতিকতার ভিত্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে নিহিত। তাঁরা সামাজিক নৈতিকতাকে ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার চুক্তিরূপে গণ্য করেন, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের নিজস্ব স্বার্থ নিরাপদ রাখা। এ বিষয়টির ব্যাখ্যায় রাসেল উদাহরণ দিয়েছেন- 'আমি চাই আমার প্রতিবেশীর গাভীটিও আমার হোক। কিন্তু আমি বুঝি, যদি আমি এরূপ করি, প্রতিক্রিয়ায় সেও আমার গাভীটি ছিনিয়ে নেবে। অন্য এক প্রতিবেশীও অনুরূপ কিছু করতে পারে। ফলে লাভের বদলে আমার লোকসান হবে। কাজেই আমার বিবেচনায় তার অধিকারের প্রতি সম্মান জানানোই ভালো। তাই সে তার গাভীটি নিজের করে রাখুক আর আমিও যাতে আমারটিকে...

রাসেল বিশ্বাস করেন, সামাজিক নীতি-নৈতিকতার ভিত্তি ব্যক্তি পর্যায়ের অধিকার প্রসঙ্গে পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন। আমরা এটাও তো বলতে পারি, চোরদের মধ্যেও এরকম সম্পর্ক বজায় আছে। একসঙ্গে তারা চুরি করবে এবং নিজেদের মধ্যে এক প্রকার ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে, যেহেতু তারা একা একা এ কাজ করতে পারে না। তাই আমরা বলতে পারি, রাসেলের নীতি তাঁর দর্শনের সাথেই খাপ খায় না। তাঁর নীতি মানবতাবাদী; কিন্তু তাঁর দর্শন এর বিপরীতে ব্যক্তি স্বার্থকে সামাজিক নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিরূপে বিবেচনা করে। তাঁর মতানুযায়ী ব্যক্তি পর্যায়ে অন্যকে সহযোগিতা করা বাধ্যতামূলক। কেননা, ঐ ব্যক্তি প্রতিক্রিয়ার ভয়ে ভীত– যদি তাদেরও একই রকম ক্ষমতা ও শক্তি থাকে! তবে কেউ যদি নিশ্চিত হয় সে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অন্যরা অনেক দুর্বল এবং তারা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তখন তার ওসব সামাজিক রীতি-নৈতিকতা মেনে চলার দরকার পড়ে না।

যেমন ধরা যাক নিক্সন এবং ব্রেজনেভ সমান ক্ষমতাবান। একে অন্যকে মোকাবেলায় তাঁরা হিসাব করে দেখলো যে, পরস্পরের প্রতি সম্মান দেখালে তাঁদেরই লাভ। তবে তাঁদের কেউ যদি একটি দুর্বল হাতিকে সামনে পায় তখন এরকম সম্মান দেখানোর কোনো দরকার পড়ে না। তখন ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্রের লড়াই নিয়ে রাসেলের সমালোচনা অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়!

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সবক্ষেত্রেই তাঁদের ধারণা বিবেচনাহীন। যেমন তাঁদের ধারণামতে ক্ষমতাবান কেউ দুর্বলদের সংযত রাখবে। যদি দুর্বলের সংযত হবার মতো সহনশীলতা না থাকে তবে তারা শক্তিশালী হবার চেষ্টা করবে। রাজনৈতিকভাবে এটা সত্য হতে পারে, তবে নীতি-নৈতিকতা প্রশ্নে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, দুর্বল কোনোক্রমেই সবলকে অন্য কোনোভাবে মোকাবেলায় সক্ষম নয়। রাজনৈতিক মতবাদে মনে হয় এটা অনুমোদনযোগ্য যে, সবল মধ্যপন্থী আচরণ করবে। যে কোনো মতবাদই এ রকম বস্তুগত লক্ষ্য অর্জনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে, তবে বঞ্চনা রুখে দেবার মতো অন্যান্য পথও নির্দেশ করা উচিত। ব্যক্তিগত আগ্রাসনের কারণ অনুসন্ধান ও তা দূর করার কথা বলে এ কারণগুলোকে অহেতুক মানবিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক বা শিক্ষামূলক সীমাবদ্ধতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে।

যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন দুর্বলের বিপক্ষে সবলের আগ্রাসন মোকাবেলায় কী বাধা রয়েছে। তাঁরা হয়তো বলবেন : সমাজ প্রথম থেকেই এমনভাবে বিনির্মাণ করতে হবে যে, সেখানে কোনো সবল বা দুর্বল লোক থাকবে না। যদি শক্তি বা দুর্বলতার উৎস চিহ্নিত ও দূর করা যায়, তাহলে সব মানুষ একই পর্যায়ের হবে এবং সমান ক্ষমতার কারণে তারা একে অন্যকে সম্মান করবে। তাঁদের মতে এটা করা সম্ভব সম্পদের ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে। মালিকানাধীনের দশা থেকে মুক্তি লাভে মানবিক বৈষম্য দূর হবে এবং এমন একটি সমাজ হবে যেখানে সব মানুষের একটি বস্তুগত সাধারণ লক্ষ্য থাকবে এবং তা একটি প্রকৃত সমিতির মতো পরিচালিত হবে যেখানে কোনো অবিচার থাকবে না।

মার্কসীয় মতবাদ প্রায় এরকমই একটি ধারণা যেখানে মানুষের জন্য আধ্যাত্মিকতার কোনো সুযোগ নেই, নেই নীতি-নৈতিকতা সংক্রান্ত কোনো কথা। তারা গুরুত্ব আরোপ করে শুধু 'মালিকানা'-এর ওপর, যা তাদের ধারণামতে সকল শোষণ ও অপরাধের উৎস। ব্যক্তিমালিকানা রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক মালিকানায় রূপান্তরিত, যাতে প্রত্যেক মানুষ তার সাধ্য অনুযায়ী পরিশ্রম করে এবং তার প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্র বা সমাজ থেকে সে পারিশ্রমিক পায়। এমন ব্যবস্থাকে শান্তি, স্থিতিশীলতা, ন্যায়বিচার ও নীতি প্রতিষ্ঠায় স্বাভাবিকভাবে সহায়ক মনে করা হয়। সব সমস্যা, যেমন শত্রুতা, ঘৃণা এবং অন্যান্য জটিলতা তখন আশা করা যায় দূর হবে এবং সবাই সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধে বসবাস করবে।

কিন্তু এর সবটাই ভুল এ কারণে যে, বাস্তবে দেখা গেছে, সমাজে ব্যক্তিমালিকানা ব্যবস্থা উচ্ছেদ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে শোষণ এবং বিভাজন অব্যাহত আছে। যদি সমাজতন্ত্রীদের সংস্কারের দাবি ঠিক হতো তাহলে সম্প্রদায় ভিত্তিতে সমান সংগঠনের সাথে সাথে দুর্নীতির ছোবল অসম্ভব হয়ে পড়তো। অন্যদিকে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোয় নেতৃস্থানীয় সদস্যদের অপসারণ করা হয়। সুতরাং ব্যক্তিমালিকানা সুবিধা প্রাপ্তির একমাত্র নিয়ামক হতে পারে না।

প্রথমত 'সুবিধা' কেবল অর্থকড়ি এবং চুক্তিনামা নিয়ে গঠিত নয়। আরও অনেক কিছু রয়েছে যা মানবসমাজে মূল্যবান। যেমন : অন্যদের চেয়ে সৌন্দর্য বেশি থাকা নারীর জন্য একটি সুবিধা, যার

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সাথে ইবাদাতের কোনো সম্পর্ক নেই। এমনকি সমাজতান্ত্রিক সমাজেও এর একটি নিজস্ব অবস্থান রয়েছে।

এর চেয়েও বেশি এবং বড় সুবিধা রয়েছে পদমর্যাদা এবং অবস্থানের। বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তিত্ব রকফেলার সব সময় চাইতেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। কখনও কখনও কারো ক্ষেত্রে এ ইচ্ছা এত প্রবল যে, এটা পূরণ করার জন্য অনেক ধনী ব্যক্তি প্রায় পুরো সম্পদই উৎসর্গ করতে রাজী হয়ে পড়ে যাতে ক্ষমতাবান মানব হিসাবে সে সম্মান ও যশ অর্জন করতে পারে। মানুষের কাছে এটা সবসময়ই মূল্যবান যে, তাকে অন্যরা সম্মান করবে, হোক তা ভয়, সহানুভূতি বা ভক্তির কারণে।

এমন লোক পাওয়া যাবে না যে আয়াতুল্লাহ বুরুজারদীর মতো হতে চায় না যাতে মানুষ তাকে দেখার জন্য আগ্রহী হবে, তার হাতে চুমু খাবে, তার জন্য উপহার আনবে, তারা তাকে অভ্যর্থনা জানাবে আর সে সম্মানিত অনুভব করবে। তারা কি কেউ রাজা হবার বাসনা পোষণ করে না যাতে শত শত কর্মকর্তা এবং সাধারণ মানুষ তার সামনে ভক্তিভরে দাঁড়িয়ে থাকবে– ভয় করে হলেও? মানবসমাজ এগুলোকেও যথেষ্ট মূল্যবান মনে করে নতুবা এসব সুবিধা অর্জনের জন্য তারা সব কিছু হারাতে প্রস্তুত হবে না।

কাজেই মানবিক অবনতি এবং সামাজিক দুষ্টক্ষত শুধু সম্পদের কারণে নয়। এক্ষেত্রে আরও নিয়ামক রয়েছে যা সমাজতন্ত্র অতিক্রম করতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত যখন অন্যান্য সুবিধা আগেকার কোনো সুবিধার কারণে অর্জিত হয়, এমনকি সমাজতান্ত্রিক সমাজেও, তখন ঐ সব সুবিধা থাকার কারণে তাদের বেশ ভালোই লাভ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন সোভিয়েত নেতার সম্পদের ওপর আয়কৃত সুদের পরিমাণ একজন কৃষকের সম্পদের ওপর নিরূপিত সুদের সমান হবে কি? (যদিও ঐ নেতা কৃষিকাজে নিয়োজিত) একজন কৃষক জীবনেও একবার তার মতো ভ্রমণ করার সুযোগ পাবে না অথচ কোথাও যাওয়ার জন্য তার নেতার রয়েছে একটি শ্রেষ্ঠ বিমান। সুতরাং এটা দাবি করা যায় না যে, সবার জন্য সম্পদের সমান সুবিধা সমাজতন্ত্রে বাস্তবায়ন করা হয়েছে বা যে কেউ রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে সমানভাবে উপকৃত হবে।

ব্যক্তি মালিকানাধীন নয় অথচ সরকারি কোষাগার থেকে সকল সরকারি কর্মকর্তা কি সমানভাবে উপকৃত হয়? উঁচু স্তরের কর্মকর্তা সাধারণ কর্মচারী অপেক্ষা বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো সমাজতান্ত্রিক দেশেও আত্মত্যাগ ও বস্তুগত সুবিধাদি বর্জনের প্রয়োজন দেখা যায়। যেমন একজন সৈন্য যুদ্ধে গিয়ে নিহত হলো; কোনো পারস্পরিক স্বার্থের কারণে তাকে হত্যা করা হয়নি। তাকে কোনো আদর্শ বা আবেগ-অনুভূতির আশ্রয়ে উদ্দীপ্ত করা হয়েছে যাতে সে তাদের স্বার্থে আত্মোৎসর্গ করে। কাজেই সবচেয়ে বস্তুবাদী মতবাদও কিছুটা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ছাড়া চলতে পারে না যদিও সে তার দৃঢ় বিশ্বাসকে উপাসনাযোগ্য কোনো কিছুর দিকে ঘুরিয়ে দেয়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সমাজভিত্তিক মতবাদ যা নিতান্তই বস্তু স্বার্থের ওপর নির্ভরশীল, বাস্তবসম্মত বা ব্যাপক নয়। নীতি, আদর্শ, লক্ষ্য এবং তাদের ব্যবস্থার প্রতীক প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ কেমন করে সক্রিয় থাকেন?

তারা এমন আচরণ করে যেন তাদের ব্যবস্থাটি সবকিছুর উর্ধ্বে অথচ এটা কেবল এ জীবনের কিছু সুখ অর্জনে নিয়োজিত। বস্তুবাদের ভিত্তিতে তাদের নীতিমালা একজন স্থাপত্য প্রকৌশলীর একটি ভবনের নক্শা তৈরির মতো। এ নক্শায় পবিত্রতার কোনো স্থান নেই। এটা বিনির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা মাত্র। শ্রেষ্ঠ নক্শাটি ঐ ভবনের পরিপূরক। এ মতবাদ সম্পর্কে বেশি যা বলা যায় তা হলো এটা সমাজের জন্য শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা। তবে এ পরিকল্পনাটিকে উপাসনাযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে কেনো? নক্শাটি ভবনের জন্য আর ভবনটি আমার জন্য। কাজেই ঐ নক্শার জন্য আমি কেনো আত্মোৎসর্গ করবো?

এরকম দাবির কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। এখনও এ ব্যবস্থাকে শুধু সমাজ গঠনের উপায়রূপে দেখা হয় অথচ প্রায়ই এতে পবিত্র কিছুর আভাস পাওয়া যায়, যার সম্মানে কেউ জীবনও উৎসর্গ করে থাকে। এর অনুসারীরা তাদের দাবিকে ভিত্তিহীন মনে করতে পারে তথাপি তাদের নিজেদেরকে ও অন্যদেরকে বারবার অনুশীলন করে প্রস্তুত করতে হয় যেন আত্মোৎসর্গে যথেষ্ট উদ্দীপ্ত হয়। এবার আসুন আমরা দেখি কীসের সমন্বয়ে আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও মূল্যবোধ গঠিত হয়। এগুলো কি আসলেই বিরাজ করে নাকি নির্বোধ ব্যক্তিকে প্রতারণার কোনো উপদেশ মাত্র? কেনো এগুলোকে বস্তুগত মূল্যবোধ অপেক্ষা শ্রেয়তর বিবেচনা করা হয়?

যা হোক মূল্যবোধ কী? যখন কেউ স্বেচ্ছায় কোনো কাজ করে তার একটা উদ্দেশ্য থাকে, যা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ– হোক তা বস্তুগত বা আধ্যাত্মিক। অর্থাৎ ঐ উদ্দেশ্যে তার একটা স্বার্থ আছে নচেৎ সে তা অনুসরণ করবে না। বলা হয়ে থাকে পরম উদ্দেশ্যহীনতা বা ব্যর্থতা অসম্ভব।

বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এটা স্পষ্ট যে, যা কিছু আমার কাছে প্রয়োজনীয় তার প্রতি আমি আকৃষ্ট হবো আমার জীবনের গতিময়তার কারণে; যেহেতু আমি প্রকৃতভাবে আমার জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মূল্য শব্দটি বস্তুজগতের জন্য যেমন আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও তেমন ব্যবহৃত হতে পারে। একজন চিকিৎসকের কাছে আমার মূল্য আছে ঠিক যেমন ঔষধেরও মূল্য আছে।

বস্তুজগতের জন্য শারীরিক অবয়ব দরকার; শরীরের জন্য শরীর চর্চা দরকার, যদিও তা কোনো বস্তু নয়। তাহলে! খাদ্য ও ব্যায়ামে আমাদের জন্য মূল্য আছে। অন্যদের প্রতি দানশীল হওয়া– যে দান করলো তার কোনো বস্তুগত লাভ নেই; একইভাবে সমাজসেবা বা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কিছু করে যাওয়া ভালো কাজরূপে গণ্য। কিন্তু যে এ কাজ করে গেল তার কাছে এর মূল্য কী? পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কেউ অনেক পরিশ্রম করে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করালো এবং এখান থেকে কোনো মুনাফা পেল না। অথবা তার সময় শেষ হয়ে গেলো, আরও বেশি উপার্জনের সুযোগও থাকলো না। এ ব্যাপারটিকে আমরা আধ্যাত্মিকতার আশ্রয়ে কীভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি?

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্ন করা যেতে পারে, আধ্যাত্মিকতা স্রষ্টা বিশ্বাসে সীমাবদ্ধ কি না। অথবা এটা সম্ভব কি না যে, এরকম কোনো বিশ্বাস থাকবে না অথচ মানব জীবন পরিচালনায় অসংখ্য আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ থাকবে?

সারটার তাঁর 'জেনুইননেস্ অব ম্যান' বইয়ে দস্তোভস্কির এ বাক্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন 'যদি কোনো স্রষ্টা না থাকে, তাহলে সবকিছুরই অনুমতি থাকে'। অর্থাৎ ভালো এবং মন্দ, সত্য ও মিথ্যা, প্রতারণা ও সেবা সবকিছুই নির্ভর করে আমরা স্রষ্টায় বিশ্বাসী কি না তার ওপর। যদি আমাদের বিশ্বাস না থাকে, তাহলে কোনো বাধা থাকবে না এবং সব কিছুরই তখন অনুমতি থাকবে। এটা কি সত্য, নাকি মিথ্যা?

বস্তুবাদী হিসাবে মার্কসবাদীদের মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। তারা দাবি করে তাদের আধ্যাত্মিকতা বা মানবতার কোনো দরকার নেই এবং যদি তারা পরিমিত মানবতার কথা বলে তা হলো শ্রেণীহীন মানবসমাজ। তাদের মতে মানুষ হয় অপূর্ণাঙ্গ। আর তাদের অপূর্ণাঙ্গ দশা সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা এবং আর্থ-সামাজিক বৈষম্য থেকে উৎসারিত। একবার এ বৈষম্যগুলো দূর করা গেলে মানবসমাজ আবার তাদের আগের পূর্ণতায় ফিরে যাবে। তারা মানবের আর কোনো পূর্ণতায় বিশ্বাসী নয়–অন্য কোনো উন্নয়ন বা বিবর্তনেও নয়।

তাহলে সারটার-এর মতবাদের ব্যাপারটা কী? সেখানে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ, যেমন মানবতাও আছে। আবার সেখানে মানবের দায়-দায়িত্ব নিয়েও কথা বলা হয়। একদিকে বলা হয়, মানুষ সব ধরনের ঐশী সার্বভৌমত্ব থেকে মুক্ত বা প্রাকৃতিক শাসন থেকে স্বাধীন। তার ইচ্ছা কোনোভাবেই অতীতের ওপর নির্ভরশীল নয়। সে মানুষ, যে তাকে গড়ে তোলে– পরিবেশ নয়, লক্ষ্য নয়, নয় স্রষ্টা। কাজেই সে নিজের জন্য নিজেই দায়ী। সুতরাং সে যে কাজ পছন্দ করে ও সম্পাদন করে তা অবশ্যই ভালো হতে হবে। এভাবে সে নিজেকে অন্যদের জন্য আদর্শে রূপান্তরিত করে যেন অন্যরা তাকে অনুকরণ করে। আর এ ক্ষেত্রে সে অন্যদের আচরণের জন্যও দায়ী থাকে। এবার চলুন আমরা দেখি এ দায়-দায়িত্বটা কী এবং এর অর্থ-ই বা কী। এটা আধ্যাত্মিক বিষয়, বস্তুগত বিষয় নয়। বস্তুবাদ অনুযায়ী তারা বলতে পারে মানবের বিবেচনা রয়েছে যা দায়-দায়িত্ব বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দেয়। যদি তারা বিশ্বাস করে মানুষের মধ্যে দু'টি সত্তা রয়েছে– একটা জন্তুর, অন্যটা মানবের। যখন সে কোনো অপরাধ করে তখন জন্তু সত্তাকে মানব সত্তা ভর্ৎসনা করে। তাহলে দায়-দায়িত্বের শেকড় কোথায়?

যদি তারা কোনোভাবে দায়-দায়িত্বের কথা বলে, তাহলে তা তো আধ্যাত্মিক বিষয়। তারা বলে, 'আমি মানব জাতি ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দায়ী।' এটা কী অর্থ বহন করে? তারা একটি বস্তুবাদী গোষ্ঠীর সদস্য, তথাপি তারা মানবতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। মানুষকে তার অধীন করতে চায়! চায় তারা এ ধারণা লালন করুক। তবে স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে! সারটার এমনও বলেছেন, 'যদি সব ক্ষেত্রে স্রষ্টা এসে যান, তথাপি তখন কোনো আধ্যাত্মিকতা অবশিষ্ট থাকে না। কারণ, এর ভিত্তি হলো পুরোপুরি মানব স্বাধীনতা, আর স্রষ্টার উপস্থিতি অর্থ স্বাধীনতার অভাব। এভাবে পছন্দের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

স্বাধীনতাবিহীন দায়দায়িত্ব অর্থহীন হয়ে পড়ে। কেউ হয়ত বলবেন, 'স্রষ্টায় বিশ্বাস ছাড়া আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস স্থাপনে বাধা কোথায়?' কারণ, মানব প্রকৃতিতে বিবেক-বিবেচনা স্বতঃস্ফূর্তরূপে মিশে আছে যা তাকে ভালো কাজ উপভোগে সক্ষম করে তোলে এবং খারাপ কাজকে ঘৃণা করতে উদ্বুদ্ধ করে। সে কোনো বস্তুগত স্বার্থে কেনো ভালো কাজ করে না, বরং সে ওটা করতে আনন্দ পায় যেমন সে আনন্দ পায় ইতিহাস, ভূগোল সম্পর্কে জ্ঞান আহরণে। এ ক্ষেত্রে একমাত্র লাভ হচ্ছে অধিকতর সচেতনতা। অনুরূপভাবে, নীতি-নৈতিকতার বিষয়াবলী তাকে আনন্দ দেয়। গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস এ ধারণার প্রতি সমর্থন দেন। ওমর খৈয়ামও এটা বিশ্বাস করেন বলে শোনা যায়। পরে এপিকিউরিজম নির্বিচারে প্রয়োগ করা হয় প্রতিটি আনন্দদায়ক বিষয়ের প্রতি। তবে এমন দাবিও উত্থাপিত হয় যে, তাঁর প্রকৃত মতবাদে আধ্যাত্মিক আনন্দের কথা এপিউকউরাস বিশ্বাস করতেন যা অধিকতর স্থায়ী এবং সহজতর উপায়ে অর্জন করা যায়। সৌন্দর্য, ফুল, পাখি, গান ইত্যাদির প্রতি প্রেম আরো আনন্দের উদাহরণ যাতে কোনো বস্তুগত স্বার্থ নেই তবে মানবাত্মা আনন্দ পায়।

এসব মন্তব্য কোনো কোনো পরিসরে সত্য, তবে দু'টি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত মানুষের বিবেক একটি মতবাদ দাঁড় করানোর ভিত্তি প্রদানে প্রয়োজনীয়তা গভীরতায় চিহ্নিত নাও হতে পারে। যদি একজন মানুষ কেবল আনন্দ পাওয়ার জন্য কিছু করে থাকে তবে তা সে করে মৃত্যুর সীমানার আগে বা পরবর্তী বন্দীদশার আগে এবং ভিন্নপথে গমনের ক্ষেত্রে; একটি মতবাদ যেরূপ চিহ্নিত করে ততটা গভীর প্রয়োজনে নয়। কেউ একটি ফুলের জন্য প্রাণ দিতে রাজী হবে না। সে বেঁচে থেকে ঐ ফুল থেকে ঘ্রাণ নিয়ে আনন্দ পেতে চায়। অন্যদের সাহায্য করার আনন্দ আছে তবে এ আনন্দের জন্য কেউ মরতে চায় না।

তাই এটা ঠিক যে, মানুষ বিবেকের গভীরে ভালো কাজের আনন্দ উপভোগ করে। পবিত্র কুরআনেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তবে একটি মতবাদের ভিত্তি পাওয়া যাবে বিবেক-বুদ্ধি থেকে এটা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আরও বেশি গভীরতায় বিশ্বাস প্রয়োজন। তাই যদি কেউ বলে যে, ইমাম হুসাইন (আ.) কারবালায় নিজের জীবন এবং তাঁর অনুসারীবৃন্দের জীবন উৎসর্গ করলেন কেবল মানুষের সেবা সংক্রান্ত তাঁর দাবি পূরণের জন্য তাহলে সঠিক বিচার হবে না। কারণ, এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি তাঁর বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে নয়; বরং তাঁর গভীরতর বিশ্বাস থেকে এভাবে উজ্জীবিত হয়েছিলেন।

যদি স্রষ্টা না থাকে এবং কোনো সুশৃঙ্খল উদ্দেশ্য না থাকে এবং মানুষ ও বস্তুর মধ্যে স্বাভাবিক কোনো সম্পর্ক না থাকে তাহলে কি আমরা বলবো না প্রকৃতিতে কোনো ত্রুটি রয়ে গেছে? শোপেনার বলেন, 'প্রকৃতি মানুষকে বিভ্রান্ত করা ও তার নিজস্ব উদ্দেশ্য পূরণের পর তাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য আনন্দ উপহার দেয়।' উদাহরণস্বরূপ, প্রকৃতি চায় প্রাণীজগৎ টিকে থাকুক। যদি সে কোনো ব্যক্তিকে বিয়ের নির্দেশ দেয়; কাজ করে স্ত্রী-পুত্র পরিজনের খরচ বহনের নির্দেশ দেয় তাহলে কোনো বুদ্ধিমান লোক তা করবে না; কিন্তু প্রকৃতি তাকে এমন মায়াডোরে আবদ্ধ করে যে,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সে নিজেই বিয়ে করতে চায়। যে কোনো ক্ষেত্রেই প্রতিটি আনন্দ কোনো প্রয়োজনের ওপর নির্ভরশীল। আমরা খাই; কারণ, আমাদের প্রকৃতির ঐ দ্রব্য দরকার; একই কারণে আমরা পান করি, ঘুমাই। যদি আমাদের কোনো প্রয়োজন না থাকতো তাহলে আমরা ওগুলোর শরণাপন্ন হতাম না। বস্তুগত আনন্দের কারণ পরিষ্কার, তবে আধ্যাত্মিক আনন্দের ব্যাপারটা কীরূপ? আমি যদি দেখি, একজন ইয়াতিম খাবার খাচ্ছে, কেনো আমি আনন্দ পাবো? এর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তাই এ আনন্দ নিষ্ফল; কারণ, এতে মৌলিক কোনো জ্ঞান নেই। কিন্তু আমরা যদি বিশ্ব পর্যায়ে আন্তঃসম্পর্কে বিশ্বাস করি এবং বুদ্ধিমত্তানির্ভর কোনো সৃষ্টিতে বিশ্বাস করি, তাহলে সকল মানুষকে একটি সম্প্রদায়ের সদস্য বলে গণ্য করবো যারা অন্যের কল্যাণ প্রত্যক্ষ করে আনন্দ পাবে। এরকম হওয়ার কারণ হলো সৃষ্টির একটি সত্য নিয়ম-নীতি আমরা মেনে চলি। কিন্তু এ আনন্দ যদি দৈবক্রমে হয় এবং কেবলই প্রাকৃতিক কারণে হয়, তাহলেও তা ব্যর্থ হবে। কারণ, তখন এতে প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য অনুপস্থিত থাকে। কাজেই যখন আমরা নৈতিক বিবেচনায় বিশ্বাস করি এবং দাবি করি যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে ভালো কাজ করে উপকৃত হয় এবং মন্দ কাজ করে হেরে যায়, তখনও আমাদের কর্ম নিষ্ফল হবে স্রষ্টার ওপর এবং সৃষ্টির লক্ষ্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া।

যখন আমরা বিশ্বাস করি, স্রষ্টা মানুষকে নীতি-নৈতিকতা-বিবেচনা দিয়েছেন একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য, তখন একজন ইয়াতিম শিশু, একজন বৃদ্ধা নারী এবং আমি নিজে সবাই এক মহাপরিকল্পনার অংশ-বিশেষ এক সংগঠনের সহ-সদস্য বলে বিবেচিত হবো। এভাবে আমরা ঐশী এক ইচ্ছা ও জ্ঞানের অনুসরণ করছি এবং ঐ লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করছি। তখন কোনো কিছুই নিষ্ফল নয় এবং সবকিছুই সত্য ও আসল। সুতরাং প্রতিটি মতবাদ এবং প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন বেশ কিছু আধ্যাত্মিক ধারণা, একটি আদর্শ যা বস্তুগত মূল্যবোধের অনেক ঊর্ধ্বে এবং এত শক্তিশালী যে, তা পবিত্র হয়ে পড়ে। এ পবিত্রতা একজন মানুষের কাছে যথেষ্ট মূল্যবান বলে গণ্য হবে যাতে সে তার ব্যক্তিগত জীবন উৎসর্গ করতে পারে।

সা'দীর কবিতায়ও ওপরের মতবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায় :

'বাতাস, মেঘ, সূর্য, আকাশ
সবাই কাজে ব্যস্ত,
যেন তুমি জীবিকা অর্জন করতে পারো।
তাই এসব নষ্ট করো না অবহেলায়।'

এতে প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর দায়-দায়িত্বের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে। যেমন : পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে :

> 'তুমি কি দেখ না আসমান যমিনের সবকিছুকে স্রষ্টা তোমাদের জন্য পালন করছেন।'
> (সূরা লুকমান : ২০)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের প্রতিটি সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য আছে এবং সকলেই নিজ নিজ কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করছে। তাই মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে দায়-দায়িত্বের এক মহাসমুদ্র মাঝে। কিন্তু যে ব্যবস্থায় বস্তুজগতকে চূড়ান্ত কোনো লক্ষ্যহীন বলে বিবেচনা করা হয় তাতে বিশ্বাস স্থাপিত হয় যে, প্রাণীর কোনো দায়িত্ব-কর্তব্য নেই; এটা শুধু মানুষের বেলায় সীমাবদ্ধ। কেনো এমন হবে তা কিন্তু ব্যাখ্যা করা হয়নি।

প্রতিটি মতবাদের জন্য আদর্শ হচ্ছে একটি মৌলিক বিষয়। ফলে ব্যক্তি বা সমাজের সামনে কিছু উপস্থাপন করা যায়, যার জন্য তারা পরিশ্রম করবে। আর স্রষ্টায় বিশ্বাস ও সৃষ্টিতে তাঁর প্রজ্ঞার ওপর বিশ্বাস ছাড়া এসব আদর্শ অর্থহীন হয়ে পড়ে।

বিশ্বাস, বিভিন্ন মতবাদ এবং বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

বুদ্ধিবৃত্তিক এবং দার্শনিক ব্যাখ্যাসহ বিশ্বাস হচ্ছে গুরুত্বসহ গৃহীত আদর্শের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত। এতে বিশেষ যুক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপটকে ধরে নেয়া হয় যার প্রতি বিশ্বাস ও বিশ্বজগৎ সংক্রান্ত সুচারু যৌক্তিকতার সমর্থন মেলে। বিশ্বাস একে এমন লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত হওয়ার শক্তি যোগায় যা ব্যক্তিগত পর্যায়ের বা বিশেষ লক্ষ্যের চেয়েও উচ্চতর। আর সত্যটি কোনো কোনো আধুনিক মতবাদেও প্রকাশ পেয়েছে, যেমন অস্তিত্ববাদ। তারা একটি আদর্শ গড়ে তুলতে চায় বিশ্বাসকে বাদ দিয়ে। তারা বিশ্বাসকে ছেড়ে কেবলই দর্শনের ওপর ভিত্তি করে একটা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় যেখানে উচ্চতর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের জন্য এক প্রকার প্রেমের দেখা মেলে। তবে তা সম্ভব নয়।

কখনও তারা একটি দূরবর্তী ছায়া স্থাপন করে, আর তা মানুষের খেয়ালনির্ভর; এর বেশি কিছু নয়। তথাপি বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি আদর্শ বিশ্বাসের কারণে পবিত্র। যদি এর ভিত্তি 'বিশ্বাস' না হয়ে শুধু অন্য কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবস্থা হয়, তাহলে তা প্রেম ও আবেগ জাগাতে পারে না। কারণ, তা বল প্রয়োগ বা উপদেশ দিয়ে সবার ওপর চাপিয়ে দেয়া গেলেও এর যৌক্তিক ভিত্তি নেই। একটি মতবাদ একটি একক ব্যবহারিক ব্যবস্থা– তাত্ত্বিক বা তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোনো কিছু নয়। এ ব্যবস্থায় যা বিরাজমান তার ব্যাপারে ধারণা দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অ্যারিস্টটল বা নিউটনের পদার্থ বিজ্ঞান প্রতিটি তত্ত্বগতভাবে ধারণ করা একটি ব্যবস্থা।

একটি ব্যবহারিক ব্যবস্থা হচ্ছে তা-ই। প্রাচীন কালেও দেখা যায়, জ্ঞান দু'ভাগে বিভক্ত ছিল : তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক। অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যবস্থায় একটি অনুসন্ধানের লক্ষ্য থাকে শ্রেষ্ঠ পথটি বের করা। যেমন মানুষ কীভাবে বসবাস করবে এবং একটি সমাজের কেমন হওয়া উচিত। এর একটি স্তম্ভ হলো সংগঠন যার কতক বিভাগ আছে এবং এদের প্রতিটির নিজস্ব অবস্থান রয়েছে, নিজস্ব কাজ ও গুরুত্বও রয়েছে। বিক্ষিপ্ত এক গাদা ধারণার সমষ্টি একটি সুসংহত ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারে না। একটি মতবাদ হলো সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণাসমূহের সমষ্টি যা বাস্তব জীবনের সাথে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সম্পর্কযুক্ত। যেমন কেমন হওয়া উচিত, কেমন হওয়া উচিত নয়। তাত্ত্বিক ধারণা-ই এর ভিত্তি এবং চালিকা শক্তি। তাই আমরা বলি, প্রতিটি মতবাদ সর্বজনীন প্রেক্ষাপটের ওপর ভিত্তিশীল। যার অর্থ দাঁড়ায় পৃথিবী যেমন আছে তেমন দেখা– মানুষের কেমন হওয়া উচিত এভাবে দেখা থেকে তা সুস্পষ্টভাবে আলাদা। একটি মতবাদের চালিকা শক্তিকে একদিকে অবশ্যই দীর্ঘ মেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির হতে হবে এবং অস্তিত্বমান-এর মূল্যায়ন করতে হবে। অন্যদিকে তাকে আদর্শ সৃষ্টি করতে হবে–কেবল দার্শনিক ভিত্তি নয় বরং ধর্মীয় ভিত্তির ওপরও তার প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। এতে কিছু উপস্থাপন করা হবে যা সবাই ভালোবাসবে– একটি নীতি এবং একটি সামাজিক আদর্শ। জ্যোতির্বিদ্যা মহাকাশে বিরাজমান গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে জ্ঞান বিতরণ করে থাকে তবে সেগুলোর কেমন হওয়া উচিত বা কেমন হওয়া উচিত নয় এ সম্পর্কে কিছুই বলে না। কারণ, এসব ব্যাপার মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত নয়।

একটি মতবাদ এমন কিছু উপস্থাপন করে যাতে মানবের জন্য একটি আদর্শ তুলে ধরা হয়। সর্বজনীন প্রেক্ষাপটে দর্শনের ভিত্তি উপস্থাপনে একেশ্বরবাদিতা সফল। একইভাবে একটি অন্তর্দৃষ্টি লাভেও তা সক্ষম। একই সাথে তা স্রষ্টার একত্বকে ঘোষণা করে, যেমন কুরআনে বলা হয়েছে : 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।'

প্রাচীনকালে একেশ্বরবাদিতা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল : আভাস, গুণাবলী, কাজ ও উপাসনার একেশ্বরবাদ। আভাসের একত্ববাদে বলা হয় স্রষ্টার সমকক্ষ বা অংশীদার নেই। গুণাবলীর একত্ববাদে তুলে ধরা হয় তাঁর আভাস তাঁর গুণাবলীর প্রতিপক্ষ নয়, আবার এরা পারস্পরিক প্রতিপক্ষ নয়। তাঁর প্রজ্ঞা ও জ্ঞানে সকল পূর্ণতা বিরাজমান। কর্মের একেশ্বরবাদিতা মানে সকল কর্মের ঐক্য; উপাসনার একেশ্বরবাদ দাবি করে তিনিই একমাত্র উপাসনার যোগ্য এবং অবশ্যই তাঁর উপাসনা করতে হবে, আর এ বিষয়টি মানব আত্মায় মিশে আছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

> 'তোমরা কি আল্লাহর দীন অপেক্ষা অন্য কোনো ধর্ম সন্ধান করছো অথচ আসমান যমীনের সবকিছু তাঁকে মেনে চলে?' (সূরা আলে ইমরান : ৮৩)

আমাদের উপাসনা এক রকম– আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য। যেমন বলা হয়েছে সৃষ্টির সব কিছুই তাঁর প্রশংসা করে। (সূরা জুমুআ : ১, সূরা সফ্ফ : ১, সূরা রাদ : ১৫) উপাসনার একেশ্বরবাদে স্রষ্টার আভাস মানবের জন্য আদর্শ। যেহেতু স্রষ্টা একক-অনন্য, তাঁর জন্য কোনো দ্বিতীয় শরীক নেই, আর তিনিই বিশ্বজগতের উৎস এবং উপাসনার যোগ্য একমাত্র সত্তা, এভাবে একেশ্বরবাদে দু'টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে : প্রথমত এটা একপ্রকার দৃষ্টিভঙ্গি ও অস্তিত্বের মূল্যায়ন, আর দ্বিতীয়ত মানবের জন্য আদর্শ। মার্কসবাদ পুরোপুরি ভিন্ন। একটি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যাতে জীবন যাপন নিয়ে বিচার-বিবেচনা রয়েছে তবে কখনই তা অর্থনীতিকে পাশে সরিয়ে আদর্শ উপস্থাপন করে না। উদ্দেশ্য হিসাবে তা বঞ্চিত মানুষের স্বার্থের কথা তুলে ধরে; তাদেরকে তাদের অধিকার ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করতে বলে। কিন্তু এটা একটি ত্রুটিপূর্ণ লক্ষ্য এবং অর্জন না করা পর্যন্ত তা আদর্শ রূপেও গণ্য হতে পারে। তবে লক্ষ্য অর্জিত হবার পর? আদর্শ বা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হওয়াটা তখন শেষ হয়ে যায়।

বস্তুবাদী কোনো লক্ষ্যকে পবিত্র লক্ষ্যরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ উদ্দেশ্য মানবিক লক্ষ্যের ঊর্ধ্বে নয় এবং এখানে অত্মোৎসর্গ অযৌক্তিক, যেহেতু তা বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার সমষ্টি। আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে বস্তুবাদী লক্ষ্য অর্জন করা স্ববিরোধী একটি ব্যাপার। সুতরাং একে কি আদর্শ বলা যায়?

মার্কস্‌বাদ আসলে আদর্শের অনুপস্থিতি এবং ব্যক্তি-স্বার্থের আবেগের দিকে প্রত্যাবর্তন। এর শক্তি শেকল ভাঙ্গায় নিহিত। জীবনের সকল ক্ষেত্র তা পরিব্যাপ্ত করতে পারে না। যেমন : রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নীতি-নৈতিকতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর কোনো ভূমিকা নেই। কেবল প্রচ্ছন্ন বা পরোক্ষ সংযোগ পাওয়া যায়। ফলে ন্যায়বিচার ও নীতি-নৈতিকতা প্রকৃত অর্থ হারিয়ে ফেলে।

কোনো মতবাদে কার্যকারণ সম্পর্কে নির্ধারিত উদ্দীপনার দেখা মিলতে পারে, তবে একটি মতবাদের অবশ্যই যুৎসই আদর্শ থাকা দরকার যা বিশ্বজনীন একটি রূপ লাভ করবে। এর বিপরীত বক্তব্য সঠিক নয়, যেহেতু উপযুক্ত আদর্শ ছাড়া বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির কোনো মতবাদে সামগ্রিক উদ্দীপনার দেখা পাওয়া অসম্ভব। গঠনমূলকভাবে দেখা যায়, মানুষ ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকে, অতীত বা বর্তমানের দিকে নয়। সুতরাং দর্শন একা যথেষ্ট নয়। বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিও পরস্পর বিরোধী হতে পারে। একটি হয়ত বাধ্যবাধ্যতা আরোপ করে অথচ অন্য কোনোটি তা করে না। অন্য কথায় কোনোটি হয়ত মানুষকে দায়-দায়িত্ব দিচ্ছে; কিন্তু অন্যটি দিচ্ছে না। একেশ্বরবাদী বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি একটি ঐশী বাধ্যতা আরোপ করে; অন্যদিকে যেমন অস্তিত্ববাদে আধ্যাত্মিক ভিত্তি নেই। এক ব্যক্তি বলতে পারে, 'আমি আমার জন্য দায়িত্ববান যেহেতু আমি স্বাধীন।' কিন্তু এরকম স্বাধীনতার কোনো অর্থ নেই যেহেতু তা অন্য সবকিছুর সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং তাই অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে। ধরুন আমি মুক্ত এবং ঐশী বা পরিবেশগত বাধ্যবাধ্যতা আমাকে চালনা করে না। তাহলে তারা যেমন বলে, 'আমি আমার জন্য দায়িত্ববান, অন্য কেউ নয়' এটা কি অন্যদেরও দায়-দায়িত্বের সাথে সংযুক্ত করে? আমি কি আমার জন্য এমন কিছু চাইবো যা অন্যদের জন্যও লাভজনক হবে? তারা যদি এ দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করে, তা কোত্থেকে এলো? অন্যরাও মুক্ত এবং ঐ পরম স্বাধীনতার সাথে অন্যের সামনে দায়-দায়িত্বের কোনো যোগসূত্র নেই।

এ রকম যে স্বাধীনতার কথা তারা বলে থাকে তা আদর্শ হবে এটাও অর্থহীন। এ দিয়ে বোঝায় আমার পছন্দের সাধারণ স্বাধীনতা আছে এবং দাবি করা হয় ঐ পছন্দ শুধু আমার জন্যই ভালো নয়, বরং তা অন্যের জন্যও ভালো। কিন্তু অন্যরাও স্বাধীন এবং কারও নিজস্ব ইচ্ছার ব্যাপারে কোনো প্রতিনিধিকে প্রাধান্য দেয়া যায় না। অধিকন্ত আমরা আরও একমত হতে পারি যে, আমার পছন্দ এতটা সঠিক হবে যে, তা অন্যদের যা দায়-দায়িত্ব সে অনুভূতি থেকে আলাদা। একটি বিশেষ চলা বা না চলার জন্য কে আমার কাজের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করবে? কোনো স্রষ্টা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আছেন কি যিনি আমার হিসাব নেবেন? আপনি হয়ত বলবেন, 'না'। বিবেক-বিবেচনা আছে কি? আবারও অপনি হয়ত বলবেন, 'না'। তাহলে কে?...

একেশ্বরবাদী বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি পথ নির্দেশক রূপে কাজ করে যেহেতু আদর্শ এবং দায়িত্ববোধ সৃষ্টির ক্ষমতা তার আছে। এটা লক্ষ্য অর্জনের পথ দেখায়। এটা আনন্দ এবং উৎসাহ যোগায় এবং আমাদের মধ্যে আত্মোৎসর্গের উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, আল্লামা তাবাতাবায়ী বলেছেন, এটা এমন এক মৌলিক বিষয় হতে পারে যা শিক্ষণের সকল উপাদান নিয়ে গঠিত। একেশ্বরবাদ-এর নীতি যেন পানি– যা সকল ধারণার শেকড়ে সিঞ্চিত হয় অথবা রক্তের মতো যা খাদ্য বয়ে নিয়ে যায় শরীরের সকল অংশে অথবা অত্মার মতো যা একটি মতবাদে জীবন ও গতিময়তার উদ্রেক করে। আদর্শ প্রসঙ্গে সারটার ও অন্যরা বলেন, কোনো সীমারেখায় মানুষের থেমে থাকা উচিত নয়, বরং তার বাইরেও তার যাওয়া উচিত এবং নতুন লক্ষ্যের জন্য তার আগের পরিকল্পনা পরিবর্তন করা দরকার। আর এভাবে তাকে আব্যাহতভাবে এগিয়ে যেতে হবে। এর অর্থ হলো একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে নিরবচ্ছিন্নভাবে গতিশীল থাকা যেমন একটি লোক সামনে হেঁটে চলছে আর চলছে যতক্ষণ না নতুন দিগন্ত তার চোখের সামনে খুলে যায়। সে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে থামতে চায় না; কারণ, সে জানে ঐ স্থান হচ্ছে মৃত্যু। একেশ্বরবাদে লক্ষ্যটি শুরু থেকেই সেখানে আছে– খুবই স্পষ্ট এবং অসীম। প্রতিনিয়ত তা নতুন এবং অদম্য। অন্য কোনো বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিতে আদর্শ এবং উদ্দীপনা শক্তিরূপে মতবাদের উৎস ও চলৎশক্তির সমন্বয় ঘটেনি। সে সাথে একেশ্বরবাদ বাধ্য বাধকতা আরোপ করে, আনন্দ সৃষ্টি করে, নির্দেশনা প্রদান করে, আত্মোৎসর্গে উদ্বুদ্ধ করে, মানবজাতির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটায়, যাতে সব সমস্যার সমাধান করা যায়। এটা একমাত্র একেশ্বরবাদের বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি যার এত সব গুণ ধারণ করার ব্যাপকতা রয়েছে।

ইসলামী বিশ্বাস ও মানব পূর্ণতা

ইসলামে কী বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে এবং কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, অক্ষরূপে যাকে কেন্দ্র করে সবকিছু আবর্তন করে? এখানে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর কথা। দ্বিতীয়ত ফেরেশতা, পবিত্র আসমানী গ্রন্থসমূহ, নবী-রাসূল, পরকাল ইত্যাদির ওপর বিশ্বাস। ইসলামের বর্ণিত এ বিশ্বাস কি মানব জাতির কোনো লক্ষ্য নাকি অন্য লক্ষ্যসমূহের জন্য উপায় স্বরূপ? এর সবই মানবের লক্ষ্য; কারণ, ঐশী লক্ষ্য বা উপায় সম্পৃক্ত নয়। এ লক্ষ্যগুলোকে পূর্ণতার পথে মানবের অর্জন বলে ধরা হয়।

বিশ্বাস নিজেই কি মানবের পূর্ণতা, যা তার প্রতি উপদেশরূপে এসেছে? নাকি এ বিশ্বাসগুলোর ইতিবাচক প্রভাবের কারণে এগুলোর ওপর বিশ্বাস পোষণ করতে মানবজাতিকে আহ্বান করা হয়েছে? দার্শনিকরা প্রশ্নটি এভাবে করেছেন 'বিশ্বাস স্থাপন মানুষের জন্য আশীর্বাদ নাকি উপকারী? 'আশীর্বাদ' আর 'উপকারী হওয়া' এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আশীর্বাদ নিজেই কাঙ্ক্ষিত

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পূর্ণতা, নিজের জন্য–অন্য কোনো কিছুর জন্য নয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় কোনো জিনিস ভালো তার উপকারী প্রভাবের জন্য। এটা আশীর্বাদের ভূমিকা, নিজেই আশীর্বাদ নয়।

ইসলাম নিয়ে আলোচনায় এটা অবশ্যই পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, প্রভাব নির্বিশেষে একটি লক্ষ্য নাকি আশীর্বাদ। আমরা বিশ্বাসের প্রভাবের কথা বলি, বিশ্বাস দুর্ঘটনার বিপরীতে প্রশান্তি, সহিষ্ণুতা দিয়ে থাকে এবং এর ফলে সমাজে একে অন্যকে বিশ্বাস করে; পরস্পরের উপকার করে, ঈর্ষা থেকে দূরে থাকে।

কিন্তু বিশ্বাস কি ভালো প্রভাবের জন্য? নাকি নিজেই পূর্ণতা অন্বেষণ করে বলে? এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কিসে হয় মানব পূর্ণতা? বস্তুর পূর্ণতা সংক্রান্ত প্রশ্নের চেয়ে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া অধিকতর কঠিন। এ বিশ্বে আমরা প্রতিনিয়ত বস্তুর পূর্ণতা নিরূপণ করে থাকি। একটা ভালো আপেল কেমন হওয়া উচিত? এতে স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ, আকার-আকৃতি ইত্যাদি বোঝায়। আর যদি একটি আপেল এমন হয় তাহলে বলি আপেলটি পূর্ণতা লাভ করেছে।

একটি পূর্ণ বাড়িও সহজে নির্ধারণ করা যায়, একটি ঘোড়াও। কিন্তু সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার হলো একজন পূর্ণ মানবের সংজ্ঞা দেয়া। ফলে তাকে নিয়ে বিভিন্ন প্রকার ধারণা খতিয়ে দেখা দরকার কোন্‌গুলো সঠিক অথবা আমরা যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে না পারি অন্তত কুরআন কীভাবে এবং কতটুকু ধারণা অনুমোদন করে তা দেখা উচিত।

এটা কি বলা ঠিক হবে যে, সেই সত্তা পূর্ণ যে তার বহির্জগৎ-প্রকৃতি থেকে সর্বাধিক পরিমাণ সাফল্য অর্জন করে? কিন্তু না, দু'টি কারণে এটা ভুল; প্রথমত আমরা অন্য কোনো কিছুকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করি না। অমার বলি না, ঘোড়াটি পূর্ণ; একমাত্র কারণ, সর্বোচ্চ উপকার পেয়ে থাকি। আমরা এর নিজস্ব গুণাবলী ও সম্পদ বিবেচনা করি। আমরা বিবেচনায় নেই না অনেক বেশি পরিমাণ খাবার খায় বলে ঘোড়াটি পূর্ণতা অর্জন করেছে। একটি আপেল বেশি বাতাস, আলো, পানি পেয়েছে বলেই তাকে পূর্ণ বলি না।

দ্বিতীয়ত বিবেচনাপ্রসূত নয় যে, যে লোকটি প্রকৃতি থেকে সবচেয়ে বেশি আহরণ করলো– সে পূর্ণমানব। কারণ, এতে মন্তব্য করা যায়, যে প্রকৃতি থেকে কম সুবিধা নিতে পারলো সে ত্রুটিপূর্ণ (পঙ্গু) কোনো মানব!

আমরা দু'টি মানব চরিত্র নিয়ে একটু আলোচনা করি : মুআবিয়া আশি বছর দীর্ঘ জীবনে প্রচুর পার্থিব কল্যাণ ভোগ করেছেন। চল্লিশ বছর ধরে তিনি সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। (২০ বছর ধরে শক্তিশালী গভর্ণর আর বাকী ২০ বছর প্রভাবশালী খলীফা) অন্যদিকে আলী (আ.) কঠোর সংযমী জীবন যাপন করতেন যাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল হয়তো বা মুক্ত হওয়া, নয় মহৎ বা মানবিক হওয়া, অথবা এ পৃথিবী থেকে কিছু না নেয়া। তবে আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোযোগ দেয়ার ব্যাপারটা ছিল নিশ্চিত। যা হোক তাঁর পার্থিব ভোগের পরিমাণ ছিল কয়েক টুকরো রুটি। তাঁকে কি আমরা অসম্পূর্ণ মানব রূপে অভিহিত করবো পার্থিব ভোগ ন্যূনতম বলে?

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

যদি আমরা এমনটা বলি, তাহলে জন্তুর চেয়েও মানবকে খাটো করে ফেলা হয়। কারণ, এ পৃথিবী থেকে উপকৃত হবার মাপকাঠিতে আমরা জীব-জন্তুকেও মূল্যায়ন করি না; অবশ্য কেউ কেউ মানুষের মূল্যায়নে এর বাইরে কিছু চিন্তাও করে না। তবে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যে, আধ্যাত্মিক বিষয়াবলি অস্বীকার করে এগুলো বিশ্বাস করবে। এখানে আরেকটি বিষয়ের অবতারণা করা যায়, যদি এ পার্থিব সুখ অর্জন মানবের পূর্ণতার মাপকাঠি না-ই হয় তবে পরবর্তী বিষয়টির ব্যাপারে কী বলা যায়? অর্থাৎ মানবের পূর্ণতা হচ্ছে স্রষ্টার উপহার থেকে উপকৃত হওয়া–ঐ উপহার প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করা। তবে পার্থিব উপায়-উপকরণ দিয়ে এটা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তাই মানুষ প্রার্থনা করে পরকালে সর্বাধিক পরিমাণে উপকৃত হবার জন্য। এরকম প্রার্থনা নিয়ে ইবনে সিনা বলেন : 'এরকম লোকরা প্রার্থনা করে শ্রমিকের মতো যারা বেতনের আশায় পরিশ্রম করে। অর্থাৎ বেতন ছাড়া তাদের কাজের কোনো আগ্রহ নেই।'

ইসলামী যুক্তির নিরিখে এ রকম বিশ্বাসে যে ইবাদাত করা হয় তা ত্রুটিপূর্ণ, যেমন শুধু বেহেশতে পুরস্কারের আশায় আনুগত্য দেখানো, উপাসনা করা। ইমামগণ থেকে এ প্রসঙ্গে প্রচুর সংখ্যক বর্ণনা আছে। 'যারা ভয়ে ইবাদাত করে, তারা দাসের মতো যেন কেউ মনিবের ভয়ে কোনো কাজ করে।' একই রকম কথা বলেছেন আলী (আ.)। (নাহজুল বালাগা, জ্ঞান গর্ভমূলক বাণী : ২২৯)

'কেউ আল্লাহর উপাসনা করে লোভে; এটা হলো ব্যবসায়িক ইবাদাত; কেউ ভয়ে; এটা দাসের ইবাদাত; কেউ ইবাদাত করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আর এ ইবাদাত বিনয়ীর ইবাদাত।' অন্যত্র আলী (আ.) আরও পরিষ্কার করে বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের ভয়ে বা জান্নাতের লোভে তোমার ইবাদাত করি না; আমি তোমার ইবাদাত করি; কারণ, তুমি ইবাদাতের যোগ্য।'

কাজেই বস্তুগত সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করার সামর্থ্য দিয়ে মানব পূর্ণতা পরিমাণের ধারণা সঠিক নয়। এমনটি এ পৃথিবীর গুণরাজি অস্বীকার করে বা ভবিষ্যৎ জীবনের পার্থিব সুবিধাদি জমা রেখেও মানব পূর্ণতা পরিমাণের বিষয়টি সঠিক নয়। বিভিন্ন রকম বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যার সবকিছুই শুধু কল্যাণের ধারণায় পর্যবসিত হয়।

আধ্যাত্মিক ধারণা নিম্নরূপ

১. সম্ভবত 'পূর্ণ মানব' সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণাটি হলো জেনো'র ধারণা। বিভিন্ন ধর্মে প্রভাবিত হয়ে তাঁরা এ ধারণার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। বিভিন্ন ধারণা, যেমন 'আদম', 'নবী -রাসূল', 'সিদ্ধপুরুষ' এবং 'প্রতীক্ষিত মাহদী'র মতো পূর্ণ মানব থেকেও তাঁরা প্রভাবিত। ম্যাকিনিয়ন 'ইসলামে পূর্ণ মানব' নামে বই লিখেছেন। আবদুর রহমান বাদাভী বইটি আরবি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এখানে তিনি বলেন, 'পূর্ণ মানব তত্ত্ব গ্রীক সনদে প্রাপ্ত নয়; কারণ, এ ব্যাপারে গ্রীক দর্শনে কিছুই বলা হয়নি।'

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইসলামী জগতে সূফীবৃন্দ, যেমন মহিউদ্দীন আরাবী এ বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। অনুরূপ বই-পত্র লিখেছেন আবদু-করিম দেইলামী, আজিজ আল দীন নাসাফী এবং একজন সূফী কবি সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ বরকতি। জেনো মানবের পূর্ণতার ও পূর্ণ মানব-এর ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করতেন যা অন্যদের কাছে হয়ত পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য ছিল না; তবে তাঁরা চূড়ান্ত নির্ধারণী মন্তব্যে তা উপস্থাপন করতেন।

তাঁরা বিশ্বাস করতেন, একটি সত্য আছে, আর তা হলো স্রষ্টা। অন্য সবকিছু ঐ সত্যের ছায়া মাত্র। তাঁদের ধারণা সবকিছুই স্রষ্টার মহিমা প্রকাশ করে। যদি আমরা ঐ সত্যের পরিচয় না পেয়ে মারা যাই আমাদের মৃত্যু হবে অবিশ্বাসীর, মূর্খের, অন্ধকারের এবং চরম উদাসীনতার মৃত্যু। একজন মানুষ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় যখন সে ঐ সত্যকে বুঝতে পারে এবং তা অর্জন করে। তাঁদের ধারণা এটা অসম্ভব যে, স্রষ্টা মানুষের মধ্যে উপস্থিত হবেন বা তার সঙ্গে সংযুক্ত হবেন। তাঁদের ধারণামতে রূপধারণ হচ্ছে দ্বৈততা। কাজেই সত্য পাওয়া বা স্রষ্টাকে পাওয়ার অর্থ হলো নিজেকে স্রষ্টায় বিলীন করে দেয়া। আর তা হবে সত্যকে পুরোপুরি উপলব্ধি করার পর আর তখনই সে নিজেকে চিনবে। স্রষ্টা হচ্ছেন একমাত্র সত্য আর বাকী সব কিছুই তাঁর প্রকাশ। এটা মোটামুটি স্রষ্টার কাছে পৌঁছানোর মতো একটা ধারণা। এ ধারণা মতে তাঁরা বিশ্বাস করেন, তা না হলে নির্দিষ্ট নিয়মে ধাপে ধাপে স্রষ্টার দিকে এগুতে হবে। কাজেই জেনো মতবাদের সত্য অর্জনের বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। যে তা অর্জন করতে পারে না সে অপূর্ণ, আর মানবতা নির্ভর করে সত্যকে জানা ও অর্জন করার ওপর।

সত্য ও স্রষ্টার দিকে এগিয়ে যেতে সহায়ক হচ্ছে প্রেম, সহানুভূতি ও পরিচিতি। তাঁর দিকে যাবার পথে দর্শন বা মন দিয়ে নয়– হৃদয় দিয়ে এগুতে হয়। অন্য সকল পূর্ণতা, তাঁর পূর্ণতা থেকে উৎসারিত। আর কেবল এ কারণেই একে পূর্ণতা বলে বিবেচনা করা হয়। সংযম কি পূর্ণতা? তারা বলবেন, হ্যাঁ! কারণ, ঐ পথে চলার জন্য এটা একটা শর্ত। বিনয়, সহায়তা, পথনির্দেশসহ এরূপ আরও বিভিন্ন সদগুণাবলি যেগুলোর নৈতিক কল্যাণ রয়েছে সেগুলো ঐ পথে চলার শর্ত।

২. ঐশী মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকরা জেনো'র ধারণার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁদের মতানুসারে মানবের পূর্ণতা দু'টি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল; ঘটনার স্বীকৃতি ও জ্ঞান। জেনো গুরুত্ব দেন 'সত্যের' ওপর, কিন্তু ঐ দার্শনিক গুরুত্ব দেন জ্ঞানের ওপর, যা হলো বস্তু ও তার অস্তিত্বের বাস্তবতা সম্পর্কে উপলব্ধি; সাধারণত জ্ঞান নয়। যেমন : আপেলের বৈশিষ্ট্যাবলি বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত, জ্ঞানের সঙ্গে নয়। আবার একটি নগরী বা বাড়ি সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে জানা আর তার ভিন্ন ভিন্ন অংশ সম্পর্কে জানা এক নয়।

একজন সাধক বিশ্বজগতের বৈজ্ঞানিক ও সঠিক স্বীকৃতির সাধারণ প্রেক্ষাপটে মানবপূর্ণতাকে বিবেচনা করেন। তার কাছে বস্তুগত এ জগৎ বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যা উদ্দেশ্যমূলক জগতের সাথে সংযুক্ত। যেমন : উদ্দেশ্যমূলক জগতে একজন স্রষ্টা আছেন, তাঁর চিরন্তন নিয়ম-শৃঙ্খলা, বস্তু ও অবস্তুও রয়েছে সেখানে। বিজ্ঞানসম্মত বা বুদ্ধিবৃত্তিক জগতেও এ বিষয়গুলো নিশ্চিতভাবে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বিরাজ করে। তাদের ধারণামতে একজন পূর্ণ মানবকে তাই জ্ঞানের স্বীকৃতি দিতে হবে। আমরা জ্ঞানের সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে আলোচনা করতে পারি; কিন্তু আমরা এর উৎস বা নিয়মনীতি নিয়ে কিছু বলতে অপারগ। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে, 'জ্ঞানের আশীর্বাদ যে কারও ওপর মঞ্জুর করা যেতে পারে যে ইচ্ছা পোষণ করে এবং যে তা গ্রহণ করে অফুরন্ত কল্যাণ খুঁজে পায়।' (সূরা বাকারা : ২৬৯)

জ্ঞানের পাশাপাশি পূর্ণতার পূর্বশর্ত রূপে এমন সাধক ন্যায়বিচারকে শর্ত বলে মনে করেন–নৈতিক ন্যায়বিচার যার ওপর সামাজিক বিচার নির্ভরশীল। এর অর্থ দাঁড়ায় মানুষের শারীরিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি যা তার অন্তর্নিহিত বিষয়াবলির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এ দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য থাকা উচিত। অন্য কথায় বুদ্ধির উচিত সকল ক্ষুধা, তাড়না ও কল্পনার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করা যাতে এগুলোর প্রতিটি শক্তি যোগ্যতা অনুযায়ী পরিমিত অংশ নিতে পারে। সাধকদের পরিভাষায় জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলিকে অনুসন্ধিৎসু বুদ্ধি, আর বিচার সম্পর্কিত বিষয়াবলিকে ব্যবহারিক বুদ্ধি বলে অভিহিত করা হয়।

'বিশ্বাস' সংক্রান্ত প্রশ্নটিকে 'জ্ঞান' প্রসঙ্গে পুনরায় উত্থাপন করা যায়। জ্ঞান কি মানুষের 'সমাপ্তি' বা 'উপায়' তুলে ধরে? জ্ঞান নিজেই কি 'সমাপ্তি', 'উপায়' নাকি উভয়? জ্ঞান কি মানবের পূর্ণতা। যদি তা-ই হয় তাহলে তা সুবিধাদি সম্পর্কিত হয়ে পড়ে, আর সুবিধা ছাড়া তা মূল্যহীন হয়ে য়ায় এবং যতই সুবিধা ততই এটা ভালো হয়।

৩. তৃতীয় একটি মত অনুযায়ী মানবের পূর্ণতা আবেগ-অনুভূতিতে অন্তর্নিহিত; যেমন প্রেম। এটা একটা নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি যা দাবি করে অন্যদের প্রতি যার সহমর্মিতা বেশি সে-ই পূর্ণ। আর যদি সে অন্যদের প্রতি নামমাত্র সহানুভূতিশীল হয় সে অপূর্ণ এক মানুষ। নৈতিক বঞ্চনার ভিত্তি হচ্ছে স্বার্থপরতা। স্বার্থপরতাকে যে যত বেশি দূরে রাখতে পারে সে তত বেশি পূর্ণ। এ বিষয়ের ওপর হিন্দুরাও বেশ গুরুত্ব আরোপ করেছে। 'এ আমার বিশ্বাস' গ্রন্থে গান্ধী এ বিষয়টির ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছেন। হিন্দু ধর্মে সত্য ও সুন্দর (প্রেম) দু'টির ওপরই জোর দেয়া হয়েছে এবং এ দু'টি বিষয় অস্বীকারকারী পশ্চিমা সভ্যতার সমালোচনা করেছে।

৪. মানবপূর্ণতা নিয়ে আরেকটি মতবাদ হচ্ছে সৌন্দর্য। অবশ্য এ সৌন্দর্য বাহ্যিক নয়, আধ্যাত্মিক। শৈল্পিক বস্তু শৈল্পিক মেজাজ প্রকাশ করে, আর সব সুন্দর বস্তুর সৃষ্টি হয়।

৫. আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি যা পাশ্চাত্য ধারণারূপে খ্যাত তা বস্তুবাদী। এ মতবাদে মানবপূর্ণতা ক্ষমতায় নিহিত। যে ব্যক্তি যত বেশি ক্ষমতাশালী, নিজ গণ্ডি ও অন্যদের ওপর যত বেশি প্রভাবশালী, সে তত পূর্ণ। ডারউইনের বিবর্তনবাদেও এ ধারণা প্রতিফলিত হয়। ডারউইনের মানদণ্ডে অধিকতর পূর্ণ সত্তা নিজের সুরক্ষায় অবশ্যই যথেষ্ট শক্তিশালী এবং টিকে থাকার লড়াইয়ে সে প্রতিপক্ষকে নির্মূল করতে সক্ষম। ডারউইনের সমালোচনা করা হয়েছে তাঁর 'টিকে থাকার লড়াই' সংক্রান্ত তত্ত্বে নীতি-নৈতিকতার কোনো স্থান না দেয়ার কারণে। অনেক পশ্চিমা পণ্ডিতও স্বীকার করেছেন জ্ঞানই

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মানুষের উপকার করে, তাকে আরও ক্ষমতাবান করে এবং প্রকৃতিতে বিরাজ করে। এভাবে তাঁরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রচার চালান সভ্যতা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের অনুঘটক রূপে। এ ধারণার প্রয়োগও রয়েছে এবং তা এমন পরিসরে চলছে যে, উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হচ্ছে। তাঁরা জ্ঞান, সততা, প্রেম এবং বিশ্বাস-এর পবিত্রতা অগ্রাহ্য করেছেন যা আগে মানবজাতি বিশ্বাস করতো। তাঁদের মতে সব কিছুই ক্ষমতার কাছে নতি স্বীকার করে আর তাই তার মানবিক অগ্রগতির পথ পরিবর্তন করেছে। আর তখন থেকেই মানুষ আধ্যত্মিকতায় বিশ্বাস ছেড়ে দিয়েছে। যদি তাঁরা আধ্যাত্মিকতার দাবি করেন, তা হবে তাঁদের প্রতিপক্ষের কাজ।

নিৎসে'র দর্শন সমালোচিত হয় অনেক আড়ম্বরতার কারণে। তবে তিনি খোলাখুলি ও পরিষ্কার ভাষায় কথা বলতেন। তাঁর যৌক্তিক উপসংহার– ক্ষমতার সেবায় বিজ্ঞান নিয়োজিত, আর মানবের পূর্ণতা স্বীকৃত তার ক্ষমতায়।

ইসলামী একেশ্বরবাদ : উপসংহার

মানবের পূর্ণতা প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী? যখন একটি মতবাদ কোনো আদর্শ স্থাপন করতে চায় তখন অবশ্যই নির্দেশিকা ও তা মেনে চলার কারণ জোরালোভাবে উপস্থাপন করে এবং সামনে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উপস্থাপন করে তা সবাইকে অনুসরণ করতে আহ্বান জানায়। ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে সত্যিকারের একজন মুসলমানের সত্যিকার উদ্দেশ্য। একজন পূর্ণ মানবের ধারণা তুলে ধরা হচ্ছে আসলে ইসলামী আদর্শ ও এতৎসংক্রান্ত নীতিমালা নিয়ে একটি মৌলিক আলোচনা। মানব-পূর্ণতা এবং একটি পূর্ণ-সত্তা নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে। এখানে একটি উপসংহার টানা হবে।

জেনো-এর ধারণামতে 'সত্য' হচ্ছে সবকিছুর ভিত্তি। 'সত্য' শব্দটি দিয়ে তাঁরা 'স্রষ্টার আভাস' এবং সৃষ্ট সকল আকার-আকৃতি ও বস্তু 'স্রষ্টার প্রকাশ' বলে অর্থ করেন। এভাবে যে 'সত্য' স্রষ্টা তা ছাড়া অন্য সবকিছুই তাঁর ছায়া, তবে সত্য নিজেই এক বাস্তবতা। স্রষ্টা বলতে পরম প্রভুকে বোঝানো হয়েছে, কেউ যাঁর সমকক্ষ নয় বা যাঁর সাথে তুলনীয় নয়। তাঁরা আরো বিশ্বাস করেন, মানুষ স্রষ্টার সাথে মিশে যেতে পারে অথবা তাঁরা যেমন বলেন, স্রষ্টায় বিলীন হয়ে যেতে পারে। মানুষ একটি সত্তা, তার স্রষ্টা থেকে ভিন্ন সত্তা; মানবের পূর্ণতা বা সুখ তার উৎস-স্রষ্টার কাছে ফিরে যাওয়ার মধ্যে নিহিত। তাঁরা এ লক্ষ্য অর্জনের পথ ও উপায় প্রদর্শন করেন, আর তা একজন মানুষের সারা সত্তায় নিহিত যেমন এর হৃদয় এবং তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন যা পূর্ণ একত্বের পথের প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে দেয়। তাদের উপায় হলো প্রেম, উপাসনা ও আত্মশুদ্ধি।

ঐশী মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকরা বিষয়টি ভিন্নভাবে দেখেন। তাঁরা বলেন, মানুষের অস্তিত্ব তার বুদ্ধিতে আর বাকী সব বিষয় দ্বিতীয় পর্যায়ের। বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার পূর্ণতার দু'টি দিক : অনুসন্ধিৎসু ও ব্যবহারিক। অনুসন্ধিৎসু বা তাত্ত্বিক দিকে আছে জ্ঞান যার অর্থ হলো যা যেমন আছে তাকে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সেভাবে উপলব্ধি করা, আর ব্যবহারিক দিকে আছে ন্যায়বিচার। ন্যায়বিচার বলতে বোঝায় মানবের সমগ্র সত্তার ওপর অন্তর্নিহিত কোনো কামনা যা শক্তি নয়– বুদ্ধিবৃত্তিই বিজয়ী হবে। প্লেটো তাঁর 'থিওরী অব রিপাবলিক'-এ এমন একটি বিষয় তুলে ধরেন যে, দার্শনিকরা শাসকে বা শাসকবর্গ দার্শনিকে রূপান্তরিত হন। এ তত্ত্বটি ব্যক্তি পর্যায়েও ব্যবহার কার যায় এবং বলা হয়, একজন তখনই সুখী হয় যখন তার অস্তিত্ব দর্শন দিয়ে পরিচালিত হয়। তাঁদের মতে সত্য অর্জন বিবেচ্য বিষয় নয়; তাঁরা চিন্তাধারা এবং প্রতিক্রিয়ার ওপর জোর দেন– হৃদয় বা আত্মার ওপর নয়। ঐ লক্ষ্য অর্জনের পথ হলো বুদ্ধিবৃত্তি, যুক্তি এবং কার্যকারণ।

অন্য একটি গোষ্ঠী প্রেমকে মানবপূর্ণতা বলে বিবেচনা করে। এর অর্থ নিজেকে ভুলে যাওয়া এবং অন্যদের ভালোবাসা যাতে আপন-পরের মধ্যে কোনো সীমারেখা না থাকে। আর যখনই কোনো পছন্দের প্রশ্ন আসে তখন অন্যকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারও মানবিক আবেগ-অনুভূতি তার সীমারেখার লক্ষ্য পর্যন্ত বিকশিত হলে তাকে পূর্ণ মানব বলা যেতে পারে।

আবার অন্য একটি মতবাদে পূর্ণমানবের অস্তিত্ব রূপে সৌন্দর্যের কথা বলা হয় যে সৌন্দর্য হবে আত্মিক, বাহ্যিক নয়। বাহ্যিক সৌন্দর্য কোনো গুরুত্ব বহন করে না। সক্রেটিস এর ধারণার মূল কথা ছিল এটি। তাঁরা বলেন, সত্যবাদিতা ভালো; কারণ, তা সুন্দর। 'ভালো' শব্দটি বোধ এবং বুদ্ধি উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

জ্ঞান তাঁদের জন্য একটি পূর্ণতা, কারণ, তা সুন্দর। বিপরীতে মূর্খতা, ক্ষমতা, দায়ভার এবং দুর্বলতাও একই মানদণ্ডে বিচার্য। কবিতা, শিল্প এবং মৌলিকত্বের অর্থ দাঁড়ায় সুন্দরের সৃষ্টি, আর এ সুন্দরের স্রষ্টাও নিজে সুন্দর এবং সুন্দর সৃষ্টিতে সক্ষম। কেবল সুন্দর আত্মা-ই সুন্দর কবিতা বা সুন্দর আঁকতে পারে। কাজার বংশীয় এক রাজা সম্পর্কে একটি গল্প শোনা যায়। তিনি দু'লাইনের একটি ছন্দের একটি লাইন লিখলেন; দ্বিতীয় লাইনটি আর লিখতে পারলেন না। তিনি বিভিন্ন কবির সহায়তা চাইলেন। অবশেষে একজন দ্বিতীয় লাইনটি লিখলো যা সবচেয়ে মানানসই। প্রথম লাইনটি ছিল 'ইউসূফের মতো সৌন্দর্য আর কেউ দেখেনি' আর দ্বিতীয় লাইনটি হলো 'তবে যে ইউসূফকে সৃষ্টি করেছেন, প্রকৃত সৌন্দর্য তাঁরই। এটা খুবই সত্য কথা শুধু পরম সৌন্দর্যের অধিকারী স্রষ্টা-ই পারেন তাঁর সৃষ্টির মাঝে সৌন্দর্য ভরে দিতে।

এবার আসুন এসব মতবাদ সম্পর্কে ইসলামে কী মন্তব্য পাওয়া যায়। 'সত্য'-ই পূর্ণতা– ইসলাম কি এটা মেনে নিয়েছে? আমরা সামগ্রিকভাবে জোনো-এর মতবাদ গ্রহণ করতে পারি না। কারণ, ইসলাম অনুসারে, পিতা বলতে যে ভাব প্রকাশ পায় স্রষ্টা তেমন কোনো স্রষ্টা নন (পিতা তার মতো আরও সত্তা জন্ম দিতে সক্ষম)। যদি তা-ই হয়, সৃষ্টির কর্ম সম্পাদনের পর তিনি কে? তিনি কি পিতার মতো যার সন্তানাদি আছে? নাকি কেবল সৃষ্টের জীবিকা প্রদান করেই ক্ষান্ত। নাকি অ্যারিস্টটল যেমন বলেছেন প্রথম চালিকা শক্তি?

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইসলামে স্রষ্টার ব্যাপারে যুক্তি, 'তাঁর সাথে কারও তুলনা হয় না' এ যুক্তির চেয়ে উঁচু স্তরের। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ আসমান যমিনের নূর'–(সূরা নূর : ৩৫) অর্থাৎ তিনি তিনিই, অন্য সব কিছু তাঁর অধিকারভুক্ত। কুরআনের অন্যান্য বর্ণনায় পাওয়া যায় তিনি 'পরম সত্য'। কুরআনে আরো বলা হয়েছে : 'আমরা শিগ্‌গিরই তাদেরকে বিশ্ব জগতে ও তাদের হৃদয়ে আমাদের চিহ্ন দেখাবো যাতে তাদেরকে নিশ্চিত করা যায়- কুরআন সত্য।' (সূরা হা-মীম আস সাজদা : ৫৩) আসলে, যখন কেউ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তার জন্য সব কিছুই হ্রাস পেয়ে অনস্তিত্বে রূপান্তরিত হয়। কারণ, সে এমন জিনিস পেয়েছে যার তুলনায় আর সব কিছুই মূল্যহীন। সাদী তাঁর কাব্যগ্রন্থ বুস্তানে বিষয়টি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন–

'বুদ্ধিজীবীর জন্য এ পথ গোলক ধাঁধাঁ,
তবে জ্ঞানীদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নেই।'

তিনি তখন তার প্রশ্নের জবাব দেন :

> 'হে আমার বিজ্ঞ বন্ধু! ভালো প্রশ্ন করেছো; আমি তোমার বুদ্ধিবৃত্তিক অনুমোদনের জবাব দেব। এই যে সূর্য, সাগর, পাহাড়, আকাশ, মানুষ, দৈত্য-দানব, জ্বিন এবং ফেরেশতাবর্গ, যা-ই হোক না কেনো, তারা স্রষ্টার অস্তিত্বের সামনে অস্তিত্বের প্রশ্নে অতি নগণ্য।'

যদি তিনি-ই সত্তা, বাকী সব কিছু অনস্তিত্ব হয়, তাহলে স্রষ্টাকে চেনার পর কারও পক্ষে অন্যদিকে ফিরে যাওয়া বা অন্য কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ অসম্ভব। কাজেই স্রষ্টার সাথে অন্য কোনো স্রষ্টার তুলনা করার সম্ভাবনা অপেক্ষা ইসলাম অনুযায়ী বিশ্বাস অনেক ঊর্ধ্বে। স্রষ্টা সত্য, বাস্তবতা যাঁর সামনে আর কিছুই সত্য বা আসল নয়।

কিন্তু সাধকরা যে জ্ঞান-এর কথা বলেন ইসলামে কি তা গুরুত্বপূর্ণ? জ্ঞান সংক্রান্ত নীতি- যা যেমন আছে তার স্বীকৃতি– এটা ইসলামে অনুমোদন পায়। কুরআনে বলা হয়েছে, 'তিনি যাকে ইচ্ছে করেন তার প্রতি জ্ঞানের আশীর্বাদ মঞ্জুর করেন, আর যে তা পায় সে অফুরন্ত কল্যাণ লাভ করে।' (সূরা বাকারা : ২৬৯) এ আয়াত আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করবো? জ্ঞানকে বলা হয়েছে মানবীয় কল্যাণ এবং তা প্রায় পূর্ণতার কাছাকাছি– তা কেবল প্রয়োজনীয় তা নয়।

ন্যায়বিচার অর্থাৎ সামাজিক ন্যায়বিচারও অনুরূপ। অবশ্য সামাজিক ন্যায়বিচার নৈতিক বিচার প্রসঙ্গে ব্যক্তি পূর্ণতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইসলাম বিশ্বাস করে ক্ষমতা এবং অভ্যন্তরীণ আবেগ-অনুভূতির প্রতি নমনীয় সম্মানবোধ বজায় রাখা, তবে তা আড়ম্বরতা প্রত্যাখ্যান করে। এক বুদ্ধিবৃত্তিক বা বিশ্বাসের শাসনকে ইসলাম যথেষ্ট রূপে অনুমোদন করে না। মানব শক্তির দার্শনিকতাকে ইসলামে দেখা হয় মানব শাসনের অনুপযুক্তরূপ দুর্বলতা হিসাবে। বিশ্বাসের সাথে দর্শনের সংযোগ হলে তা গভর্নর হিসাবে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। তবে ইসলামে 'প্রেম' প্রসঙ্গে নবীজীর হাদীস অপেক্ষা আর বেশি কী বলা যায়? দয়া ও পারস্পরিক সহনশীলতা প্রসঙ্গে আমাদের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পয়গাম্বর (সা.) তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিশ্বাসের কোন্ শাখাটি অধিকতর শক্তিশালী?' তাঁদের প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিলেন, কেউ বললেন, 'নামায', কেউ 'রোযা', কেউ বললেন, 'হজ্ব' ইত্যাদি। তিনি বললেন, 'তোমরা যা বলেছ তা সত্য, তবে এদের কোনোটি-ই সবচেয়ে শক্তিশালী নয়।' তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে সেটা কী?' তিনি জবাব দিলেন, 'আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় অন্যকে ভালোবাসা।'

ওপরের বিশ্বাসগুলোর কোন্টি গুরুত্ব বিবেচনায় প্রথম, আর কোন্গুলো এর পরিপূরক? ইবাদাত নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : 'আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে আমার ইবাদাত করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।'

কাজেই ইবাদাতকে উদ্দেশ্য হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যদিও কেউ কেউ এটা মানতে নারাজ। আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি সেসব মতবাদ যা বস্তুগত সুবিধাদি সমুন্নত করে এবং মানবের পূর্ণতা এবং পূর্ণ সত্তার অস্তিত্বও অস্বীকার করে। তাঁরা জ্ঞানসহ সব কিছুকে মানবজাতির জন্য কল্যাণকর বলে বিবেচনা করে থাকেন।

বেকনের সময় থেকে মানুষের চিন্তাধারা এমনই ছিল। আজ দাবি করা হয় সমাজ উন্নত হয়েছে, বিবর্তিত হয়েছে। তাহলে কোন্ সমাজ বেশি পূর্ণ? সে সমাজ যা বাস্তবতার কাছাকাছি না বিশ্বাসের? নাকি সে সমাজ যেখানে জ্ঞান, ন্যায়বিচার বা প্রেম আছে? তাঁরা বলেন : 'না, এটা সে সমাজ যা বেশি স্বার্থ নিশ্চিত করে, বেশি প্রযুক্তি, আরও বেশি বিজ্ঞানময় যার সবটাই মানবজাতিকে উন্নততর আরাম-আয়েশ এবং বস্তুগত স্বার্থ উপহার দেয়।' এই যে অধিকতর স্বার্থ যা তাঁরা দেখতে পান তা জীব-জন্তু ও বৃক্ষলতা যা ভোগ করে তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। এগুলো শারীরিক স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি, ক্ষুধা ও কামনা-বাসনা তৃপ্তিই নিশ্চিত করে মাত্র। কাজেই তাঁদের মতে জীবজন্তু ও বৃক্ষ-লতার পূর্ণতা ছাড়া আর কোনো মানবিক পূর্ণতা থাকতে পারে না। বিজ্ঞানও মানুষের তেমন যেমন একটি জন্তুর জন্য শিং যা অস্ত্র হিসাবে টিকে থাকার লড়াইয়ে ব্যবহৃত হয়।

আসুন এবার আমরা উপাসনার কথায় আসি। কেনো ইবাদাত করবো? দু'টি দৃষ্টিতে এটা দেখা যেতে পারে। সাধারণ মানুষের জন্য উপাসনা পরবর্তী জীবনে আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার উপায়। এ পৃথিবীর পুরস্কার সীমিত, তাই ইবাদাত এ জীবনের পর আরো গভীরতর এবং বৃহত্তর পরিসরে পুরস্কার পাবার আশা জাগ্রত করে। যেমন : হুর, বেহেশতী প্রাসাদ, মধু, সুস্বাদু ফল ও পানীয়। কিন্তু এটাও জীবের পূর্ণতার বাইরে কিছু নয় যদিও তা চিরকালের জন্য দেয়া হবে। ইবাদাতের অন্য অর্থও থাকতে পারে। যা দাসের ইবাদাত নয় যে পরকালে পুরস্কার লাভ করা যাবে। শারীরিক বা বস্তুগত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভও উদ্দেশ্য নয়। এটা প্রাণীর ক্ষুধা থেকে অনেক দূরের বিষয়। এ ইবাদাত প্রেমের, আবেগ-অনুভূতির, কৃতজ্ঞতার। তখনই ইবাদাতের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় যা সত্যের প্রেম-এর সমার্থক– সমমানের। স্রষ্টা আর তখন ইহকাল বা পরকালে জীবনের উপায় রূপে বিবেচিত হন না। স্রষ্টা-ই তখন নিজে সত্য এবং প্রকৃত লক্ষ্য রূপে উদ্ভাসিত

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হন। এ ধরনের ইবাদাত অনেক উন্নত স্থানে সমাসীন; কারণ, এটা মাধ্যম নয়, ঐ সত্তায় তার সমাপ্তি।

এভাবে ইবাদাতের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। পরকালে জীবের কামনা-বাসনা পূরণের জন্য ইবাদাত– যা ইবাদাতের অনুপস্থিতিতে তুলনামূলক এক প্রকার পূর্ণতা বোঝায় এবং তা বস্তু সাম্রাজ্যে এক প্রকার ইতিবাচক সহাবস্থান। করণ, এর অর্থ দাঁড়ায় স্রষ্টার কাছে চিরস্থায়ী কিছু একটা কামনা করা–এ জগতে স্বার্থপরতা ও কামনা-বাসনার পরিবর্তে। তবে এরকম ইবাদাত সত্যিকার ইবাদাতের তুলনায় অনেক নিম্ন মানের। কাজেই ইবাদাত বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল এবং বিশ্বাস নির্ভর করে সত্যের ওপর। ইসলাম মানবজাতিকে জ্ঞান, ন্যায়বিচার, প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতি আহ্বান জানায়। কিন্তু প্রধান লক্ষ্য কোন্‌টি? এর সবগুলোই কি সমান গুরুত্ববহ? নাকি এর একটি প্রধান উদ্দেশ্য এবং অন্যগুলো এর পরিপূরক?

আমরা মনে করি, লক্ষ্য হচ্ছে 'সত্য' (স্রষ্টা) আল্লাহ্। ইসলামী একেশ্বরবাদের কেবল এ অর্থই গ্রহণযোগ্য। যদি ইসলাম অন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করে, যেমন : বেহেশত-দোযখ থেকে পলায়ন, এগুলো দ্বিতীয় সারির গুরুত্ব বহন করে। জ্ঞান নিজে লক্ষ্য নয় তবে সত্যের অন্বেষণে সহায়ক। ন্যায়বিচার ও মানবাত্মার পশুত্ব দমনে এবং সত্যের পথে কৃত্রিম বাধা-বিপত্তি দূরীকরণে কল্যাণকর। প্রেমও সত্য অর্জনে সহায়তা করে। বিশ্বাস যা ইসলামের লক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস কি দুর্দশা দূরীকরণে, আগ্রাসন প্রতিরোধে এবং পারস্পরিক আস্থা স্থাপনে ভূমিকা পালনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ? স্রষ্টার বিশ্বাস নিজেই একটি লক্ষ্য। বিশ্বাসের প্রভাব, যা অসংখ্য মানুষকে স্রষ্টার সাথে সংযুক্ত করে, আর ইসলামের দৃষ্টিতে এ সংযোগ-ই হচ্ছে পূর্ণতা।

(তেহরান থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা Al-TAWHID, Vol. 17, No. 2, Spring 2003 সংখ্যা থেকে অনূদিত)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ভাবনায় মনুষ্যজীবন

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা*

॥ এক ॥

প্রাকৃতিক জীবন

ভাবনার কাজটা মানুষেরই। জন্মের পর তার মায়ের কোলের নির্ভাবনার সময় কালটা মোটেও প্রলম্বিত হয় না। ইতর প্রাণী শাবকের ন্যায় তাৎক্ষণিক না হলেও অচিরেই তাকে নিজের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে হয়। পারুক আর না পারুক তাকে সোজা হয়ে হাঁটতে হবে, মাড়ির মাংস ঠেলে দুধের দাঁত উঁকি দিতে না দিতেই শক্ত খাবার কাটতে হবে- আরও কতো ভাবনা। প্রথমে সরীসৃপের মতো বুকে ভর দিয়ে চলা, তারপর চতুষ্পদ প্রাণীর ন্যায় হামাগুড়ি, চেষ্টার এক পর্যায়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কদিন আগেও যার চারটি পা ছিল এবার সে হলো দ্বি-পদী। বাকি দুটি পা মুক্তি পেয়ে গেল, লাভ করলো হাতের গৌরব। যেন বেকার হয়ে পড়লো সামনের এ অঙ্গদু'টি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়[১] :

> 'মানুষের কল্পনাবৃত্তি এ সুযোগে হাতকে পেয়ে বসলো। দেহের জরুরি কাজগুলো সেরে দিয়েই সে লেগে গেল নানা বাজে কাজে। যেগুলোকে নিতান্ত শৈশবের দুষ্টুমির খেলা বলে উপেক্ষা করে সবাই। কিন্তু মনে তার ভাবনার অন্ত নেই। চতুষ্পদ প্রাণীর ন্যায় ন্যুব্জ হয়ে চললে তার ভাবনার বোঝাটা হয়তো হালকা হতো। কেননা, সেক্ষেত্রে শুধু তার তলবর্তী ভূমিদেশের চেয়ে বেশিদূর দৃষ্টি প্রসারিত হতে পারতো না। কিন্তু ঋজু হয়ে দাঁড়ানোর কারণে তার দৃষ্টি প্রসারিত হলো দূরের আকাশ পর্যন্ত। ফলে জীবন আর চারপাশের জগৎ সম্পর্কে তার কৌতূহল নাছোড়বান্দার মতো তাকে তাড়া করে ফেরে। আকাশটা কতদূর, পাতাল কত নিচে, সাগরের অতলে কি, মাটি ফুঁড়ে ওপাশ দিয়ে বের হওয়া যায় না কেনো- এসব সহস্র ভাবনার যে মানব শিশু, সেই হতে পারে মনুষ্য জীবন দর্শনের শুরু এবং শেষ। তার অনিবারণীয় কৌতূহল আর তার ক্রমে বেড়ে ওঠার মধ্যে অতিপ্রাকৃতিক সকল দর্শনের সূত্রমূল লুক্কায়িত রয়েছে। কিন্তু এতো কিছু

* লেখক : এম ফিল গবেষক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

> ভেবে ওঠার আগেই সে পদার্পণ করে যৌবনে। খেলা থেকে প্রস্থান করে কর্মক্ষেত্রে। এতদিনের পরনির্ভর জীবন থেকে ঢুকে পড়ে আত্মবিশ্বাসের মধ্যে। যদিও খানিকটা শৃঙ্খলার অভাব, কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক। কারণ, সদ্যই তো মুক্ত হলো স্বজনের স্নেহের বন্ধন আর সার্বক্ষণিক দৃষ্টির গণ্ডি থেকে। যৌবনের জীবনটা হলো বর্তমানের। এখানে তার নেই কোনো অতীতের আফসোস, তেমনি নেই কোনো ভবিষ্যতের শঙ্কা। সতেজতার সমস্ত অনুভব দিয়ে শুধু টিলা বেয়ে ওপরেই ওঠে, তাকে যে চূড়ায় আরোহণ করতেই হবে, স্বচক্ষে দেখতে হবে পাহাড়ের ওপাশের ঢালটা। বেশিরভাগ মানুষের মতে এই যৌবনের কালটাই হলো আসল জীবনের সময়। কখন জীবনকে আচ্ছন্ন করে তার জীবনে জেগে ওঠে প্রেমভক্তির কোমল অনুভূতি। যুবতী সহসাই শান্তপ্রকৃতি ধারণ করে, চিন্তায় মগ্ন হয়, যেন জীবনের ঢেউ তার মধ্যে সৃষ্টির অনুভূতি জাগায়। আর যুবক আসক্তিপূর্ণ এবং অশান্ত প্রকৃতির হয়ে ওঠে।'

উইল ডুরান্টের ভাষায় :

> 'যদি যৌবনের সাথে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সংযোগ থাকতো তাহলে প্রেমকে অন্য সবকিছুর চাইতে বেশি মর্যাদা দিত। প্রেমকে ধারণ করার নিমিত্ত দেহ ও মনকে পাক সাফ করে রাখতো। আর প্রেমময় দিনগুলোকে বাগদানের মাসগুলোর মাধ্যমে প্রলম্বিত করতো এবং রীতি-প্রথার আনুষ্ঠিকতাপূর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠানের দ্বারা এর নিশ্চয়তা বিধান করতো। যদি প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি যুবক হতো তাহলে প্রেমকে সম্মান জানাতো, নিষ্ঠার সাথে এর পরিপুষ্টি ঘটাতো, আত্মত্যাগের মাধ্যমে এর গভীরতা বৃদ্ধি করতো এবং সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে একে প্রাণবন্ত ও জীবন্ত করতো। আর সবকিছুকেই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুগামী করে তুলতো।'[২]

এরপর আসে মধ্যবয়স। বিবাহ সম্পন্নের মাধ্যমেই এর শুরু। কথায় বলে, মানুষ যখন বিবাহ করে, আগের দিনের চেয়ে পাঁচ বছর বেশি বয়সী হয়ে যায়। নারীও তা-ই। অর্থনীতির জগতে নিজের একটা জায়গা খুঁজে পাওয়ার সাথে সাথে যৌবনের উন্মত্ততা শিথিল হতে থাকে, যেন শক্ত মাটিতে পা গাড়ার পর আর ভূমিকম্প চায় না। জীবন চল্লিশ বছর ছুঁয়ে যায়। অধিকাংশ মানুষের এ বয়স কেবল স্মৃতি বৈ আর কিছু নয়। যেন অবশিষ্ট থেকে যাওয়া কিছু ছাইভস্ম যা একসময় ছিল লেলিহান অগ্নিশিখা। প্রাকৃতিক জীবনে সবচেয়ে দুঃখজনক কথাটি হলো এখানে, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা এমন সময় ঘাটে তরী ভিড়ায় যখন যৌবন প্রস্থান করে। মধ্যবয়স ধাতস্ত হতেই একজন মানুষ লক্ষ্য করে সূর্যটা তার একেবারে মাথার ওপরে, আর সে দাঁড়িয়ে আছে জীবনটিলার সর্বশীর্ষে। ওপরে আরোহণ করার আর জায়গা নেই। সামনে এবার শুরু হয়েছে ঢালু উপত্যকা। আচমকা দৃষ্টিতে ভেসে আসে খাদের গভীর থেকে মৃত্যুর হাতছানি। এতদিন মৃত্যুর সম্পর্কে যা কিছু তার কাছে কেবল তত্ত্বকথা মনে হয়েছে, এবার সে স্বচক্ষে তার রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারে। দুনিয়াটা তার সামনে আড়ষ্টতায় জড়াতে থাকে। জীবনের চলচ্চিত্র যেন একটি স্থির বিলবোর্ডের রূপ ধারণ করে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

প্রথমে বিশ্বাস না হলেও পরক্ষণেই লক্ষ্য করে যে, জীবনী শক্তি যেটা ক্ষয় হচ্ছে তা আর পূরণ হচ্ছে না। জীবনের পুঁজি থেকেই এখন খরচ করছে, লভ্যাংশ থেকে নয়। তাই শুরু হয় সতর্ক পথ চলা। কিছু অর্থপূর্ণ কাজ করার দিকে আগ্রহ বাড়ে তার। সযত্নে সন্তান লালনে মনোযোগী হয়। জীবনে ভারসাম্য আসতে থাকে। বার্ধক্য উঁকি দেয়। ফেলে আসা পেছনের দিকে আশাহত নেত্রে তাকিয়ে কষ্ট বাড়ে। যৌবনের স্বভাব নতুন ভাবনার প্রতি অতিশয় আগ্রহ। বার্ধক্যের স্বভাব নির্মমভাবে নতুনত্ব কামনার বিরোধিতা করা। আর মধ্যবয়সের কাজ নতুন ভাবনাকে ভারসাম্যপূর্ণ করা। যৌবন প্রস্তাব করে, বার্ধক্য নাকচ করে আর মধ্যবয়স তা পর্যালোচনা ও বিবেচনা করে। বার্ধক্যের ক্ষয় সর্বগ্রাসী হতে থাকে। জীবনের শেষে মৃত্যুর অমোঘ নিয়ম আর মৃত্যুর পরে মাটিতে মিশে যাওয়া। যদি জীবন আমাদেরকে ছেড়েই যাবে তাহলে তার আর প্রশংসা কেনো! আর যদি প্রশংসাই করি তাহলে এ আশায় যে, পুনর্বার আরো উত্তমরূপে এর দেখা পাব।

এ হলো মানুষের প্রাকৃতিক জীবনের স্বরূপ। এ প্রাকৃতিক জীবনের উৎপত্তিভাবনায় মোট তিনটি মতবাদের সন্ধান মেলে। যথা : ১. আকস্মিক সৃষ্টিবাদ, ২. ক্রমবিবর্তনবাদ এবং ৩. উদ্দেশ্যবাদ। আকস্মিক সৃষ্টিবাদ অনেক প্রাচীন মতবাদ। প্রাচ্যে যেমন পাশ্চাত্যেও তেমনি এর শিকড়ের সন্ধান মেলে। পারস্যের নওরোজ কালচার সম্পর্কে এক প্রবন্ধে জনৈক ইরানী গবেষক[৩] লিখেছেন :

> 'ফারভারদিন (সৌরবর্ষের প্রথম মাস) -এর প্রথম দিনটি সম্মানিত হওয়ার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা এদিনেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আর প্রজ্ঞাবান সাত নক্ষত্রকেও যা প্রাচীন মনীষীদের দৃষ্টিতে 'সাত আসমানী পিতা' নামে বিখ্যাত এ দিনেই সৃষ্টি করেছেন। উম্মাহাতে আরবাআ বা চার মূল উপাদানের (পানি, আগুন, মাটি ও বাতাস) এর ওপর ঐ সাত বাবার বা নক্ষত্রের প্রভাবে তিন সন্তান জন্ম নেয়। ওরা হচ্ছে জড়, বৃক্ষ, প্রাণীকুল। এদের সৃষ্টির মাধ্যমে জগতে জীবনের স্পন্দন জাগে। প্রথম মানব হযরত আদম (আ.)ও বসন্তের এ প্রথম দিনেই সৃষ্টি হন।'

আকস্মিক সৃষ্টিবাদের ধারণা বদলে দিয়ে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক নতুন বার্তা নিয়ে উনিশ শতকে আগমন ঘটে বিবর্তনবাদের। মানুষের দীর্ঘদিনের লালিত মত ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এ যেন এক বিরাট বিপ্লব। এ মতের প্রবক্তারা একের পর এক হাজির করেন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এবং ঘোষণা করেন : বিশ্বজগৎ ও জীবনকুলের আবির্ভাব কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। এখানকার সবকিছুই ক্রমবিকাশের ফল। এ গতিময় ধারায় নিয়ত অগ্রসর হচ্ছে জগৎ-জীবন-সমাজ তথা গোটা বিশ্বজগৎ। এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক : এই যে বিশাল বিবর্তন ক্রিয়া তার চালিকা শক্তি কি? এর মূলে কোনো অদৃশ্য ঐশ্বরিক শক্তির ভূমিকা আছে কি? উত্তরে কেউ কেউ বলেন, 'না'। বিবর্তনের পেছনে কোনো ঐশ্বরিক শক্তির পরিচালনা নেই। কোনো ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যও তাতে কার্যকর নয়। বিবর্তন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল অনেকটা যন্ত্রের মতো। সব ঘটনাই ঘটে চলেছে আপনা-আপনি। জড়, গতি ও শক্তির স্বাভাবিক নিয়মে। এ মতের নাম যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ। এর দুই শক্তিশালী প্রবক্তা হার্বার্ট স্পেনসার ও চার্লস ডারউইন। এই একই বিবর্তনবাদকে ভিন্ন আঙ্গিকে দেখেছেন উনিশ-বিশ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

শতকের অপর এক ব্রিটিশ দার্শনিক স্যামুয়েল আলেকজান্ডার। তাঁর মতবাদটির নাম 'উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ'। তিনি মূলত অনুপ্রাণিত তাঁরই সমসাময়িক বিবর্তনবাদী লয়েড মর্গান দ্বারা। এরা উভয়েই স্পেনসার, ডারউইন প্রমুখের যান্ত্রিক বিবর্তনের মূল ধারার বিরোধী। মর্গান সমগ্র বিবর্তন প্রক্রিয়াকে একটি পিরামিড হিসাবে কল্পনা করেছেন। এ পিরামিডের সর্বনিম্নে রয়েছে ভৌত ঘটনাবলী ও জড় পদার্থ। এর পরবর্তী পর্যায়ে ভৌত ঘটনাবলী এমনভাবে মিশ্রিত ও সমন্বিত হয় যে, সে সব থেকে উন্মেষ ঘটে প্রাণের। তার পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ে ঘটনাবলীর মধ্যে সূচিত হয় এক নতুন সম্বন্ধ। ফলে উদ্ভব ঘটে চেতনা বা মনের। আমরা যাকে মন (মনুষ্যজীবন) বলি, তা বিবর্তন পিরামিডের উচ্চতম শৃঙ্গস্বরূপ।

জড়বস্তু ও জড়জগতের বাস্তবতা অনস্বীকার্য। কিন্তু জড়, গতি ও পদার্থ শক্তির মধ্যেই জগতের সবকিছু সীমাবদ্ধ এবং জড়াতীত অতীন্দ্রিয় সত্তা বলে কিছু নেই– জড়বাদীদের এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া যায় না। জড় বস্তু পরমসত্তা নয়, বরং এ বস্তুজগতের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে পরমসত্তার ঐশ্বরিক ইচ্ছা। এ সমগ্র জগৎ এক সুদূরপ্রসারী ঐশ্বরিক ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'মহাবিশ্বের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল থেকে সৃষ্টি প্রবাহকে তার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই শ্রেণীর দার্শনিক মত উদ্দেশ্যবাদ নামে পরিচিত।[৪] উদ্দেশ্যবাদে সৃজনবাদ ও ক্রমবিবর্তন বা উন্মেষবাদের এক সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এ মতে, জাগতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়েই আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছেন এবং সৃষ্টি প্রবাহকে তাঁর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

কুরআন সমর্থিত দৃষ্টিভঙ্গি : আল্লামা তাবাতাবায়ী[৫] মানবের উৎপত্তিভাবনা সমাধানে যে কুরআন সমর্থিত আলোচনার অবতারণা করেছেন সেখানে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন যা উপরোল্লিখিত মতবাদগুলো থেকে আলাদা। প্রথমত তিনি মনুষ্যজীবনকে তিনটি পর্বে উপস্থাপন করেছেন। যথা : ১. দুনিয়া-পূর্ব মানুষ ২. দুনিয়ায় মানুষ এবং ৩. দুনিয়া-উত্তর মানুষ। এ মুহূর্তে তাঁর প্রথম পর্বের আলোচনাটি প্রাসঙ্গিক। কুরআনের এ তত্ত্বকথাকে তিনি 'খাল্‌ক ও আম্‌র' শিরোনাম দিয়েছেন। এ একই শিরোনামে আলোচনা করেছেন ড. মুহাম্মাদ ইকবাল লাহোরীও।[৬] 'খাল্‌ক' হলো সৃষ্টি (Creation) আর 'আমর' হলো নির্দেশ (Direction). এরশাদ হচ্ছে : 'জেনে রাখো, খাল্‌ক তাঁরই কাজ, আমরও তাঁরই কাজ'।[৭] এ কথার অর্থ হচ্ছে আত্মার (জীবনের) মৌলিক প্রকৃতি হলো নির্দেশাত্মক। কেননা, আত্মা আসছে আল্লাহর নির্দেশমূলক স্পৃহা থেকে।

আমর হলো যা (কুন) দ্বারা উৎপত্তি হয় চোখের পলকে। এরশাদ হচ্ছে : 'আমার আদেশ তো এক কথায় চোখের পলকের মতো।'[৮] আর খাল্‌ক হলো ক্রমিক। এরশাদ হচ্ছে :

> 'আমি তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্র হতে, তারপর রক্তপিণ্ড হতে, তারপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট অথবা অসম্পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড হতে। তোমাদের নিকট আমার শক্তির পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত করার জন্য আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে রেখে দেই, তারপর আমি তোমাদের শিশুরূপে বের করি, পরে তোমরা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটে এবং'...।[৯]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সুতরাং খাল্‌কের জগৎ ক্রমিক (বিবর্তনশীল) আর আমরের জগৎ আকস্মিক। মানুষের দৈহিক সত্তা ও তার অনুষঙ্গ দিকটি ক্রমিকভাবে গঠন লাভ করে ঠিকই; কিন্তু তার অপর দিকটি ক্রমিক নয়, আকস্মিক। এরশাদ হচ্ছে :

> 'যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উত্তমরূপে সৃজন করেছেন এবং মাটি হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে তার বংশ উৎপন্ন করেন। পরে তিনি ওকে সুঠাম করেছেন এবং তাঁর নিকট হতে ওতে জীবন সঞ্চার করেছেন'...।[১০]

এই শেষের ধাপটি আর ক্রমিক নয়, আকস্মিক। কারণ, তা খাল্‌ক নয়, বরং আমর-এর অন্তর্ভুক্ত। এরশাদ হচ্ছে :

> 'তোমাকে ওরা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো, রূহ আমার প্রতিপালকের আমর (তথা আদেশ ঘটিত)।'[১১]

সুতরাং, খাল্‌ক জগৎ আমর জগৎ থেকে উন্মেষিত। অর্থাৎ কুরআনের দৃষ্টিতে জীবন জড় থেকে উন্মেষিত নয়।

॥ দুই ॥

লক্ষ্যচ্যুত জীবন

মনুষ্যজীবনের দু'টি দিক : দৈহিক ও আত্মিক। একটি জৈবিক ও জাগতিক আর অন্যটি অজৈবিক, অজাগতিক। মানবজীবন সম্পর্কিত বিশারদরা এ দু'টি দিকের সমন্বয় সাধনের ভাবনায় বিভিন্ন পথে অগ্রসর হয়েছেন। এগুলোকে মোটামুটি ছয়টি মতবাদে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় :

১. বেখেয়ালী এবং ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতাহীন জীবন : এ প্রকারের জীবনে শুধু সেটুকুই প্রয়োজন হয় যতটুকু প্রাকৃতিক জীবনের জন্য দরকার। যথা : বংশ প্রজনন, ক্ষুন্নিবৃত্তিসহ প্রকৃতির নিয়ম-নিয়ামকের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলা। এ জীবনে মানুষ একটিবারও থমকে দাঁড়িয়ে তার জীবনের অর্থ খুঁজতে যায় না। আধ্যাত্মিক ভাবনা তো মোটেও না। যারা এ জীবনপন্থা বেছে নেয় তাদের নিজের থেকে আসলে কোনো স্বাধীনতাও নেই। কেবল প্রকৃতির জীবনধারার ক্ষণকালীন প্রবাহেই নির্দ্বিধায় আত্মসমর্পণ, তার বেশি কিছু নয়।

২. নিছক পৃথিবীর জন্যই পার্থিব জীবন : এ প্রকারের জীবনযাপনকারীরা কেবল দৈহিক ও পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত। নিজের জন্য বস্তুজগৎ সম্পর্কিত জীবনের বাইরে আর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কিছুরই প্রতি তারা মনোযোগ দেয় না। জগতের কিছু নিয়মের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল। প্রকৃতি ও তার ব্যাপারসমূহকে তারা রসিকতা বলে উড়িয়ে দেয় না। পার্থিব বস্তুগত জীবনই তাদেরকে সন্তুষ্ট করেছে। এর বাইরে জীবনের উৎকৃষ্ট অনুভূতিগুলো তাদেরকে আন্দোলিত করে না। বিশ্বজগতে তাদের আসল স্থানটি কী সে ব্যাপারে তারা ভাবে না। তাই জীবনের মৌলিক প্রশ্নগুলো অর্থাৎ কোথা থেকে এলাম, কোথায় যাব আর কোথায় বা আছি- এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাও করে না।

৩. আত্মার উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং পরকালের জন্য আধ্যাত্মিক জীবন : এ জীবনে ব্যক্তি আবার শুধুই নিজের জৈবিক ও প্রাকৃতিক চাহিদা এবং অনুভূতিগুলোকে অবদমন কাজে লিপ্ত। কিছু সংখ্যক সন্ন্যাসী আত্মার সূক্ষ্ম ও অজড় দিকগুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করাই জীবনের উৎকৃষ্ট ব্রত বলে মনে করেন। এরা স্বীয় আত্মার পরিপুষ্টির জন্য অন্যদের নিয়ে একবারও ভাবেন না। কেবলই নিজের আত্মার মুক্তির ভাবনায় বুঁদ হয়ে থাকেন।

৪. জীবনের পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় উপাদানের প্রতি মনোযোগী জীবন : এরা জীবনের পার্থিব ও বস্তুগত দিকের প্রতি যেমন যত্নবান, পারলৌকিক জীবনের ব্যাপারেও তদ্রূপ যত্নবান। এরা পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনকে একে অপরের ব্যাপারে উত্থাপন করে না, একটার সাথে আরেকটিকে মিশিয়ে ফেলে না। এরা জানে না যে, মনুষ্যজীবন একটি অখণ্ড প্রপঞ্চের নাম। যদিও তার বিভিন্ন দিক রয়েছে। এরা পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের অখণ্ডতা এবং অভিন্ন লক্ষ্য সম্পর্কে বেখবর।

৫. বস্তুগত জীবনের জন্য আধ্যাত্মিক ছদ্মবেশী আর পার্থিব জীবনের জন্য পারলৌকিক ছদ্মবেশী জীবন : এরা জীবনের অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করতে অপারগ, কপটাশ্রয়ী। এরা একটা বিষয়ে বেখেয়াল যে, কপটাচারের মাধ্যমে ক্ষণকালের জন্য কতিপয় সরল লোককে প্রতারিত করা যায়। কিন্তু অন্যদের প্রতারিত করার আগে আত্মপ্রতারণার শিকার তারা নিজেরাই। বাস্তবিকপক্ষে তাদের এ পথ আত্মহননের পথ। এদের বাহ্য ব্যক্তিত্ব আধ্যাত্মিকতা সম্বলিত কিন্তু অভ্যন্তরটা দুষ্ট।

৬. পারলৌকিক জীবনের পথে চালিত পার্থিব জীবন : এ জীবন ঐশীপুরুষদের লক্ষ্য। জীবনকে তাঁরা একটি উৎকৃষ্ট ও মর্যাদাপূর্ণ সারসত্য বিষয় হিসাবে পরিচিত করেছেন এবং এ পূর্ণতার পথে অগ্রসর হবার লক্ষ্যে একদিকে ইল্‌ম বা জ্ঞান এবং অপরদিকে আমল বা কর্মকে অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছেন। বস্তুজীবনে জাগতিক কর্মাদি সাধনেই মানুষের পূর্ণতা আসে। যদিও এসব কর্মের বস্তুরূপ চোখে পড়ে বেশি, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য পরকালকে ছুঁয়ে যেতে পারে। জীবনের এই যে রূপ, যার অভ্যন্তর দিকটা পারলৌকিক ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ আর বাহ্যরূপটা জাগতিক ও পার্থিব- এ জীবন কখনোই মানুষকে নিশ্চল ও নিষ্ফল করে না। জীবনের শত বাধা ও তিক্ততা সত্ত্বেও এখানে জীবন স্বচ্ছ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়।[১২]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মূল আলোচনায় ফিরে যাই। খুব বেশি অতীতের দিকে না তাকিয়ে একবার বর্তমান মনুষ্যজীবনকে নিয়ে ভেবে দেখি। বর্তমান বিশ্বে ক্রমবিকাশবাদ মানবজীবনে আশা ও উদ্যম আনার পরিবর্তে এনেছে হতাশা আর উদ্বেগ। কেননা, আধুনিক বিবর্তনবাদীরা অকারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, মানুষের বর্তমান শারীরিক ও মানসিক গঠনই জৈব বিকাশের চরম ফল এবং মৃত্যুতেই শেষ। তারপর আর কিছু নেই। মানুষ পছন্দ করে প্রশংসা আর পূর্ব পুরুষদের গৌরবকথা। পূর্বপুরুষদের নিন্দা শুনতেও তার অনাগ্রহ। অথচ বিবর্তনবাদ অবলীলায় জানিয়ে দিল– মানুষ! তোমার পূর্ব পুরুষ ছিল বানর।[১৩] যে বানরকে দিয়ে মানুষ মানুষকে গালি দেয় সেই বানরই হলো তার অতীত পরিচয়। ফলে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়ার প্রথম বীজ বোনা হলো তার মনে। ড. ইকবাল লাহোরী তাই বলেন :

> 'বিবর্তনবাদ ইউরোপে আরো সুসংবদ্ধ হয়ে এ বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে যে, মানুষের এতো সমৃদ্ধ জীবন, মৃত্যুর সঙ্গেই এর শেষ। আধুনিক মানুষের নৈরাশ্য এমনিভাবে বৈজ্ঞানিক কথার মারপ্যাঁচের ভেতর লুকিয়ে আছে। নীটশে অবশ্য বলেছেন যে, বিবর্তনবাদ মানুষের পরজীবনকে অসম্ভব মনে করে না। কিন্তু তাঁর একথাও নৈরাশ্যবাদেরই নামান্তর। কারণ, মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতিআগ্রহেও এর বেশি বলতে পারেননি যে, মানুষ অনন্তকাল পর্যন্ত পুনর্জন্ম গ্রহণ করবে। এ চিরন্তন পৌনঃপুনিকতাবাদ হতাশার বাণী– সৃষ্টিধর্মের অমরত্বের বাণী নয়।'[১৪]

আধুনিক মানুষ তার বুদ্ধির আবিষ্কার ও উপলব্ধির দ্বারা এতদূর সমাচ্ছান্ন হয়ে পড়েছে যে, আধ্যাত্মিকতার আবেদন তার জীবনে নেই বললেই চলে। নিজ অন্তরের সাথেই তার যোগ নেই। চিন্তা জগতে যেমন তার নিজের সাথে দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক জীবনেও তেমনি অপরের সাথে দ্বন্দ্ব। আত্মসর্বস্বতা, অফুরন্ত ঐশ্বর্যপিপাসা তাকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে, অপরপক্ষে তার লাভ হয়েছে জীবনব্যাপী অবসাদ। উইলিয়াম জেমস আজকের জীবন সভ্যতার চেহারা এঁকেছেন এভাবে :

> 'আধুনিক বিশ্বের দৃষ্টিতে দুনিয়া হলো পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত যৌগ বিশেষ যেগুলো কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়াই একত্রে মিশে কিছু একটা গঠন করে। অতঃপর কোনো অভীষ্ট লক্ষ্য ছাড়াই আবার একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং গঠনকৃত জিনিসের বিনাশ ঘটায়। তার কার্যকলাপের ধরনে এমন কোনো কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না যে, মানুষের প্রতি তার বিন্দুমাত্র সহমর্মিতা বা প্রীতি রয়েছে।'[১৫]

এখানে একটা কথা অবশ্য অনেকে তুলে ধরতে চান।[১৬] সেটা হলো এ জীবন নিয়েই মানুষের সন্তুষ্টিবোধ। যখন সবাই এ যান্ত্রিক সভ্যতার সুখের জীবন নিয়ে মজা পাচ্ছে, সবাই রাজি এবং খুশি, তাহলে কী দরকার তাদের সামনে জীবনের তত্ত্ব-দর্শনের ভাবনা তুলে তাদের এ জীবনে ব্যাঘাত ঘটানোর? তারা তাদের আত্মিক বা আধ্যাত্মিক দিকটা ভুলেও যদি স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করতে পারে তাহলে ক্ষতি কি? উত্তরে মাওলানা রুমীর উপমাটাই সবচেয়ে আগে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

উল্লেখ করতে হয়। রুমী তাঁর মাসনভীতে লক্ষ্যচ্যুত জীবন নিয়ে যারা বেখেয়ালে বয়স কাটিয়ে দেয় তাদেরকে বলেছেন, এদের হাতে রয়েছে একটি মহামূল্য দিকনির্দেশক পুস্তক। আর এরা জানে যে, এটা বালিশ নয়, কিন্তু বই কী জিনিস বোঝে না বলে একবারও সেটা না খুলে বরং মাথার নিচে রেখে আরামে নিদ্রা যাচ্ছে। তারপর হাই তুলে বলছে কী সুখনিদ্রাই না দিলাম! তাহলে এদের কাছে জীবন-বইয়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার বলতে সুখনিদ্রাই বুঝায়। কেউ বা আবার বলেন, এ জীবনটাই তাদের কাছে এমন সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এর বাইরে কিছু বলা মানে পাগল আখ্যা পাওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না। কী দরকার তার?

কিন্তু এটাও কোনো ভাবুক মানুষের কথা হলো না। এটা ঠিক যে, মানুষের মধ্যে যে অসামান্য উপযোগিতা ও শক্তিশালী জীবনক্ষমতা নিহিত তা দ্বারা সে যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে অভিযোজিত করে নিতে সক্ষম। সে যেমন গোটা জীবনটা ভোগের মধ্যে বুঁদ হয়ে পার করতে পারে, আদৌ উপলব্ধি করবে না যে, দুনিয়ার ভাল কী আর মন্দ কী, বৈধতা কী আর অবৈধতাই বা কী? সে এটা পারে। কারণ, স্রষ্টার সূক্ষ্ম প্রজ্ঞায় মানুষের জীবনীশক্তিতে সে ক্ষমতা রয়েছে। এমনকি কৃত্রিম ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সে নিজেকে চলনসই করে ফেলে। কিন্তু তখন সে আর মানুষ থাকে না। ইতিহাসে আমরা এমন অনেকের সাক্ষাৎ পাই যারা সহস্রাধিক বরং লক্ষাধিক মানুষের রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। তারপর এমনকি কাক-শকুনও যাতে ভাগ বসাতে না পারে তার আগেই সেগুলো টুকরো টুকরো করে আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দিয়েছে। অথচ মানুষ তো এমনটা নাও হতে পারে। একজন মানুষের মৃত্যুতেই সে ক্রন্দন ও আহাজারি করতে পারতো লক্ষ মানুষকে নিধন করার পরিবর্তে। তাই আমরা মানুষের এ অবৈধ কৃত্রিম জীবন গড়ে তোলার অদ্ভুত শক্তিকে অস্বীকার করি না। হোক না সেকারণে তারা আমাদেরকেই পাগল বলে উপহাস করুক। যেসময়ে দাসপ্রথা চালু ছিল তখনও তো মানুষ এহেন নিকৃষ্ট জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল। সে সময়েও যদি কেউ বলতে চাইতো দাসপ্রথা আবার কি? দাসপ্রথা বৈধ হলো কিভাবে? মানুষ কি মায়ের পেট থেকে দাস হয়ে আসে নাকি? তাহলে সেসময়েও হয়তো নির্ঘাত সকলে বিদ্রূপ করেই বলতো- কোত্থেকে জুটলো এ পাগলটা?! আবার কেউ বা আরেকটু দয়াপরবশ হয়ে আপনাকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তির সুপরামর্শ দিত। কেননা, তাদের বিশ্বাস, কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ একথা বলতে পারে না। অথচ আজ আমরা নির্দ্বিধায় ঘোষণা করছি যে, দাসত্বের যুগে মানুষ নিতান্তই অমানবিক জীবনযাপন করেছে।

তদ্রূপ আজ আধুনিক শিল্প-সভ্যতার যাঁতাকলে পিষ্ট জীবন যে কতটা অমানবিক এবং মনুষ্য জীবনের লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়েছে, সেটা বুঁদ হয়ে থাকা মানুষের পক্ষে উপলব্ধি করা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। আলেক্সিস কার্ল বলেন :

> 'এ আধুনিক সভ্যতা এবং এ নিত্য-নৈমিত্তিক শিল্প উদ্ভাবন আমাদের জীবনের প্রকৃতির সাথে এবং আমাদের শারীরিক অবকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এ কারণেই প্রতিদিন এবং প্রতিবছর রোগ-ব্যাধি ও জীবনের ঝুঁকির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। অথচ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

> আমরা যারা নিজেদেরকে আধুনিক সভ্যতার স্রষ্টা বলে গণ্য করি, তারা এ থেকে উত্তরণ বা উপশমের পথ বের করতে পারছি না।'[১৭]

কাজেই জীবনটাকে মানুষের সন্তুষ্টির মাপকাঠি দ্বারা পরিমাপ করা ঠিক হবে না। মানুষ সভ্যতার নামে যে পথে অগ্রসর হয়েছে যদি তা থেকে একটিবারও থমকে দাঁড়ায় তাহলে তার চোখে এমনসব বাস্তবতা ধরা পড়বে যা জীবনের গতি বদলে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। তাই বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন :

> 'We shall have to consider why men have hitherto used their intelligence to make a world that only a few could enjoy and that to most involved a life much more miserable than that of wild animals?'[১৮]

মানুষের এ অবস্থা ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছে? কি হলো যে মানুষ এতোটা আত্মভোলা ভোগবাদের সাগরে ডুব দিল? কিভাবে তারা আত্মমর্যাদা বিস্মৃত হয়ে যন্ত্রকে নিজের কাঁধে চেপে বসার সুযোগ দিল আর সেই যন্ত্রের বেসামাল গতিবেগের সামনে নিজেকে অসহায় অনিয়ন্ত্রিত করে সঁপে দিল? যদি সিদ্ধান্ত হয় আগামীকালই মানুষের জীবন থেকে সভ্যতার এ সমস্ত মোহনীয় আবেশ অপসারণ করা হবে এবং তাকে শুধু জীবনটাকে হাতে নিয়ে পথ চলতে হবে- সে কি তা পারবে? কিন্তু এটাই এখন দরকার। জীবনের সবটুকুই যদি সম্পদের পাহাড়ে চাপা দিলাম তাহলে মানবতা, ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, মমতা, দয়া, ক্ষমা, আত্মত্যাগ, বদান্যতা, উদারতা, দানশীলতা, পরার্থপরতা, পরোপকার, সদাচার, বিনয়, সৌজন্য, শিষ্টাচার, সততা, সতীত্ব, সহযোগিতা, সমবেদনা, সান্ত্বনা, সহমর্মিতা ইত্যাদি হাজারো সদগুণের জায়গাটা কোথায়?

আলেক্সিস কার্ল বলেন :

> 'যদি সত্য কথাটা বলতে চাই তাহলে এই কৃত্রিম মানুষ যা আধুনিক সভ্যতার হাতে নির্মিত হয়েছে, তা আসলে পুরোপুরি সেসব সুরম্য রাজপ্রাসাদের সাথেই তুলনীয় যা আর্ট পেপারের ওপর অংকন করা হয়েছে। আর তার চেয়েও বেশি কৃত্রিম মানুষ হলো সে, যে মার্কস ও লেনিনের উদ্ভ্রান্ত ও কবিয়াল কাল্পনিক তত্ত্বকথার ওপর ভিত্তি করে দুনিয়ায় ভবিষ্যৎ সমাজ গড়ে তুলতে চায়।'

মহাসমারোহের এই যে জৌলুসময় বিশ্ব- পদার্থবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং অজস্র বস্তুবাদী বিজ্ঞানীর চিন্তার ফসল হিসাবে নির্মাণ করা হয়েছে তা ঝলমলে বটে, কিন্তু তিমিরাশ্রয়ী এবং সারসত্যশূন্য। বাহ্যিক সৌন্দর্যপূর্ণ হয়েও মানুষের জীবনের জন্য তা খুবই সংকীর্ণ, শ্বাসরুদ্ধকর এবং শ্রান্তিকর হয়ে উঠেছে। নিজের জীবন উদ্ধারে এখন সময় এসেছে ছিড়েকুটে হলেও বস্তুজগৎ থেকে নিজেকে মুক্ত করার। সবকিছুকে তার বাইরে দাঁড়িয়ে অভ্যন্তরকে বিচার করার পরিবর্তে জীবনের ব্যাপারগুলোকে সত্যের দৃষ্টি থেকে বিচার করার অভ্যাস চাই। এর জন্য কোনো সুশৃঙ্খল

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কর্মপরিকল্পনার অপেক্ষায় থাকার দরকার নেই; বরং যত কষ্টের বিনিময়েই হোক না কেন বস্তুজগৎ থেকে বের হতেই হবে। একটা কথা সবাইকে বলতে চাই : পূর্ণাত্মায় পরিণত মনুষ্যজীবনের জন্য জীবনোপকরণের প্রাচুর্য থাকা আবশ্যক নয়- এটা মহাপুরুষগণের জীবন থেকে সহজেই প্রমাণযোগ্য। মানুষ দিনে ২৪ ঘণ্টা নয় যদি একটা ঘণ্টাও ভাবে, আমি কোত্থেকে এলাম, এখানেই বা কেন আর শেষ পরিণতি কী?- তাহলে তখনও কি বস্তু জাগতিক জীবন নিয়েই সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে? কেন তবে সে ভাবনা মানুষকে আন্দোলিত করে না? নাকি আধুনিক সভ্যতার স্রষ্টাদের কারসাজিই হলো ভোগের সুখে মানুষকে বুঁদ করে রাখা যাতে জীবন নিয়ে ভাবনার অবকাশটুকুও না মেলে। আর এভাবেই চরিতার্থ হবে তাদের কায়েমী স্বার্থ। ঠিক এ বিপদের সংকেতই বেজে উঠেছিল ১৯৮৯ সালের ভ্যানকুভার ঘোষণায়। সেদিনের বিবৃতিতে বলা হয় : 'মানুষ কি সক্ষম হবে একবিংশ শতাব্দীতে তার জীবন অব্যাহত রাখতে?'[১৯]

বলা বাহুল্য, এহেন ঘোষণার অর্থ হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দিকটা, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অগ্রসর হলে একপর্যায়ে সংঘবদ্ধভাবে আত্মহণনের পথ বেছে নেয়া ছাড়া গতি থাকবে না। তাই এ ঘোষণায় রাষ্ট্রসমূহের পণ্ডিতবর্গের কাছে জোরালো আহ্বান জানানো হয় যে, ঘটনা বেশিদূর গড়ানোর আগেই যেন এ বিষয়ে ভেবে দেখা হয়। ভোগসর্বস্ব বস্তুজীবন মনুষ্য প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটানোর আগেই যেন মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনকে তার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

॥ তিন ॥

পরিণত জীবন

মনুষ্যজীবন কি এক প্রস্তর খণ্ডসম যা কালের ক্ষয়িষ্ণু ধারায় ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে একসময় পর্বতশীর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অধঃগতির নিয়মে উপত্যকায় আছড়ে পড়ে। অতঃপর দু'একবার গড়িয়ে চলার পর সমতলে এসে নিশ্চল হয়ে যায়। আর এতেই সবকিছু শেষ। ইংরেজি শব্দ is এর ওপর হাত রাখুন তো। এটি যদি পূর্বাপর কোনো শব্দের সাথে যুক্ত না থাকে তাহলে কি এর অর্থ হতে পারে? is নিজেও কি জানে এখানে কেন সে? কোন্ উদ্দেশ্য ও বিধেয় এর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য তার উপস্থিতি? এভাবে অনেক জিনিস রয়েছে যেগুলো পূর্বাপর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে একাকী কোনো অর্থ দেয় না। একটি অবান্তর ও নিষ্ফল জিনিসে পরিণত হয়। মনুষ্যজীবনও একটি নিষ্ফল জন্মের নাম হবে যদি তাকে আগে ও পরের সাথে সংযুক্ত না করে বিচ্ছিন্নরূপে দেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ Man is Mortal বাক্যের মাঝে অবস্থান গ্রহণের ফলে এখন is যেমন অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তদ্রূপ মনুষ্যজীবনও অর্থপূর্ণ হবে যদি পার্থিব জীবনকে এর পূর্বাপর জীবনের সাথে সংযুক্ত করে দেখা হয় (অর্থাৎ পৃথিবীপূর্ব জীবন– পার্থিব জীবন– পারলৌকিক জীবন)। এখানে জীবনের ধারা চলমান।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মৃত্যুতে শেষ নয়। ড. বাহোনার-[২০] এর ভাষায় : পার্থিব জীবনটার সাথে অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে মাতৃগর্ভের জীবনের। একটা সংকীর্ণ জায়গার মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার অবস্থান। তাকে সেখান থেকে প্রস্থান করতেই হবে। এ সময়কালে তার ফুরসত শুধু নিজেকে এমন উপযোগী করে তোলার যেন পরবর্তী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ জগতে যখন সে পদার্পণ করবে সেখানকার সমুদয় সামর্থ্য ও শক্তি তার মধ্যে অর্জিত হয়ে থাকে। ঠিক একই কথা পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের বেলায়ও প্রযোজ্য। যে পারলৌকিক জীবনের সংবাদ ঐশীপুরুষগণ প্রদান করেছেন তার বিস্তৃতি ও প্রসারতা পার্থিব জগতের তুলনায় এতই অতুলনীয় যতটা না মাতৃগর্ভের সাথে এ জগতের তুলনা করা যায়। এখন যদি পারলৌকিক জীবনের কথা শুনে কেউ ভ্রূ-কুঁচকায় তাহলে এর অর্থ হলো মাতৃগর্ভের সন্তান যেন পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হওয়ার কথা শুনে ভ্রূ-কুঁচকালো। কিন্তু তার ভ্রূ-কুঁচকানোতে পৃথিবীতে আসা আটকে থাকেনি। পৃথিবীর একজন মানুষকে যখন বলা হয় : এটা তোমার থাকার জায়গা নয়, তোমাকে প্রস্থান করতেই হবে, তোমার গন্তব্য সেখানেই- তখন যদি সে ভ্রূ-কুঁচকায় এতে কিন্তু তার প্রস্থান রহিত হবে না। 'বলুন, নিশ্চয় মৃত্যু যা থেকে তোমরা পলায়ন করো অনিবার্যই তা তোমাদেরকে সাক্ষাৎ করবে। অতঃপর তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নিকট এবং তোমাদের দেয়া হবে যা তোমরা করতে।[২১] অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে : 'পরকালের বিপরীতে পার্থিব জীবনোপকরণ তুচ্ছ বৈ কিছু নয়।'[২২]

পবিত্র কুরআনে জীবনের আলোচনা তিন পর্বে উল্লিখিত হয়েছে। জীবনের সাথে কোনো বিশেষণ যুক্ত না করে এক প্রকারের জীবনের কথা রয়েছে। আর জীবনের সাথে 'পার্থিব' বিশেষণ যুক্ত করে 'হায়াতুদ্দুনিয়া' তথা 'পার্থিব জীবন' বলে আরেক প্রকারের জীবনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম প্রকারের জীবন সম্পর্কে কুরআনে মোট চারটি আয়াত এসেছে।[২৩] আর পার্থিব জীবন সম্পর্কে মোট আয়াত সংখ্যা ৬৯। তন্মধ্যে একটি আয়াতে পার্থিব জীবনের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে এভাবে :

> 'পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বৃষ্টির ন্যায় যা আমি আকাশ হতে বর্ষণ করি এবং যা দিয়ে ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়, যা হতে মানুষ ও জীবজন্তু আহার করে থাকে। অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারীরা মনে করে তা তাদের অধীন, তখন দিনে অথবা রাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে ও আমি তা এমনভাবে নির্মূল করে দেই, যেন ইতোপূর্বে তার অস্তিত্বই ছিল না। এভাবে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করি।'[২৪]

আর পরিশেষে আরেক ধরনের জীবনের বর্ণনা এসেছে সূরা আনকাবুত এর ৬৪ নং আয়াতে। এরশাদ হচ্ছে : 'নিশ্চয় পরকালই জীবন'। এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, পার্থিব জীবনের সাথে পারলৌকিক জগতের তুলনা করলে পৃথিবীর জীবনোপকরণ থেকে নিয়ে এখানকার সবকিছুই মনে হবে মরীচিকাময়। এখানকার সহায়-সম্পত্তি নিজের হয়েও নিজের না, এখানে এক বিষয়ে মনোনিবেশ করলে অন্যদিকে খেয়াল থাকে না। মনে হয় চিরকালই আছি কিন্তু মুহূর্তেই সবকিছু বিলীন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত জীবন। কারণ, সেখানে চিরন্তনতার মধ্যে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কোনো বিলোপ নেই, সেখানকার সুখানুভূতির মধ্যে কোনো দুঃখ-বেদনার সংশ্রব নেই, সত্যিকার জীবন যার পেছনে কোনো মৃত্যু নেই।[২৫] এভাবে জীবন পরিণত ও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ জীবন তখন অর্থ খুঁজে পায়, লক্ষ্যপানে ছুটে চলে। এ ধরনের জীবনের কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে। যথা : এখানে জীবনের মূল্য জানা থাকে, কখনই শূন্যতাবোধ এসে জীবনকে গ্লানিতে ভরে তুলতে পারে না। বিশ্বজগতে নিজের স্থান স্বচ্ছভাবে অবগত থাকে বলে জীবনের উদ্দীপনায় প্রতিশ্রুতিশীলতার কোনো কমতি থাকে না। নিজ সত্তার প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল, অপরের প্রতিও তদ্রূপ। কেননা, সবাই তো একই পথের যাত্রী। এ জীবন সার্বক্ষণিক ঐশ্বরিক কৃপার কাছে কৃতজ্ঞ। আত্মবন্দনার কোনো উপাদানই নিজের মধ্যে খুঁজে পায় না। ফলে বিনয়ী হয়। এখানে জীবনের লক্ষ্যের সাথে উপকরণের একটি যৌক্তিক সামঞ্জস্য রক্ষা করে। অর্থাৎ যেকোনো উপকরণকেই গ্রহণ করে না। যা লক্ষ্য পথে সহায়ক হবে শুধু সেগুলোই আঁকড়ে ধরে। পার্থিব অনেক কিছুই যে তারা বর্জন করে সেটা অযৌক্তিকভাবে নয়; বরং এই যুক্তির ভিত্তিতে। এ জীবন যেহেতু দেখে সময় সীমিত কিন্তু পথ অধিক, এ কারণে প্রচণ্ড করিৎকর্মা হয়। এখানে স্বাধীনতার বড়ই কার্যকারিতা। তাই যত শীঘ্র সম্ভব আত্মনিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নিতে হয় প্রবৃত্তির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এখানে জীবনই মূল কথা। বাদবাকি সব জীবনের ছায়া। বস্তুজগতকে তারা জীবনের ছায়া হিসাবেই দেখে, জীবন মনে করে ভুল করে না।

পরিণত জীবনেরও বেশ কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে। তবে সেগুলোকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রকৃতির মধ্যকার পরিণত জীবন আর অতিপ্রাকৃতিক পরিণত জীবন। প্রথম প্রকারের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের সমকালীন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, সমাজবিদ, দার্শনিক উইল ড্যুরান্ট-এর দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করা যায়। মানুষের আকাশে উড্ডয়নের প্রাচীন স্বপ্নটি তিন সহস্রাধিক কাল ধরে কীভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে লালিত হয়ে অবশেষে বাস্তবরূপ লাভ করে তার ইতিহাস তুলে ধরে তিনি মন্তব্য করেন :

> 'জীবন হলো সেই জিনিস যা তিন হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করে, কিন্তু মাথা নোয়ায় না। ব্যক্তি পরাস্ত হয় কিন্তু জীবন জয়ী হয়। ব্যক্তির মৃত্যু হয়, কিন্তু জীবন ক্লান্ত হয় না, নিরাশ হয় না, তার পথে এগিয়ে চলে। বিস্ময়ে অভিভূত হয়, আসক্তিতে ফেটে পড়ে, পরিকল্পনা তৈরি করে, নিরলস প্রয়াস চালায়, ঊর্ধ্বে আরোহণ করে এবং গন্তব্যে পৌঁছে যায়। তখন আবার কোনো বাসনা নিয়ে লিপ্ত হয় নতুনভাবে।'[২৬]

এ বক্তব্য হিন্দু ধর্মের জন্মান্তরবাদের নতুন ব্যাখ্যা কিনা বলা কঠিন। তবে জন্মান্তরবাদ একই আত্মার পুনরাবির্ভাবের ধারণা দেয়; আর এখানে প্রজন্ম ধারায় নতুন আত্মার পূর্ণতর হয়ে ওঠার কথা বলা হয়েছে। এতো গেল প্রাকৃতিক সীমানার মধ্যে পরিণত জীবনের সন্ধান। কিন্তু যে জীবন প্রকৃতিকে পেরিয়ে অতি প্রকৃতিতে সঞ্চরণশীল তার হদীস কোথায় মিলবে? মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী হয়তো সে উত্তরই দেওয়ার চেষ্টা করেছেন নিচের এ কবিতায় :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

'ভূ-গর্ভের গভীর প্রদেশে
খনি এবং পাথরের রাজ্যে কতকাল বিরাজ করেছি,
তারপর হেসেছি আমি ফুলের বিচিত্র রঙে;
কালের দুরন্ত-উদ্দাম প্রবাহের সাথে
অন্তরীক্ষে, মৃত্তিকায় এবং সমুদ্রে বিচরণ করে
নবতর জীবনে
গভীর জলে আমি সন্তরণ করেছি,
অসীম আকাশে আমি ডানা মেলেছি,
কঠিন মৃত্তিকায় আমি হামা টেনেছি, ছুটেছি;
আমার মর্মের সর্ব রহস্য কেন্দ্রীভূত হয়ে
দেখা দিল মানুষ রূপে ।
তারপর, আমার গন্তব্য-
মেঘমালার ঊর্ধ্বে, তারকারাজির সীমা পেরিয়ে,
যেখানে নেই পরিবর্তন, নেই মৃত্যু-
ফেরেশতার রূপে-তারপর আরও অসীমে
রাত্রি-দিবার সীমা পেরিয়ে
দৃশ্য-অদৃশ্যের সীমা পেরিয়ে
যেখানে যা আছে, অনন্ত কাল ধরে আছে
-একক-সম্পূর্ণ?'[২৭]...

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. TAGORE : The Religion of Man;

২. Will Durant : The pleasure of Philosophy;

৩. Dr. Mahmud Bashiri. Ex-Visiting Professor. Dhaka University;

৪. Sri Arvindo : The life Divine;

৫. Allamah Tabatabaee : (انسان از آغاز تا انجام) **)**

৬. Dr. Mohammad Iqbal Lahori : 'Reconstruction of Islamic Thought';

৭. আল কুরআন, সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ৫৪;

৮. আল কুরআন, সূরা কামার, আয়াত নং ৫০;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৯. আল কুরআন, সূরা হাজ, আয়াত নং ৫;

১০. আল কুরআন, সূরা সাজদাহ, আয়াত নং ৭-৮;

১১. আল কুরআন, সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত নং ৮৫;

১২. আল্লামা মোহাম্মদ তাকী জা'ফারীর-র কৃত জীবনের বিশ্লেষণ পর্ব থেকে নেয়া;

১৩. কারো কারো মতে, মানুষের উৎপত্তি বানর থেকে-এটা বিবর্তন তত্ত্বের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। ডারউইন কখনো একথা বলেননি। তাঁর অভিমত ছিল, মানুষ ও বানর উভয়েই প্রাগৈতিহাসিক জীবন থেকে বিবর্তিত হয়েছে। বানর কোনোভাবেই আমাদের পূর্বপুরুষ নয়। তার চেয়ে দূরসম্পর্কের আত্মীয় বলা যেতে পারে। (দৈনিক আমার দেশ, ৭ মে ২০১০ সংখ্যা, পৃ ১০, ক ৬)

১৪. Dr. Mohammad Iqbal Lahori : 'Reconstruction of Islamic Thought'

১৫. William James : 'The Varities of Religious Experiences' (New York)

১৬. Professor Mach from France

১৭. Alexis Karl : انســـــان موجـــــود ناشـــــــــناخته শিরোনামে ফারসি ভাষায় অনূদিত বইয়ের পৃ. ২৭৫;

১৮. Bertrand Russell : Human society in ethics and politics, P. 158;

১৯. The Vancouver Statement, 1989;

২০. Dr. Shahid Bahonar, Former Iranian Chief Minister & Scholar;

২১. আল-কুরআন, সূরা মুনাফিকুন, আয়াত নং ৮;

২২. আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা, আয়াত নং ৩৮;

২৩. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত নং ৯৬ ও ১৭৯, সূরা ত্বাহা, আয়াত নং ৯৭, সূরা ইসরা, আয়াত নং ৭৫;

২৪. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত নং ২৪;

২৫. তাফসীর আল-মীযান, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ২৩৭;

২৬. Will Durant : 'The Pleasure of Philosoph,' 469 (Persian Translation);

২৭. অনুবাদ : কামালউদ্দীন খান, এম.এস.সি. ('ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন' বই থেকে উদ্ধৃত)।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সুবিচার, ঐক্য ও নিরাপত্তার মধ্যে সম্পর্ক

সাইয়্যেদ আলী আব্বাস মূসাভী

অনুবাদ : নূর হোসেন মজিদী

আমরা এমন এক বিশ্বে বসবাস করছি যে বিশ্ব অনবরত সমতা, সুবিচার, সহনশীলতা, সত্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে কথা বলতে মোটেই ক্লান্ত হচ্ছে বলে মনে হয় না। বর্তমানে এ মূল্যবোধসমূহের যেভাবে ব্যাপক প্রচার হচ্ছে মানবজাতির ইতিহাসে ইতোপূর্বে কখনোই এগুলোর এত বেশি প্রচার হয়নি। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে আমাদের মনের ওপর প্রচার মাধ্যমের বিস্ময়কর প্রভাব। কিন্তু সেই সাথে ইতোপূর্বে কখনোই এ সমুন্নত মূল্যবোধগুলো এ যুগের মতো মানুষের আওতার বাইরে ছিলো না।

আজকের দিনে প্রত্যেকেই আন্তঃধর্মীয় সমঝোতার কথা বলছে এবং কেউই এর গুরুত্ব অস্বীকার করছে না। এ বিশ্ব টিকে থাকলে ভবিষ্যতেও কেউই এর গুরুত্ব অস্বীকার করবে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও– আধুনিক প্রযুক্তি ও গণযোগাযোগের ব্যাপক প্রচলনের ফলে আজকের বিশ্বকে যথার্থভাবেই একটি 'বিশ্বপল্লী' নামে অভিহিত করা হলেও, সর্বত্র পরিদৃষ্ট গোত্রীয় ও জাতিগত সংঘাত তাকে ছিন্নভিন্ন করছে। এর কারণ সম্ভবত এই যে, মানবজাতি বিশ্বায়নের ধারণার দিকে এগিয়ে চললেও কেউই বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে শান্তি, সমন্বয়, ভ্রাতৃত্ব ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্তঃধর্মীয় সমঝোতা সৃষ্টির জন্য কোনো বাস্তব ও কার্যকর পথ দেখাতে সক্ষম হয়নি।

মানবিক মূল্যবোধসমূহ অবাস্তব ও অধীন করার অনুপযোগী বলে মনে হবার কারণ এই যে, এ সবের কোনো জীবন্ত অনুকরণীয় আদর্শ (মডেল) বিদ্যমান নেই। এমন লোক নেই যার প্রাত্যহিক জীবন এ সব মূল্যবোধের সংশিষ্টতা ও বাস্তব মূল্যমান প্রদর্শন করছে এবং তারা যা প্রচার করে তারই চর্চা বা বাস্তব প্রদর্শনী করছে। বিশ্বে সব সময়ই এ ধরনের লোকের অভাব ছিলো। বিশ্ব সব সময়ই আকুলভাবে এ ধরনের লোক কামনা করেছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও কদাচিৎ হলেও যখনই এ ধরনের লোকের আবির্ভাব ঘটেছে তখন এ বিশ্ব তাঁদেরকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে।

এ পৃথিবীর বুকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এ ধরনেরই একজন বিরল ব্যক্তিত্ব জীবন যাপন করেছিলেন; তিনি হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)। তিনি ছিলেন রাসূলে আকরাম

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি। ইসলামের জন্য এবং সে সাথে রাসূলে আকরাম (সা.)-এর জন্য প্রতিকূল ও কঠিন সময়ে তিনি ছিলেন অবিচল ও দৃঢ়পদ। ওপরে যে সব মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সুবিচার ও আইনের শাসনের বিচ্যুতিহীন অনুসরণের কারণে তিনি ছিলেন সে সবের বাস্তব দৃষ্টান্ত। নির্যাতিতদের জন্য তাঁর আবেগময় উদ্বেগ, জ্ঞান, সত্য ও তাকওয়ার প্রতি তাঁর ভক্তিময় সম্মান, এমনকি ক্ষমতায় থাকাকালেও তাঁর অকপট বিনয় এবং প্রতিকূলতার মোকাবিলায় তাঁর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা তাঁকে একটি পরিপূর্ণ অনুসরণীয় আদর্শে পরিণত করেছে। এ হচ্ছে তাঁর অল্প কয়েকটি মাত্র বৈশিষ্ট্য যা দৃশ্যত আয়ত্তের অতীত মূল্যবোধসমূহকে শুধু তাঁর যুগের লোকদের জন্যই নয়, বরং আমাদের যুগের লোকদের জন্যও অত্যন্ত কাছে নিয়ে এসেছে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্য যে সব কঠিন যুদ্ধ সংঘটিত হয় তিনি ছিলেন সে সব যুদ্ধের অনেকগুলোরই বীর যোদ্ধা। পরবর্তীকালে তিনি একটি বিশাল রাজ্য শাসন করেন যা বিস্তৃত ছিলো পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকা থেকে উত্তরে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত এবং পূর্বে ভারত ও চীনের সীমান্ত পর্যন্ত। তিনি ছিলেন একজন দায়িত্বশীল পিতা, একজন প্রেমময় স্বামী, তাঁর সংস্পর্শে যারাই আসতো তাদের সকলের জন্যই একজন অমায়িক সহচর, একজন প্রাঞ্জলভাষী বক্তা, নির্ভীক যোদ্ধা এবং একজন সক্ষম ও সুদক্ষ শাসক। এভাবে তিনি তাঁর মধ্যে একদিকে একজন দরবেশ, একজন দার্শনিক ও একজন দীন প্রচারকের ব্যক্তিত্বের এবং অন্যদিকে একজন রাষ্ট্রনায়ক, একজন সেনাপতি ও একজন শাসকের ব্যক্তিত্বের সমাহার ঘটিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও এ সব কিছুর ঊর্ধ্বে তাঁর মধ্যে সবচেয়ে গভীর ও শক্তিশালী যে বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান ছিলো তা হলো তাঁর আল্লাহ্-ভীতি বা তাকওয়া এবং আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার সামনে তাঁর পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।

এ আলোচনার শুরুতে যেমন উল্লেখ করেছি, বর্তমান বিশ্বে আন্তঃধর্মীয় সমঝোতা সৃষ্টি একটি অপরিহার্য জরুরি প্রয়োজন। আর হযরত ইমাম আলী (আ.) হচ্ছেন সেসব ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম যাঁদের গুণাবলী সকল ধর্মের অনুসারীদের নিকট সমানভাবে সম্মানার্হ।

এখন থেকে এক হাজার তিনশ' বছরেরও আগে ইমাম আলী (আ.) কুরআন মজীদ ও রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর শিক্ষা অনুযায়ী বিশ্বের অধিবাসীদের কল্যাণের স্বার্থে সুবিচার, ঐক্য ও নিরাপত্তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাঁর দৃঢ় ও অবিচল ঈমানের কারণে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মমতা, ন্যায়বিচার ও সমবেদনাকে এবং সে সাথে শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত, মনীষী ও লেখকদের গুণাবলীকে তাঁর নিজের মধ্যে সমন্বিত করেন। তাই বিশ্ব যদি তাঁর এ সব মূল্যবান শিক্ষাকে অনুধাবন, অনুসরণ ও বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে মানব সমাজ এমন একটি স্তরে উপনীত হতে সক্ষম হবে যে স্তরে শান্তি, সুখ, ভ্রাতৃত্ব, স্থৈর্য, মিল ও সমন্বয় অবশ্যই স্থায়িত্ব লাভ করবে।

ইমাম আলী (আ.)-এর বাণীসমূহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধসমূহের ওপর গুরুত্ব আরোপ যা একজন মানুষকে উত্তম মানুষ হিসাবে জীবন যাপনের দিকে এগিয়ে দেয়। তাঁর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

শিক্ষায় পৃথিবীর বুকে মানুষের স্বল্পস্থায়ী অস্তিত্বের ওপর তথা এখানে যা কিছুর আগমন ঘটছে তার সব কিছুই একদিন এ পৃথিবীর বুক থেকে চলে যাবে–এ সত্যের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁর মতে, কোনো ব্যক্তি যদি অনৈতিক জীবন বেছে নেয় যা কমবেশি পশুর স্তরের জীবন, তাহলে সে শুধু নিজেকেই অধঃপতিত করে না, বরং সেই সাথে সে সমাজে ঐক্যের পরিবর্তে অব্যাহত উদ্বেগ, উত্তেজনা ও সংঘাত সৃষ্টি করে। সুতরাং এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যে ব্যক্তি বিশ্বস্ত তার সাথে নৈতিকভাবে স্বচ্ছ একটি জীবনের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে সে পার্থিব বিষয়াদিতে খুবই কর্মতৎপর হবে এবং সে সাথে একজন সৎ মানুষ হিসাবে, শুধু তার পরিবারের সাথেই নয়, বরং তার প্রতিবেশীদের সাথে এবং সে যাদের সংস্পর্শে আসে তাদের প্রতিও দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মাধ্যমে একটি নৈতিক দৃষ্টান্ত পেশ করবে। এ উপাদানগুলো নিঃসন্দেহে সমাজে ঐক্য সৃষ্টি করবে।

হযরত ইমাম আলীকে জানার জন্য সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে তাঁর খুতবাহ্, বক্তৃতা-ভাষণ, শিক্ষণীয় উক্তি ও চিঠিপত্র অধ্যয়ন করা যা তাঁর জীবনকাল থেকে শুরু করে পরবর্তী বহু বছর যাবৎ বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক সংকলিত হয়েছে এবং এখন থেকে এক হাজার বছরেরও বেশিকাল পূর্বে মহান মনীষী সাইয়্যেদ রাযী কর্তৃক সংকলিত অমর গ্রন্থ 'নাহ্জুল বালাগাহ্'র মাধ্যমে সংকলন কার্যের এ ধারাক্রম চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে।

'নাহ্জুল বালাগাহ্' কোনো কুঁড়েঘরের এক কোণে আশ্রয়গ্রহণকারী দরবেশের, কোনো মঠে বা আশ্রমে আশ্রয়গ্রহণকারী সন্ন্যাসীর অথবা কোনো সংসারত্যাগী নির্জনবাসী ব্যক্তির বাণী নয়। এ হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির বাণী, ভাষণ ও উক্তি যিনি দশ বছর বয়সকাল থেকে স্বৈরাচার, অসাম্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ইসলামের সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাই দেখা যায় যে, 'নাহ্জুল বালাগাহ্'র মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে কুরআন মজীদেরই মৌলিক লক্ষ্য। তা হচ্ছে, সুবিচার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মানবিক বৈশিষ্ট্যাবলীর পরিশুদ্ধি সাধন ও সক্রিয়করণ এবং তাদের সামাজিক দিকসমূহ, বিশেষ করে ঐক্য ও নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি-মানুষকে একটি খাঁটি, আদি, প্রগতিশীল, পরিপূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ জীবনদৃষ্টির অধিকারী করে তোলা।

নাহ্জুল বালাগায় হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর বক্তব্যসমূহ হচ্ছে ভালোবাসা, সমবেদনা, বন্ধুত্ব ও ঐক্যের বাণী যা প্রতিটি যুগের পরিবর্তনশীল জীবনধারার দাবি পূরণকারী চিরন্তন তাৎপর্য, অনন্ত কালীন বিরাটত্ব যা সর্বজনীন সত্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এখানে উদাহরণস্বরূপ ইমাম আলী (আ.)-এর একটি খুতবাহ্– নাহ্জুল্ বালাগায় সংকলিত ২৮ নং খুতবাহ্র অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেন :

> 'তোমরা এ পৃথিবীর বিশাল গৃহ নিয়ে কী করবে? তোমরা যদি এটাকে পরকালীন জগতে নিয়ে যেতে চাও তাহলে তোমাদেরকে এ গৃহের মেহমানদেরকে আপ্যায়ন করতে হবে, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সকল দায়িত্ব-কর্তব্য

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

যথাযথভাবে পালন করতে হবে। এভাবেই তোমরা এটাকে পরকালীন জগতে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।'

ইমাম আলী (আ.) কত চমৎকারভাবেই না সাধারণ মানুষ ও অভাবীদের এবং সম্পদশালী ও প্রাচুর্যের অধিকারী লোকদের মধ্যকার স্বাভাবিক ও সহজাত ভ্রাতৃত্বের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন!

'নাহ্জুল বালাগাহ্' হচ্ছে এমন একটি গ্রন্থ যাতে সারা বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে সংহতি, মিল ও সমন্বয় সৃষ্টির লক্ষ্যে উভয় ধরনের ঐক্যের ওপর অর্থাৎ ধর্মীয় ঐক্য ও মানবজাতির ঐক্য– উভয়ের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ, মানব জাতির মধ্যে যে মতপার্থক্য ও অনৈক্য দেখা যায় তা হচ্ছে একান্তই বাহ্যিক ও গৌণ এবং ঐক্য হচ্ছে মানুষের মৌলিক প্রকৃতির দাবি, আর সে সাথে তা মানবজাতির অন্তর্নিহিত সত্তার অংশ। তাই মানব জাতির ঐক্য তার মতপার্থক্য ও অনৈক্যের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, অনেক বেশি মূল্যবান। সুতরাং বুদ্ধিজীবিগণ ও আইনবিশারদগণের উচিৎ বিতর্কিত দিকগুলোকে পরিহার করা এবং যে সব দৃষ্টিকোণ ও মতামত ঐক্যের জন্য সহায়ক ও তার সাথে সমন্বয়ের অধিকারী সে সব কিছুকে সামনে নিয়ে আসা। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা রাব্বুল মুসলিমীন (মুসলমানদের পালনকর্তা) নন; বরং তিনি হচ্ছেন রাব্বুল 'আলামীন (সমগ্র বিশ্ববাসীর পালনকর্তা)। অর্থাৎ তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক। অন্য কথায়, তৎকালীন খ্রিস্টান অধ্যুষিত মিসরে তাঁর পক্ষ থেকে নিয়োজিত প্রাদেশিক শাসনকর্তা মালিক আশতারের প্রতি হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর দিকনির্দেশনার উল্লেখ অনুযায়ী, বিভিন্ন গোত্রীয়, জাতিগত ও ভাষাগত গোষ্ঠীতে বিভক্ত হওয়া এবং বিভিন্ন চিন্তা ও মতাদর্শ তাদেরকে বহুধা বিভক্ত করে ফেলা সত্ত্বেও সমগ্র মানবজাতি হচ্ছে একটি বিরাট ও সম্প্রসারিত অভিন্ন পরিবার।

খ্রিস্টান সমাজতত্ত্ববিদ জর্জ জোর্দাক্ হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর ওপর অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে 'দ্য ভয়েস্ অব্ হিউম্যান্ জাস্টিস্' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে তিনি নাহ্জুল্ বালাগায় সংকলিত হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর ন্যায়বিচার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত উক্তিসমূহকে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ঐক্যের ধারণার অনুধাবনের জন্য দিকনির্দেশক হিসাবে অভিহিত করেছেন।

নাহ্জুল্ বালাগায় সংকলিত মালিক আশতারের উদ্দেশে হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর লিখিত বিখ্যাত পত্র হচ্ছে সাধারণভাবে বিশ্বের জনগণের এবং বিশেষভাবে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যকার সমস্যাবলী সমাধানে সহায়ক একটি বিশ্বজনীন বাণী।

এ পত্রের লেখক হযরত ইমাম আলী (আ.) ছিলেন রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যে খোদায়ী বিধানের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী ও সে জ্ঞান অনুযায়ী শ্রেষ্ঠতম আমলকারী। এ পত্রকে যথার্থভাবেই ইসলামী নীতির পূর্ণ পরিকল্পনা নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ পত্রে যেমনভাবে বিবৃত হয়েছে, হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর শাসন-পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে এ উপসংহারে উপনীত হতে হয় যে, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিলো খোদায়ী

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বিধিবিধান কার্যকরকরণ ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিতকরণ বা লুণ্ঠনের মাধ্যমে ধনভাণ্ডার পূর্ণকরণ অথবা ন্যায় বা অন্যায় যে কোনোভাবে স্বীয় রাজ্যের রাজনৈতিক সীমান্তের সম্প্রসারণ তাঁর লক্ষ্য ছিলো না।

পার্থিব সরকারগুলো সাধারণত এমন সংবিধান গ্রহণ করে যা তাদের সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলের জন্য সহায়ক হয় এবং তারা তাদের লক্ষ্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী যে কোনো আইনকেই তথাকথিত সাংবিধানিক পন্থায় সংশোধন করে নেয়। কিন্তু ইমাম আলী যে সংবিধান অনুসরণ করেন তার প্রতিটি ধারাই মানবজাতির অভিন্ন স্বার্থের খেদমতকারী ও সমাজ সংস্থার হেফাযতকারীর ভূমিকা পালন করে। এর বাস্তবায়নে কোনোরূপ আত্মস্বার্থপরতার ছোঁয়া লাগতে পারে না। এর মূলনীতিসমূহের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আনুগত্যের দায়িত্ব পালন এবং ধর্ম ও সম্প্রদায়ের পার্থক্যের উর্ধ্বে, তেমনি বর্ণগত, শ্রেণীগত, ভাষাগত ও গোত্রীয় বাধা অতিক্রম করে নির্বিশেষে সকলের জন্য মানবাধিকারের সংরক্ষণ। এতে অসহায় ও দরিদ্রদের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং নিম্ন ও পতিত শ্রেণীর উদ্ধার করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে যা থেকে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা, শান্তি, ঐক্য এবং জনগণের নিরাপত্তা, উন্নতি ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণের পরিপূর্ণ পথনির্দেশনা নিহিত রয়েছে।

হযরত ইমাম আলী (আ.) মালিক আশতারের কাছে লিখিত এ পত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তাকে ধর্মীয় বিবেচনার উর্ধ্বে উঠে জনগণের পার্থিব কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানকারী পথনির্দেশের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। তিনি বলেন : 'সব মানুষই তোমার মতো–হয় আল্লাহ্র সৃষ্টি হিসাবে, নয়তো ধর্মীয় ভাই হিসেবে।' এ বিষয়ের ওপরে বিস্তারিত আলোকপাত করে হযরত ইমাম আলী (আ.) বলেন :

> 'আল্লাহ্র খাতিরে সুবিচার করো এবং লোকদের প্রতি সুবিচার করো, এমনকি তোমার নিজের, তোমার ঘনিষ্ঠ জনদের ও তোমার অধীন যাদেরকে তুমি ভালোবাসো তাদের বিরুদ্ধে হলেও। কারণ, তুমি তা না করলে তুমি হবে জালেম, আর কোনো ব্যক্তি যখন আল্লাহ্র সৃষ্টির ওপর জুলুম করে তখন আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর সৃষ্টির পক্ষ থেকে ঐ ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হয়ে যান। ... জুলুম অব্যাহত রাখার তুলনায় অধিকতর গুরুতর কিছু নেই যা আল্লাহ্র অনুগ্রহকে ফিরিয়ে দেয় বা তাঁর প্রতিশোধকে এগিয়ে নিয়ে আসে...।'[২]

এখানে সুস্পষ্ট যে, হযরত ইমাম আলী (আ.) সকল মানুষকে সমান গণ্য করেছেন, আর এটা এমন একটি গতিশীল উপাদান যা ঐক্যের পন্থা উপস্থাপন করে। এ বিষয়কে সুবিচারের সাথে শাসনকার্য পরিচালনাকারী সরকার গঠন এবং নিরাপত্তা ও সংহতি সৃষ্টির অনন্য ধারণা হিসাবে গণ্য করা চলে। বস্তুত সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ ধারণা হচ্ছে তা-ই যা সমগ্র জাতিকে এবং তার পরিণামে সমগ্র মানবজাতিকে লাভবান করে। কুরআন মজীদ স্বয়ং এই সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার সর্বোচ্চ প্রতীক। তাই কুরআন মজীদ চিন্তা-বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল মানুষকে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সম্বোধন করেছে। কারণ, এ প্রবন্ধের শুরুতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা রাব্বুল মুসলিমীন নন, বরং তিনি হচ্ছেন রাব্বুল 'আলামীন।

হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর মতে, একজন শাসক যদি ভাবাবেগের অনুসরণ করে তাহলে তার সুবিচার প্রতিষ্ঠা দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হবে। সুতরাং তার জন্য নিজের অন্তরকে ভাবাবেগ থেকে মুক্ত রাখাই উত্তম।

> 'অন্তরে ভাবাবেগ জাগ্রত হলে তখন (কোনোরূপ সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে) বিরত থাকা উচিত। কারণ, আল্লাহ্র অনুগ্রহ না হলে মানুষের অন্তঃকরণ তাকে পাপের দিকে নিয়ে যায়।... অতএব, তুমি তোমার ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণ করো এবং যা তোমার জন্য বৈধ নয় সে কাজ থেকে তোমার অন্তরকে বিরত রাখো। কারণ, অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করা মানে অন্তর যা পছন্দ করে ও যা অপছন্দ করে তাকে এ দুয়ের মাঝখানে ধরে রাখা।'[৩]

নাহ্জুল বালাগার বক্তব্যে আমরা ঐশী দৃষ্টিভঙ্গি ও পার্থিব সমস্যাবলীর বাস্তব সমাধান লাভ করি। তেমনি এতে আমরা সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঐক্য ও নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে নিবেদিত পথ খুঁজে পাই–যে লক্ষ্যে হযরত ইমাম আলী (আ.) তাঁর গভর্নরকে লোকদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সুবিচার অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেন :

> 'তোমার অন্তরকে তোমার অধীন জনগণের প্রতি ক্ষমা এবং তাদের প্রতি স্নেহশীলতা ও দয়ার্দ্রতায় অভ্যস্ত করে তোলো। তুমি তাদের ওপর লোভী হিংস্র পশুদের ন্যায় চড়াও হয়ো না যারা মনে করে যে, তাদেরকে খেয়ে ফেলাই যথেষ্ট। কারণ, তারা (তোমার অধীন জনগণ) দুই ধরনের : হয় তোমার দীনী ভাই, নয়তো সৃষ্টি হিসাবে তোমারই মতো। তারা বিচ্যুত হবে এবং ভুলের শিকার হবে। তারা ভুল কাজ করতে পারে, তা ইচ্ছা করেই হোক বা উদাসীনতার কারণেই হোক। অতএব, তুমি ঠিক সেভাবেই তাদের দিকে ক্ষমার হস্ত প্রসারিত করে দাও যেভাবে তুমি পছন্দ করো যে, আল্লাহ্ তোমার প্রতি ক্ষমা বিস্তার করে দিন। কারণ, তুমি তাদের ওপরে স্থান লাভ করেছো এবং তোমার দায়িত্বশীল অধিনায়ক (ইমাম আলী) তোমার ওপরে, আর যে (ইমাম আলী) তোমাকে নিয়োগ করেছে তার ওপরে আছেন আল্লাহ্। তিনি (আল্লাহ্) চেয়েছেন যে, তুমি তাদের বিষয়াদি পরিচালনা করবে এবং তিনি তাদের মাধ্যমে তোমাকে পরীক্ষা করছেন।'[৪]

ইমাম আলী (আ.) সমাজে সুবিচারের বাস্তব রূপায়নে তাঁর প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে বলেন :

> 'ক্ষমা করার কারণে অনুতপ্ত হয়ো না এবং শাস্তি দিতে পেরে গর্বিত হয়ো না। ক্রোধের সময় দ্রুত পদক্ষেপ নিও না যদি তোমার পক্ষে তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। এ কথা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

> বলো না যে, 'আমাকে কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে; অতএব, আমি যখন আদেশ দেবো তখন অবশ্যই তা পালিত হতে হবে।' কারণ, তা অন্তরে বিভ্রান্তি ও দীনে দুর্বলতা সৃষ্টি করে এবং তা ব্যক্তিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।'[৫]

হযরত ইমাম আলী (আ.) তাঁর গভর্নরকে উপদেশ দিতে গিয়ে পুনরায় বলেন :

> 'তোমার জন্য সর্বাধিক বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত তা-ই যা সর্বাধিক ন্যায়ানুগ, যা সর্বাধিক মাত্রায় সর্বজনীন সুবিচারপূর্ণ এবং তোমার অধীনদের পছন্দের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বাধিক বোধগম্য।'[৬]

হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর উপরিউক্ত বক্তব্যে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে সুবিচার বিস্তারের মর্মবাণী ও মানবিক আবেদন নিহিত রয়েছে তা অনুধাবন করা যে কারো পক্ষেই সম্ভব। সম্ভবত সকল পার্থিব শাসন ব্যবস্থায়ই পক্ষপাতিত্বের দোষ নিহিত রয়েছে। আলী (আ.) এ ধরনের শাসন ব্যবস্থার শাসকদেরকে জালেম এবং এ কারণে নৈতিকতার মূল্যবোধসমূহকে পদদলিতকারী ও ও মানবিকতার উদ্দেশ্যকে নস্যাৎকারী শোষক হিসাবে অভিহিত করেন। অবৈধ ও বেআইনী কার্যকলাপ এবং গোষ্ঠী বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্বের মাধ্যমে যেভাবে জুলুম করা হয় তিনি তার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কারণ, এ ধরনের পরিস্থিতিতে সুবিচার বিস্তারের ধারণা হারিয়ে যায়। কেবল সেই সব লোকই এ ধরনের জুলুমমূলক পদ্ধতি পরিহার করে চলেন যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করেন এবং তাঁরা সমাজকে সেই দিকে পরিচালিত করেন হযরত ইমাম আলী (আঃ) যে জন্য মালিক আশতারকে নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ তাঁরা সমাজকে সকলের, বিশেষ করে দরিদ্র ও বঞ্চিত লোকদের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যাভিসারী করে গড়ে তোলেন।

হযরত ইমাম আলী (আ.) বলেন :

> 'তোমার অধীনদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় লোকদের তুলনায় অন্য কেউই সুদিনে শাসকের ওপর বোঝা হয়ে থাকে না, দুর্দিনে সবচেয়ে কম সাহায্য করে না, সুবিধা ও অনুগ্রহ পাবার জন্য সবচেয়ে বেশি তোমার পিছনে লেগে থাকে না, অনুগ্রহ লাভের পর কম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, (আবেদনকৃত সুবিধা ও অনুগ্রহ প্রদানে) অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে যৌক্তিকতাকে কম পছন্দ করে না এবং জীবনের কঠোর বাস্তবতার মোকাবিলায় অধিকতর দুর্বল হয়ে পড়ে না। অন্যদিকে যারা মুসলমানদের ধর্মীয় শক্তির স্তম্ভ এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা স্বরূপ তারা হচ্ছে সাধারণ জনগণ। অতএব, তোমার উচিত তাদের দিকে বেশি মনোযোগী হওয়া ও তাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকা।'[৭]

হযরত ইমাম আলী (আ.) এখানে যে পথনির্দেশ দিয়েছেন এটাই হলো আজকের দিনে প্রয়োজনীয় প্রকৃত গণমুখী শাসন ব্যবস্থা। তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে জনগণের স্বার্থ রক্ষার্থে চেষ্টা-সাধনা চালানো ও তাদের দিকে মনোযোগী থাকার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং শাসক বা প্রশাসকদের পরামর্শদাতা বা উপদেষ্টাদের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী তুলে ধরেছেন–যা জনগণের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে। কারণ, তিনি জাতির সাধারণ জনগণকে ধর্মের স্তম্ভ, রাষ্ট্রের শক্তি ও শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা প্রাচীর বলে গণ্য করেছেন।

সুবিচারের যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হযরত ইমাম আলী (আ.) বলেন :

> 'জনগণের অন্তরে তোমার বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষের যে গিঁটগুলো রয়েছে তার প্রতিটি গিঁট খুলে ফেলো এবং তাদের সাথে যে কোনো ধরনের শত্রুতার সম্পর্ককে বিলুপ্ত করে দাও। তোমার কাছে যা সুস্পষ্ট নয় তা না জানার ভান করো। গীবতকারীর (যে অন্যদের আড়ালে তাদের দোষ বলে তার) কথাকে সাথে সাথে সমর্থন করো না। কারণ, পরচর্চাকারী ব্যক্তি একজন প্রতারক, যদিও তাকে তোমার কল্যাণকামী বলে মনে হয়।'[৮]

হযরত ইমাম আলী (আ.) মালিক আশতারের প্রতি তাঁর নির্দেশাবলীতে শাসনকার্যে কৃপণ, কাপুরুষ ও লোভী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করা থেকে তাঁকে সতর্ক থাকতে বলেন। কারণ, এরা সুবিচার প্রতিষ্ঠার পথে বহু ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। তিনি জুলুম করা থেকে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে জালেমদেরকে মন্ত্রী ও কর্মকর্তা নিয়োগ করা হতে বিরত থাকার জন্য মালিক আশতারকে উপদেশ দেন। সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ ক্ষেত্রে তিনি তাকওয়া ও উত্তম আচরণকে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করতে বলেন।

ইমাম আলী (আ.) বলেন :

> 'তোমার জন্য নিকৃষ্টতম মন্ত্রী বা কর্মকর্তা হলো ঐ ব্যক্তি যে ইতোপূর্বে পাপাচারী শাসক বা প্রশাসকদের মন্ত্রী বা কর্মকর্তা ছিলো এবং তাদের অপকর্মে শরীক হয়েছিলো। অতএব, সে ব্যক্তি তোমার মনোনীত কর্মকর্তা হতে পারে না। কারণ, এ ধরনের লোক পাপাচারীদের সহযোগী ও জালেমদের ভ্রাতা। তুমি তাদের উত্তম বিকল্প খুঁজে পেতে পারো যারা মতামত প্রদানের যোগ্যতা ও প্রভাবের দিক থেকে ঐ লোকদের মতো হবে, কিন্তু পাপাচার ও দুষ্কর্মের ক্ষেত্রে তাদের মতো হবে না। তারা কখনো জালেমকে তার জুলুমে অথবা পাপাচারীকে তার পাপ কর্মে সাহায্য করেনি। তারা তোমাকে সবচেয়ে কম কষ্ট দেবে বা কম ঝামেলায় ফেলবে এবং সবচেয়ে বেশি সহায়তা করবে। তারা তোমার দিকে সবচেয়ে বেশি মনোযোগী হবে এবং অন্যদের প্রতি সবচেয়ে কম মনোযোগী হবে। অতএব, তুমি একান্তে ও প্রকাশ্যে উভয় অবস্থায়ই তাদেরকে তোমার প্রধান সহচর হিসাবে গ্রহণ করো।'[৯]

হযরত ইমাম আলী (আ.) এরপর তাঁর গভর্নরকে স্বচ্ছ, সদাচারী ও স্পষ্টভাষী মুত্তাকী লোকদেরকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য দিকনির্দেশ প্রদান করেন যাদের আচার-আচরণে সমুন্নত মানবিক মূল্যবোধসমূহ প্রতিফলিত হয়। তিনি বলেন :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

> 'তুমি এমন লোকদের সাহচর্য অবলম্বন করো যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং সত্যবাদী। অতঃপর তাদেরকে এ ব্যাপারে অভ্যস্ত করে তোলো যে, তারা যেন এমন কাজের জন্য তোমার প্রশংসা না করে বা তোমাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা না করে যে কাজ তুমি করোনি। কারণ, অতিরিক্ত প্রশংসা তোমার মধ্যে গর্ব-অহংকার তৈরি করবে এবং তোমাকে উদ্ধত আচরণের দিকে ঠেলে দেবে। তোমার কাছে যেন পুণ্যবান ও দুর্বৃত্ত লোকরা সমান মর্যাদা লাভ না করে। কারণ, এর ফলে পুণ্যবানদেরকে নেক আমল থেকে বিচ্যুত করা হবে এবং দুর্বৃত্তকে তার দুর্বৃত্তপনায় প্ররোচিত করা হবে।'[১০]

হযরত ইমাম আলী (আ.) সমাজের সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালানো ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লোকদের সাথে সদাচরণ করার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি বলেন :

> 'তোমার জেনে রাখা প্রয়োজন যে, শাসকের জন্য তার অধীন জনগণের ব্যাপারে সুধারণা লাভে সর্বাধিক সহায়ক হচ্ছে তাদের সাথে সদাচরণ করা, তাদের কষ্ট লাঘব করা এবং তাদেরকে সাধ্যাতীত অসুবিধায় ঠেলে দেয়া থেকে বিরত থাকা। সুতরাং এভাবে তোমাকে এমন একটি কর্মনীতি অনুসরণ করতে হবে যার ফলে তুমি তোমার অধীন জনগণ সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করতে পারবে। কারণ, এ সুধারণা তোমাকে অনেক বড় ধরনের উদ্বেগ থেকে রক্ষা করবে। নিঃসন্দেহে তোমার সুধারণা লাভের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত ঐ ব্যক্তি যার সাথে তোমার আচরণ ভালো ছিলো না। মনে রেখো, সাধারণ জনগণ সে সব শ্রেণীর লোক যারা কেবল পরস্পরের সহযোগিতায়ই উন্নতি করতে পারে এবং তারা পরস্পর থেকে মুখাপেক্ষিতাহীন নয়।'[১১]

হযরত ইমাম আলী (আ.) মালিক আশতারকে লেখা তাঁর এ পত্রে বিশেষভাবে সমাজের অভাবী লোকদের সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> 'সমাজের নিম্নতম স্তরের তথা অভাবী ও অসহায় লোকদের প্রতি দৃষ্টি দাও যাদের জন্য সাহায্য ও সহায়তা অপরিহার্য এবং তাদের সকলের জন্যই আল্লাহ্‌র নামে (বায়তুল মাল থেকে) ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য অপরিহার্যতার ভিত্তিতে তাদের প্রত্যেকেরই শাসকের ওপর অধিকার রয়েছে। এ ব্যাপারে শাসক আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারে না। এ দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করতে হবে ও আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চাইতে হবে এবং নিজেকে সঠিক পথে ধরে রাখতে হবে ও এ পথে হাল্কা বা কঠিন যে কোনো ধরনের কষ্টই আসুক না কেনো, তা সহ্য করতে হবে।'[১২]

এখানে হযরত ইমাম আলী সুবিচারের মৌলিক নীতির ভিত্তিতে সমাজে স্থিতিশীলতা, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণমানুষের প্রতি যে সমুন্নত সমতার মনোভাব দেখিয়েছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে তাঁর নির্দেশাবলী সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর স্বার্থে এবং

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তাদের শোষণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে একটি মেনিফেস্টো। তিনি যে সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন তাঁর কথা ও কাজই তার প্রমাণ।

হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর একটি বিখ্যাত উক্তির সারমর্ম হচ্ছে এই যে, কোনো মানুষ এ কারণেই দরিদ্র হয় যে, তার কাছে তার প্রাপ্য পৌঁছেনি এবং তা এমন লোকের কুক্ষিগত হয়ে আছে যাকে ধনী বলে গণ্য করা হয়।

সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকদের অধিকারের ওপর বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করতে গিয়ে ইমাম আলী (আ.) বলেন :

> 'যাদের ইখতিয়ারে জীবন ধারণের ন্যূনতম উপকরণ নেই, দরিদ্র, অসহায়, কপর্দকহীন ও অক্ষম প্রভৃতি সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র কথা মনে রাখবে। কারণ, এ শ্রেণীর মধ্যেই রয়েছে তারা যারা অপরিতৃপ্ত ও যারা অন্যের কাছে হাত পাতে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ব্যাপারে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁর কারণে সে ব্যাপারে যত্নবান হও। কারণ, এ জন্য তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে। সরকারি তহবিল থেকে এবং জমির ফসল থেকে তাদের জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করে দাও। ... এরা হচ্ছে সেই লোক যাদের দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পিত হয়েছে। সুতরাং বিলাসী জীবন যেন তোমাকে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে না যায়। বড় বড় সমস্যা সম্পর্কে তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়– এ যুক্তিতে তুমি ছোট ছোট বিষয়াদির দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবে না। সুতরাং তাদের ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ো না এবং আত্মশ্লাঘার কারণে তাদের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। লোকরা যাদেরকে নীচু মনে করে তাদের মধ্য থেকে যারা তাদের অস্তিত্ব চোখে না পড়ার কারণে তোমার কাছে আবেদন জানাতে আসতে পারে না তাদের প্রতি মনোযোগ দাও। তাদের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য এমন কতক বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য লোককে দায়িত্ব দাও যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে ও বিনয়ী। তারা এ ধরনের লোকদের অবস্থা সম্পর্কে তোমাকে অবগত করবে। অতঃপর, যেদিন তোমাকে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে সেদিনের জবাবদিহিতার কথা স্মরণ রেখে তুমি তাদের সাথে আচরণ করবে। কারণ, তোমার শাসনাধীন লোকদের মধ্যে এ লোকরাই সমতাভিত্তিক আচরণের সবচেয়ে বড় হকদার। তবে সে সাথে তোমাকে অন্যদের অধিকারও আদায় করতে হবে। কারণ, এ জন্যও তোমাকে আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। সেই ইয়াতীম ও বৃদ্ধদের ব্যাপারে যত্নবান হও যাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ নেই, অথচ তারা মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়ায় না।'[১৩]

সমাজে অবশ্যই সমতা ও সুবিচার বিরাজমান থাকতে হবে। হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর বাণী থেকে প্রাপ্ত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী, ইসলামী নীতিমালার অন্যতম দাবি হচ্ছে এই যে, সামাজিক সুবিচার ও জনকল্যাণভিত্তিক একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সরকারের দায়িত্ব। তিনি কত

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

চমৎকারভাবেই না আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমতার কথা তুলে ধরেছেন! অন্য কথায়, সুযোগ-সুবিধা বণ্টন ও লোকদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে সকল নাগরিককে সমান দৃষ্টিতে দেখা। সকল নাগরিককেই ন্যায়সঙ্গতভাবে ইসলামী সরকারের দেয়া সুযোগ-সুবিধা ও অনুগ্রহ পেতে হবে এবং কোনোরূপ বৈধ বা সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে কেউই যেন কোনো বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে না পারে।

সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা ইসলাম প্রদর্শিত অন্যতম বাস্তব সমাধান যা বিশ্বের বঞ্চিত ও মজলুম শ্রেণীর কাছে খুবই আকর্ষণীয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আর্থিক অবস্থার যে ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে কতক লোকের অবৈধ পন্থায় সমৃদ্ধি অর্জন ও অপর কতক লোকের বঞ্চনার কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ধনসম্পদের ক্ষেত্রে যে বিরাট ও দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠেছে, হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর উপদেশে তা দূর করার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁর মতে, যেহেতু বঞ্চিত ও দরিদ্র লোকেরাই হচ্ছে রাষ্ট্রের সবচেয়ে বিশ্বস্ত জনগোষ্ঠী সেহেতু তারা যেন অনুভব করতে পারে যে, সরকারি কর্মকর্তাগণ দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য অত্যন্ত আন্তরিকভাবে ও গুরুত্বের সাথে চেষ্টা করছেন এবং বাস্তবেও তা-ই হওয়া উচিত। ইমাম আলী (আ.)-এর মতে, সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠার সর্বোত্তম পদক্ষেপ হচ্ছে বঞ্চিত, দরিদ্র ও স্বল্প আয়সম্পন্ন শ্রেণীসমূহের বঞ্চনার অবসান ঘটানো।

মালিক আশতারকে লেখা হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর পত্রে সরকারের কর আদায়কারী কর্মচারীদের কাজ সম্পর্কে যে দিকনির্দেশনা রয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি চাইতেন দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণী যেন সুখী ও পরিতৃপ্ত হতে পারে এবং তাদের অবস্থার উন্নতি হতে পারে। তিনি দরিদ্রদের কাছ থেকে অন্যায্য পরিমাণে কর দাবি করা থেকে কর সংগ্রহকারীদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য খুবই চিত্তাকর্ষক, বিশেষ করে আমাদের এ যুগে যখন কৃষকরা শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদদের দ্বারা দারুণভাবে শোষিত হচ্ছে, তখন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

> 'তোমাকে ভূমি চাষাবাদের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে এবং রাজস্ব আদায়ের তুলনায় এদিকে বেশি দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ, চাষাবাদ না হলে রাজস্ব আদায় কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আর যে ব্যক্তি চাষাবাদের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে রাজস্ব আদায় করতে চায় সে কার্যত সংশ্লিষ্ট এলাকাকে ধ্বংস করে দেয় এবং জনগণের জন্য মৃত্যু ডেকে আনে। ফলে তার শাসনকাল খুবই স্বল্পস্থায়ী হতে বাধ্য। তারা (কৃষকরা) যদি (করের বোঝা) ভারী হওয়ার অভিযোগ করে অথবা রোগ-ব্যাধি, পানির অভাব, অতি বৃষ্টি বা ভূমির প্রকৃতি পরিবর্তন ইত্যাদি সমস্যার কথা বলে, আর ভূমির প্রকৃতি পরিবর্তন সাধনের কারণেই হোক বা খরার কারণেই হোক, তাহলে তুমি তাদের কাছ থেকে আদায়কৃত রাজস্ব সেই পরিমাণে ফিরিয়ে দেবে যে পরিমাণে ফিরিয়ে দিলে তাদের অবস্থার উন্নতি হবে বলে তুমি আশা করতে পারো। তাদের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য তুমি তাদেরকে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

> যা ফিরিয়ে দিলে সে জন্য যেন তুমি অসন্তুষ্ট না হও। কারণ, এটা হচ্ছে এক ধরনের বিনিয়োগ যা তারা তোমাকে তোমার দেশের উন্নতির মাধ্যমে এবং তোমার শাসনাধীন এলাকার অগ্রগতি রূপে ফিরিয়ে দেবে, আর সে সাথে তুমি তাদের প্রশংসা লাভ করবে এবং তাদের প্রতি সুবিচার করতে পারার কারণে তুমি সুখী হবে। তুমি এভাবে তাদের জন্য সুবিধা করে দিয়ে তাদের কাছে যে বিনিয়োগ করবে সে কারণে তুমি তাদের শক্তির ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে পারবে এবং তুমি তাদের প্রতি দয়া দেখিয়ে তাদের প্রতি যে সুবিচার করবে তার ফলে তুমি তাদের ওপর পুরোপুরি আস্থাবান হতে পারবে।... কৃষকদের দারিদ্র্যের ফলে ভূমি ধ্বংস হয়ে যায়, আর কৃষকরা তখনই গরীব হয়ে যায় যখন কর আদায়কারী কর্মচারীরা কেবল (অর্থ) আদায়ের দিকে তাদের পুরো মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে।'[১৪]

প্রকৃতপক্ষে নাহ্জুল বালাগাহ্ হচ্ছে হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর রাষ্ট্রীয় নীতিমালার আয়না স্বরূপ। আজকের বিশ্বে যখন দুর্বল ও বঞ্চিত শ্রেণীর শোষণের ফলে ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যকার ব্যবধান উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে এবং এটাই যেন সর্বজনস্বীকৃত রীতিতে পরিণত হয়েছে। যদিও দেখা যায় যে, হযরত ইমাম আলী (আ.) যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, কৃষিশ্রমিক ও সমাজের দুর্বল শ্রেণীর প্রতি উদাসীনতার কারণে শেষ পর্যন্ত সরকারের পতন বা পরিবর্তন ঘটে থাকে, এ পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকে সম্ভাব্য অসন্তোষ, বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা থেকে সুরক্ষা করার লক্ষ্যে সরকারগুলোর জন্য হযরত ইমাম আলী (আ.) প্রদর্শিত ও নির্দেশিত পন্থাসমূহ আন্তরিকভাবে অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা এবং তা অনুসরণের এটাই উপযুক্ত সময়।

হযরত ইমাম আলী (আ.) সম্পদ বণ্টনসহ সকল ক্ষেত্রে ও প্রশাসনের সকল স্তরে সুবিচারকে শাসনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি কখনোই মানুষে মানুষে পার্থক্য করেননি এবং সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সব সময়ই সম্পদের সমবণ্টনের নীতিমালা কার্যকর করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> 'শাসকদের জন্য সবচেয়ে আনন্দের বিষয় তাদের শাসনাধীন এলাকায় সুবিচার প্রতিষ্ঠায় এবং জনগণের প্রতি তাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশে। কিন্তু তাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে কেবল তখনই যখন তাদের অন্তর নির্মল থাকে।'[১৫]

তিনি মানবতাকে যে আদর্শ শাসন ব্যবস্থা উপহার দেন তাতে সুবিচার একটি সামগ্রিক বিষয় এবং তা সর্বোচ্চ গুরুত্বের অধিকারী। তাঁর মতে জনগণের সাথে সর্বাধিক ন্যায়ানুগ আচরণের পন্থা হচ্ছে সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং তা নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য হতে হবে। তিনি বলেন :

> 'একজনের কাজকে আরেক জনের প্রতি আরোপ করো না এবং যে পর্যায়ের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে সে তুলনায় শুভ প্রতিদানকে সংকুচিত করো না। কোনো ব্যক্তির উচ্চ মর্যাদা যেন তোমাকে তার সামান্য কাজকে বড় করে দেখতে প্ররোচিত না করে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তেমনি কোনো ব্যক্তির নীচু মর্যাদা যেন তার বড় কাজকে ছোট হিসাবে গণ্য করতে তোমাকে প্ররোচিত না করে।'[১৬]

হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর মৌলিক নির্দেশ হচ্ছে এই যে, সকল মানুষই যাতে নিজ নিজ চেষ্টা-সাধনা অনুযায়ী সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদ কাজে লাগাতে পারে সে লক্ষ্যে ক্ষেত্র তৈরির জন্য চেষ্টা চালিয়ে সমাজে সুবিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেউ যদি নির্যাতিত, জুলুমের শিকার বা বঞ্চিত না হয় অথবা কারো ওপর যদি অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয়া না হয় তাহলে এর ফলে নিঃসন্দেহে মানব উন্নয়ন সাধিত হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানার ব্যাপক প্রসার ঘটবে।

হযরত ইমাম আলী (আ.) তাঁর দিকনির্দেশনায় বিচারকের গুণাবলীর ওপরও আলোকপাত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

'লোকদের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এমন লোককে মনোনীত করো যে ব্যক্তি তোমার দৃষ্টিতে তোমার অধীন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। (তার কাছে আগত) বিরোধীয় বিষয়গুলো যেন তাকে ক্ষিপ্ত না করে, বিরোধ যেন তাকে রাগান্বিত না করে, সে যেন কোনো ভুল বিষয়ের ওপরে জেদ না করে, সত্যকে বুঝতে পারার পর তা গ্রহণের ক্ষেত্রে সে যেন পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় না নেয়। সে যেন লোভের দিকে ঝুঁকে না পড়ে এবং কোনো বিষয়ের গভীরে না গিয়ে সে সম্পর্কে কেবল ভাসা-ভাসা ধারণা লাভ করেই যেন সন্তুষ্ট না থাকে। সন্দেহজনক বিষয়গুলো নিয়ে তাকে সবচেয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। যুক্তিতর্কের ব্যাপারে তাকে সর্বাধিক মনোযাগী হতে হবে। মামলার পক্ষদ্বয়ের ঝগড়ায় তাকে যথাসম্ভব কম বিরক্ত হতে হবে, তদন্তের ব্যাপারে সর্বাধিক ধৈর্যশীল হতে হবে এবং রায় ঘোষণার ক্ষেত্রে সর্বাধিক নির্ভয় হতে হবে। প্রশংসা যেন তাকে অহংকারী করে না তোলে এবং তাকে আনন্দিত করার কারণে সে যেন (কোনো পক্ষের দিকে) ঝুঁকে না পড়ে।... আর সে যেন কখনো কখনো তার সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।... তোমাকে এ বিষয়ের ওপর অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ, এ দীন (ইসলাম) এর আগে দুর্বৃত্ত লোকদের হাতে বন্দী ছিলো যখন ভাবাবেগের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতো এবং পার্থিব সম্পদ কামনা করা হতো।'[১৭]

হযরত ইমাম আলী (আ.) তাঁর নিয়োজিত মিসরের গভর্নর মালিক আশতারকে যে উপদেশ দিয়েছেন তা থেকে সুস্পষ্ট যে, ন্যায়বিচার করা কেবল বিচার বিভাগের একার দায়িত্ব নয়; বরং সরকারের সকল বিভাগকেই সমাজে ন্যায়বিচার বা সুবিচার প্রতিষ্ঠিত থাকার উপযোগী পরিবেশ তৈরীর জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করতে হবে। কারণ, সরকারের অন্য যে কোনো নীতিগত ধারণার তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সুবিচার ও সমতা। এটা একটা ঐশী দায়িত্ব যে, অন্যায়কারীদেরকে প্রথমে মৌখিকভাবে উপদেশ দিতে হবে এবং সে উপদেশ হতে হবে প্রথমে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অত্যন্ত নম্র ভাষায় ও যুক্তির মাধ্যমে যাতে তাদেরকে বুঝানো যেতে পারে যে, তারা যে ভুল বা অন্যায় কাজ করছে তার অশুভ পরিণামে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হচ্ছে। নাহি 'আনিল্ মুন্কার্ (মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা) এর মূলনীতি অনুযায়ী নিষিদ্ধ কাজগুলো কী কী সে সম্পর্কে সকলের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে এবং আম্র্ বিল্ মা'রূফ (ভালো কাজের আদেশদান) মূলনীতির দাবি অনুযায়ী ভালো কাজ করার জন্য তাদের কাছে আবেদন জানাতে হবে যাতে শুধু ধর্মীয় দায়িত্ব হিসাবেই নয়, বরং সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা নিজেদের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ়তা ও সাহস সৃষ্টি করতে পারে।

হযরত ইমাম আলী (আ.) তাঁর এ পত্রে ছোটখাট আত্মসাতের ব্যাপারেও সতর্ক থাকা, খোঁজখবর রাখা ও তা প্রতিরোধ করার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> 'তোমার সহকারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। তাদের কেউ যদি ছোটখাট আত্মসাতের দিকেও হাত বাড়ায় এবং তোমাকে তথ্য সরবরাহকারিগণ যদি এ সংক্রান্ত তথ্যের সত্যায়ন করে তাহলে সাক্ষ্য হিসাবে এটাকেই যথেষ্ট গণ্য করতে হবে। তখন তোমার কাজ হবে তাকে শারীরিক শাস্তি প্রদান করা এবং সে যা আত্মসাৎ করেছে তা তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেয়া।'[১৮]

হযরত ইমাম আলী (আ.) তাঁর গভর্নরকে লোকদের অধিকার সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং বৈষম্যের নীতি অনুসরণ ও স্বৈরতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেন :

> 'তোমাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, একজন প্রশাসকের কিছু অনুগ্রহভাজন লোক থাকে এবং এমন কিছু লোক থাকে যারা তার কাছে খুব সহজে পৌঁছতে পারে। এ ধরনের লোকরা অনেক কিছু আত্মসাৎ করে, উদ্ধত আচরণ করে এবং কাজকর্মে সুবিচারের নীতি অনুসরণ করে না। তোমার দায়িত্ব হচ্ছে তাদের এ সব দোষের কারণগুলোকে দূরীভূত করে তাদের অপকর্মের মূলোৎপাটন করা। তুমি তোমার অনুগতদের ও সমর্থকদেরকে কোনো ভূমি বরাদ্দ দিও না। তারা যেন তোমার কাছ থেকে জমি পাবার আশা না করে। কারণ, তাহলে (তাদেরকে জমি দেয়া হলে) তারা পানিসেচ ও সাধারণ সেবার ক্ষেত্রে আশপাশের লোকদের অসুবিধা করতে পারে, যেহেতু এ লোকদের ওপর বোঝা চাপানোর মাধ্যমেই তাদের সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। এভাবে তারা সুবিধা ভোগ করবে, কিন্তু ইহকালে ও পরকালে এ সংক্রান্ত অভিযোগ তোমার ঘাড়ে থেকে যাবে। প্রকৃতপক্ষে অধিকার যাদের তাদেরকেই তা ভোগ করার সুযোগ দাও, তা তারা তোমার কাছের লোকই হোক বা দূরের লোকই হোক। এ ব্যাপারে তোমাকে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, এমনকি এ ব্যাপারে তোমার আত্মীয়-স্বজন ও অনুগ্রহভাজন লোকরা জড়িত থাকলেও। এ ব্যাপারে তোমার কাছে যা ভারী ও কঠিন বলে মনে হয় তার প্রতিদানের প্রতি দৃষ্টি রেখো; কারণ, তার প্রতিদান অত্যন্ত চমৎকার।'[১৯]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তিনি গভর্নরকে স্বীয় সরকারের প্রতিটি বিভাগে সুবিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এভাবে আদেশ দেন :

> 'সাধ্যানুযায়ী সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তুমি তোমার দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের মনোনীত করার ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করবে। তুমি অবশ্যই উত্তম চরিত্রের অধিকারী, সুযোগ্য ও প্রতিভাবান লোকদের মনোনীত করবে।'

তিনি আরো বলেন :

> 'কর্মকর্তারা তাদের কেতাদুরস্ত অবস্থার আড়ালে যে সব অবৈধ কাজকর্ম করে, সুবিচারকে ব্যাহত করে এবং অধিকারের অপব্যবহার করে থাকে সে ব্যাপারে তুমি তোমার চোখ বন্ধ করে রেখো না। অন্যথায় এরা লোকদের প্রতি যে অন্যায় করছে সে জন্য তোমাকে দায়ী করা হবে।'

হযরত ইমাম আলী (আ.) কর্তৃক উপস্থাপিত সুবিচারের ধারণা অত্যন্ত সমুন্নত, সর্বাত্মক, এমনকি রাষ্ট্র পরিচালনা ও বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রও এর আওতাভুক্ত। আর এটা কোনো তত্ত্ব কথা নয়, বরং তিনি তাঁর কল্যাণকর জীবনে তা বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। তিনি যখন তাঁর প্রতিপক্ষের দ্বারা তাঁর রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবত নীরবতা বজায় রেখেছিলেন তখন যেমন, তেমনি তাঁর প্রায় পাঁচ বছরব্যাপী ন্যায়ের শাসনকালে–যখন তাঁর শাসনাধীন এলাকার আয়তন ছিলো উত্তর আফ্রিকা থেকে ভারত ও চীন সীমান্ত পর্যন্ত–এ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এমনকি প্রতিকূল অবস্থায়ও কীভাবে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে এ ব্যাপারে তিনি মালিক আশতারকে নির্দেশ দেন :

> 'তুমি যখন তোমার প্রতিপক্ষের সাথে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হবে অথবা তাকে কোনো ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেবে তখন বিশ্বস্ততার সাথে চুক্তিসমূহ কার্যকর করবে ও কৃত ওয়াদা পালন করবে। তুমি যা কিছু অঙ্গীকার করেছো তা রক্ষার ব্যাপারে নিজেকে ঢালস্বরূপ করো। কারণ, আল্লাহ্ মানুষের ওপর যে সব দায়িত্ব-কর্তব্য দিয়েছেন তার মধ্যে অঙ্গীকার পালনের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী আর কিছু নেই যা মানুষকে মতপার্থক্য ও চিন্তাচেতনার পার্থক্য সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ করে। শুধু মুসলমানরাই নয়, এমনকি কাফেররাও চুক্তি পালন করেছে। কারণ, তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করার বিপদ সম্পর্কে বুঝতে পেরেছে। অতএব, তুমি তোমার শত্রুর সাথে প্রবঞ্চনা করো না। কারণ, অজ্ঞ আর দুর্বৃত্ত ছাড়া কেউই আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট করে না। আল্লাহ্ (তাঁর বান্দাহ্দের সাথে) অঙ্গীকার করেছেন এবং নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা তিনি তাঁর দেয়া আশ্রয়ের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিসমূহের মাঝে–যেখানে তারা অবস্থান করে ও তাঁর সান্নিধ্য কামনা করে–বিস্তৃত করে দিয়েছেন। অতএব, এ ব্যাপারে কোনোরূপ প্রবঞ্চনা, ধূর্ততা ও কপটতা হওয়া উচিত নয়।'[২০]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হযরত ইমাম আলী (আ.) রক্তপাত এড়ানোর ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রক্তপাত এ বিশ্বের বুকে এবং সে সাথে পরকালীন জীবনেও যে অবাঞ্ছিত পরিণাম ডেকে আনে সে সম্পর্কে তিনি সতর্ক করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> 'অবৈধ রক্তপাতের মাধ্যমে তুমি তোমার শাসনকর্তৃত্বকে শক্তিশালী করো না। কারণ, এর ফলে শাসনকর্তৃত্ব যদি ধ্বংস না-ও হয়, বা অন্যের হাতে চলে না-ও যায়, অন্তত দুর্বল হয়ে পড়ে ও হ্রাস পায়। স্বেচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট বা আমার নিকট তোমার কোনোই কৈফিয়ৎ গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে হত্যার প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণ করা হবে। তুমি ভুলবশত এ কাজ করে থাকতে পারো, অথবা তুমি তোমার চাবুক বা তলোয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে থাকতে পারো, অথবা শাস্তি দানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন করে থাকতে পারো; কারণ, ক্ষেত্র বিশেষে এমনকি একটি ঘুষি অথবা তার চেয়েও ছোট আঘাত মৃত্যু ঘটাতে পারে। অতঃপর (এরূপ ক্ষেত্রে) তোমার কর্তৃত্ব প্রয়োগে বাড়াবাড়ি তোমাকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে রক্তমূল্য প্রদান থেকে রেহাই দেবে না।'[২১]

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, শাসকের বা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে সংঘটিত অবিচার ও অন্যায় হত্যাকাণ্ড সমাজে বিশৃঙ্খলা ও পশ্চাদপদতা সৃষ্টি করে, আর শেষ পর্যন্ত তা স্বয়ং শাসকের জন্য, এমনকি গোটা প্রশাসন ও শাসন ব্যবস্থার জন্যই বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়।

হযরত ইমাম আলী (আ.) তাঁর এ পত্রের ধারাবাহিকতায় জ্ঞান, ধৈর্য ও ক্ষমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, নবী-রাসূলগণের মিশনের লক্ষ্য ছিলো মানুষের পার্থিব জীবনে শান্তি ও উন্নতি এবং পরকালীন জীবনে মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য পৃথিবীর বুকে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।

হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী প্রশাসনের নীতিমালা ও পরিকল্পনা সমূহের লক্ষ্য হওয়া উচিত সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর জন্য একটি মানবোচিত জীবনের ব্যবস্থা করা। কারণ, যে সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত থাকে তা একটি ঐশী সমাজ। তাই সরকারের জন্য সুবিচারের পতাকা উত্তোলন করা অপরিহার্য। শক্তিশালী যুক্তির মাধ্যমে সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টার সামান্যতম ত্রুটিও করা উচিত নয়।

হযরত ইমাম আলী তাঁর গভর্নরের উদ্দেশ্যে যে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন তাতে তিনি সব কিছুর আগে স্বাধীনতা ও সামাজিক মুক্তি নিশ্চিত করতে বলেন। আর এটা কেবল তখনি সম্ভবপর যখন সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত ও সামাজিক অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সুবিচারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

ইমাম আলী (আ.)-এর এ পত্র নিয়ে সতর্কভাবে ও গভীরভাবে গবেষণা করা হলে তা মৌলিক মানবাধিকারসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তার পূর্ণতা বিধানের লক্ষ্যে একটি দরজা উন্মুক্ত করে দেবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কারণ, এ পত্রে তিনি যে সব উক্তি করেছেন তা মানবাধিকার, তার হেফাজত ও সুবিচার সহকারে প্রতিটি মানুষের জন্য তার বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখার দিকে পথনির্দেশ করে। আর ইমাম এ ক্ষেত্রে মানবিক বিবেচনাকে প্রথম স্থান দেননি, বরং তিনি গতিশীল শারয়ী (শরীয়তগত) বিধিবিধানসমূহের বাস্তবায়নজনিত সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার শাখা-প্রশাখাসমূহকেও বিবেচনায় রেখেছেন–যা মূলত সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার উচ্চতর স্তর এবং যা সমগ্র মানবজাতিকেই উপকৃত করে। তাঁর মতে, একজন শাসক কেবল সুবিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই জনগণের নিকট থেকে এমন আনুগত্য লাভ করতে পারে যা শক্তি প্রয়োগ বা স্বৈরতান্ত্রিকতার আশ্রয় নিয়ে লাভ করা সম্ভব নয়।

ইমাম আলী (আ.) যে সুবিচারমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন তা যে কোনো সম্ভাব্য শাসক ও সরকারের জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ এবং বর্তমানে যখন শান্তি ও সুবিচারের ফরিয়াদ অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি উচ্চকিত হচ্ছে, এহেন সংকটময় সময়ে তা পথনির্দেশক শক্তি হিসাবে ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষ করে বর্তমানে মুসলমানদের জন্য তাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা, একটি অভিন্ন লক্ষ্যের দিকে অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং সমগ্র মানবতার জন্য দিকনির্দেশ প্রদানকারী কুরআন মজীদের নির্দেশিত ধর্মীয় শাসন প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাওয়া অপরিহার্য।

বস্তুত ইসলামী সংহতি হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা গোত্র ও সম্প্রদায় বিশেষের অথবা এ উদ্দেশ্যে গঠিত বিশেষ কোনো রাজনৈতিক সংগঠন বা কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলের ঐক্যের অনেক উর্ধ্বে। কারণ, ইসলামের সাম্য নীতিমালার লঙ্ঘন করা হলে তা অনৈসলামী ধ্যান-ধারণার জন্ম দিতে বাধ্য যা শেষ পর্যন্ত শুধু মুসলমানদের জন্যই বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করবে না; বরং সুবিচার, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির নীতিমালার অনুসরণ করা না হলে মানবজাতির অন্যান্য অংশের জন্যও বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি করবে। তাই ঐক্য হচ্ছে ঐশী ধর্ম ইসলামের একটি মৌলিক নীতি এবং ইসলামের বাণীর মূল মর্ম হচ্ছে সুবিচার, ঐক্য ও নিরাপত্তা। আর এগুলো হচ্ছে এমন কতকগুলো উপাদান যা মানব সমাজের সকল স্বল্পস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান।

বস্তুত নেতৃবৃন্দ ও জনগণের মধ্যে আন্তরিকতা গড়ে তুলে এবং তাদের মধ্য থেকে মতানৈক্য ও দ্বৈততা দূরীভূত করে শান্তি ও সমঝোতার মহামূল্য সম্পদ গড়ে তোলা যেতে পারে যা আন্তঃধর্মীয় সংলাপের জন্য প্রয়োজনীয় আন্তরিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। আর কেবল ধার্মিকতার মাধ্যমেই আত্মমর্যাদাবোধের সংস্কৃতি গড়ে তোলা যেতে পারে। এ ধার্মিকতার জন্ম নেয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থেকে। আর এটা কুরআন মজীদকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরা ও পরম দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কাউকে ভয় না করা ব্যতীত সম্ভব নয়।

ভ্রমাত্মক ধারণা ও স্বার্থপরতা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে এবং একই ধর্মের বিভিন্ন মাজহাবের মধ্যে যে সব মতভেদ গড়ে তুলেছে, শান্তি ও সাযুজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সে সবের নিরসন অপরিহার্য। বস্তুত মানবসমাজের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও সামষ্টিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য সংযোগ বিনির্মাণে খোদায়ী

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

দয়া ও অনুগ্রহ প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করে থাকে। ইমাম আলী (আ.)-এর গতিশীল শিক্ষায় সমগ্র বিশ্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

মালিক আশতারকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নত দেশ মিসরে গভর্নর নিয়োগ করে পাঠানোর সময় কত চমৎকার নির্দেশই না দিয়েছেন! তিনি বলেন :

> 'এ জনগোষ্ঠী পূর্ব থেকেই যে উন্নত মানের জীবন যাপন করে আসছে–যার বদৌলতে সেখানে একটি সাধারণ ঐক্য গড়ে উঠেছে এবং যার মধ্য দিয়ে সেখানকার সাধারণ জনগণ উন্নতি করেছে তাদের সে অবস্থাকে ব্যাহত করো না। তাদের এ পূর্ববর্তী জীবনধারাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য কোনো কর্মপন্থা আবিষ্কার করো না। কারণ, যারা তার প্রচলন করেছিলো তারা তার পুরস্কার পাবে, অন্যদিকে তুমি তা ব্যাহত করলে তার বোঝা তোমার ঘাড়েই থেকে যাবে। তোমার শাসনাধীন এলাকার সমৃদ্ধি স্থিতিশীল করার এবং তোমার পূর্ববর্তীরা যে সব ভালো কাজে দৃঢ় ছিলেন তা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাথে তোমার আলোচনা ও জ্ঞানীগুণীদের সাথে মত বিনিময় বৃদ্ধি করো।'[২২]

কুরআন মজীদ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন মতাদর্শের অনুসারীদের মধ্যকার ঐক্য ও ঘনিষ্ঠতাকে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে। এরশাদ হয়েছে :

> 'আর স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন তোমরা পরস্পরের দুশমন ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরসমূহকে ভালোবাসার দ্বারা পরস্পরের সাথে জুড়ে দিলেন, আর আল্লাহ্র অনুগ্রহে তোমরা ভ্রাতৃসম্প্রদায়ে পরিণত হলে।' (সূরা বাকারা : ৬১)

এ পথনির্দেশের ভিত্তিতেই বিভিন্ন চিন্তা ও মতাদর্শের অনুসারীদের মধ্যকার আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ঐক্য ও সংহতির দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত। এ মূলনীতির ভিত্তিতে হযরত ইমাম আলী তাঁর গভর্নরকে সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঐক্য, নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে, এমনকি স্বীয় বিরোধীদের প্রতিও সম্মান দেখাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। সমাজে যখন বিতর্ক ও বিরোধের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় তখন ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সমঝোতা গড়ে তোলার জন্য ইমাম আলীর শিক্ষায় প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

নাহ্জুল বালাগায় উদ্ধৃত হযরত ইমাম আলীর নিম্নলিখিত উক্তিতে চিন্তার খোরাক রয়েছে :

> 'জনগণের মধ্যে যখন বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে তখন এমন একটি সদ্য বয়ঃপ্রাপ্ত উষ্ট্রীর ন্যায় হয়ো না যার পৃষ্ঠদেশ আরোহী বহনের জন্য না যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছে, না সে দুধ দিচ্ছে।'[২৩]

ইমাম আলী গণবিশৃঙ্খলার সময় কোনো পক্ষ বা কোনো গোষ্ঠীর পক্ষাবলম্বন না করার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন। তবে যখন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সংঘাত দেখা দেয় তখন সত্যের সপক্ষে ও মিথ্যা দমনের জন্য উত্থান করা অপরিহার্য। তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

> 'লোকদের সাথে এমনভাবে আচরণ করো যেন তুমি মৃত্যুবরণ করলে তারা তোমার জন্য ক্রন্দন করে এবং তুমি যখন বেঁচে থাকো তখন তারা তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করে।'[২৪]

এখানে ইমামের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি চান যে, লোকরা ব্যক্তিগত আচরণের ক্ষেত্রে এমন সমুন্নত মূল্যবোধের অনুসরণ করুক যা লোকদেরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং তাদের মধ্যে ঐক্য ও সদিচ্ছা গড়ে তুলবে। আর এগুলো হচ্ছে এমন উপদান যা শুধু পার্থিব জীবনেই তাদেরকে লাভবান করবে না; বরং তারা অন্যদের সাথে যে সদাচরণ করেছে এ কারণে তাদের মৃত্যুর পরেও লোকরা তাদের সে সব উত্তম স্মৃতি স্মরণ করবে।

হযরত ইমাম আলী বন্ধুত্ব সম্পর্কে বলেন :

> 'সেই ব্যক্তি বন্ধু নয় যে তার বন্ধুকে তিন অবস্থায় হেফাজত না করে : দুঃখ-কষ্টের ও অসুবিধা অবস্থায়, তার অনুপস্থিতিতে এবং তার মৃত্যুর পরে।'[২৫]
>
> 'বন্ধুর প্রতি ঈর্ষা মানে তার ভালোবাসায় ত্রুটি।'
>
> 'বন্ধুর প্রতি তোমার ভালোবাসাকে একটি সুনির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত সীমিত রাখো। কারণ, হয়তো এক সময় সে তোমার শত্রুতে পরিণত হয়ে যেতে পারে। তেমনি তোমার শত্রুকে ঘৃণা করার ক্ষেত্রেও একটি সীমা বজায় রাখো। কারণ, হয়তো এক সময় সে তোমার বন্ধুতে পরিণত হয়ে যেতে পারে।'

এখানে ইমাম বলতে চান যে, বন্ধুত্বের প্রবণতা মানুষের প্রকৃতিতে গভীরভাবে নিহিত রয়েছে। সুতরাং স্থায়ী বন্ধুত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে চিন্তাশক্তি ও হৃদয়ের সমন্বয় সাধন যা মতবিরোধকে এতখানি কমাতে সাহায্য করে যে, এর ফলে এমনকি একজন শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়ে যেতে পারে। এর বিপরীতে বন্ধুর মধ্যে যদি বন্ধুর দোষ খুঁজে বের করা ও তার প্রতি ঈর্ষা পোষণের অস্তিত্ব থাকে তাহলে বন্ধুদের মধ্যে মতপার্থক্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তা শত্রুতায় পর্যবসিত হতে পারে। সুতরাং শান্তি ও নিরাপত্তার খাতিরে বন্ধুদের উচিত পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। হযরত আলী তাঁর অপর এক উক্তিতে বলেন : 'ঈর্ষা ও স্বার্থপরতার স্বল্পতা শারীরিক সুস্থতার কারণ।'

একই প্রেক্ষাপটে ইমাম সমাজের উন্নয়নের স্বার্থে লোকদেরকে ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলার জন্য উপদেশ দেন। তিনি বলেন : 'আচরণের ক্ষেত্রে লোকদের সাথে নৈকট্য তাদের ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা এনে দেয়।'

ইমাম আলী (আ.)-এর বাণী ও উক্তিসমূহ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সুস্পষ্ট পথের সন্ধান পাওয়া যায় যা অবশ্যই বিভিন্ন চিন্তা ও মতাদর্শের অনুসারী লোকদের মধ্যে আন্তঃধর্মীয় সমঝোতা সৃষ্টির দিকে এগিয়ে দিতে সক্ষম। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইমামের ব্যক্তিত্বের এ গতিশীলতা ও আকর্ষণ তাঁকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভালোবাসার পাত্রে, এমনকি অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরও ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত করে রেখেছে। প্রাচীন কালে বাইযান্টাইন সাম্রাজ্যের নাইটগণ আরবদের বিরুদ্ধে ও পরবর্তীকালে তুর্কীদের বিরুদ্ধে (যাদের উভয়ই মুসলিম জাতি) অনবরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকলেও তাঁরা সব সময়ই তাঁদের হল-কক্ষে বীরত্ব ও মহত্ত্বের প্রতীক হিসাবে হযরত আলী (আ.)-এর ছবি টানিয়ে রাখতেন। এ যুগেও জোরদাক ও সুলাইমান কিত্তানী সহ বহু খ্রিস্টান মনীষী তাঁর বহুমুখী ব্যক্তিত্বের ওপর আলোকপাত করে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

এমনকি ভারতের অনেক হিন্দু পণ্ডিতও স্বীকার করেছেন যে, নাহ্জুল বালাগায় বর্ণিত হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর বাণী ও বক্তব্য একটি সুবিচারপূর্ণ ও সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য শান্তি, ঐক্য ও নিরাপত্তার অনবদ্য দিকনির্দেশনা যা অগণিত সমস্যার ভারে জর্জরিত বর্তমান বিশ্বের জন্য সর্বরোগের মহৌষধ হিসাবে কাজ করতে পারে। হযরত ইমাম আলী (আ.) সুবিচারপূর্ণ শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর ভাষণ (খুত্বাহ্) ও চিঠিপত্রসমূহে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তাতে এমনকি অমুসলিমদের সাথেও সর্বাধিক সুবিচারপূর্ণ আচরণের জন্য যে নির্দেশনা রয়েছে তাঁরা সে পূর্ণাঙ্গ আচরণবিধির কথা উল্লেখ করেছেন।

ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট শঙ্কর দয়াল শর্মা এক সেমিনারে বলেন :

> 'নাহ্জুল বালাগাহ্ হচ্ছে মানবতার জন্য এক সর্বজনীন বাণী।'

তিনি আরো বলেন :

> 'ইমাম আলী আমাদেরকে এ সত্য অনুভব করতে অনুপ্রাণিত করেছেন যে, এ পার্থিব জীবন স্বল্পস্থায়ী এবং আমাদেরকে আমাদের কাজকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তাঁর শক্তিমান প্রচার এতই সমুন্নত, অথচ তা এমনই বাস্তবসম্মত যে, বর্তমান সঙ্কীর্ণ চিন্তা ও বস্তুগত স্বার্থসন্ধানের বিশ্বে তার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

ভারতের অন্য একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সাবেক মন্ত্রী জি. ভেঙ্কট স্বামী 'নাহ্জুল্ বালাগার আলোকে আন্তঃধর্মীয় সমঝোতা' শীর্ষক সেমিনারে বলেন :

> 'ইমাম আলী হচ্ছেন প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবর্তক। কারণ, তিনি বলেন, লোকেরা দুই ধরনের : হয় তোমার ধর্মীয় ভাই, নয়তো খোদার সৃষ্টি হিসাবে তোমারই সম প্রজাতি।'

এ প্রবন্ধের উপসংহারে বলতে চাই যে, ইমাম আলীর দৃষ্টিতে সুবিচার যে কোনো কিছুকে তার যথাস্থানে স্থাপন করে এবং সুবিচার হচ্ছে সাধারণ ও সর্বজনীন তত্ত্বাবধায়ক। আর বর্তমান আধুনিক বিশ্বে যে অবিচারপূর্ণ কার্যকলাপ নিয়ম-রীতিতে পরিণত হয়ে গেছে, তা দূর করা অপরিহার্য। মানবজাতির জন্য জীবনকে অনুধাবন করা খুবই প্রয়োজন এবং তাকে সুবিচারের গুরুত্ব স্মরণ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করিয়ে দেয়া ও তার ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া খুবই জরুরি। মানবজাতি যদি হযরত ইমাম আলীর উপদেশ গ্রহণ করে তাহলে এ গ্রহের বুকে আর রক্তপাত ঘটবে না। অন্য কথায়, অংশতঃই হোক বা পুরোপুরিই হোক, সুবিচারের অনুপস্থিতিই অসন্তোষের জন্ম দেয় এবং প্রায়শঃই লোকদেরকে অযৌক্তিক কাজের দিকে ঠেলে দেয়। অতঃপর, যে কোনো ধরনেরই হোক না কেনো এবং যত সামান্য পরিমাণেই হোক না কেনো, ওপর থেকে যখন অবিচারের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তখন তা নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত বড় ধরনের দুর্নীতি ও অনাচারের জন্ম দেয়। তাই সুবিচার দাবি করে যে, আমাদেরকে সততার অধিকারী হতে হবে, শুধু আমাদের নিজেদের প্রতিই নয়, বরং শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সমানভাবে অন্য সকলের প্রতিও। প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, আমাদের আশেপাশে ও চারদিকে যারাই রয়েছে তাদের সকলেরই সুবিচার পাবার অধিকার রয়েছে।

বিশ্বের দেশসমূহের শাসকগণ যদি প্রকৃতই তাঁদের দেশসমূহকে কল্যাণময় সমাজে পরিণত করতে এবং পরাশক্তিবর্গের চাপ প্রতিহত করতে চান তাহলে হযরত ইমাম আলী যেমন শিক্ষা দিয়েছেন তার ভিত্তিতে এবং তাঁদেরকে অবশ্যই সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সুবিচারের মূলনীতির ভিত্তিতে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তুলতে হবে। কারণ, কেবল তাহলেই শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে।

মালিক আশতারের উদ্দেশে লেখা হযরত ইমাম আলীর পত্র হচ্ছে এমন এক মানবাধিকার সনদ, এমনকি তা জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের চেয়েও পূর্ণতর। শুধু এ পত্রই নয়, বিশ্ব যেভাবে বিশ্বায়নের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে সে প্রেক্ষিতে সমগ্র নাহ্জুল বালাগাহ্ই আগামী দিনের শাসক ও শাসিত উভয়ের জন্য সমভাবে একটি পথনির্দেশক গ্রন্থ।

সর্বশেষ নাযিলকৃত ঐশী বিধিবিধানের সমষ্টি ইসলাম এভাবেই সমগ্র মানব প্রজাতিকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আহ্বান করে। বস্তুত বিশ্ব যখন বিভেদমূলক জাতি-রাষ্ট্র সমূহে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং উদ্ধত অজ্ঞ পরাশক্তিবর্গ অন্ধভাবে তাদের অবিচার, স্বেচ্ছাচারিতা ও মানবজাতিকে শোষণের পথে চলা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে পৃথিবী নামক এ গ্রহকে ধ্বংসের প্রান্তসীমায় ঠেলে দিয়েছে– যা মানবসমাজকে সংলাপ ও সমঝোতার অভিন্ন মঞ্চে একত্র হতে বাধা দিচ্ছে, এ প্রেক্ষিতে যখন হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর যে পুনরাবির্ভাব ঘটবে তখন অন্যায় ও অবিচারে পূর্ণ এ বিশ্বে শান্তি, সুবিচার ও সমতা নীতির ভিত্তিতে একটি বৈশ্বিক সরকার প্রতিষ্ঠা করাই হবে তাঁর সে পুনরাবির্ভাবের উদ্দেশ্য।

(তেহরান থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা *Message of Thaqalayn*, Vol. 8, No. 4 Summer 1424/ 2003 সংখ্যা থেকে অনূদিত)

তথ্যসূত্র :

১. স্থপতি, সমাজকর্মী এবং ভারতের হায়দরাবাদস্থ ইমামে যামান (আ.) ইডুকেশনাল ট্রাস্ট-এর প্রেসিডেন্ট।

২-২২. নাহ্জুল বালাগাহ্, পত্র নং-৫৩; ২৩-২৫, প্রাগুক্ত, যথাক্রমে উক্তি নং ১, ১০ ও ১৩৪।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মুসলিম বিশ্ব : একটি পক্ষপাতহীন দৃষ্টিপাত

জারগেন টডেনহফার*

অনুবাদ : এস.এম. আশেক ইয়ামিন

সারসংক্ষেপ

বিগত দুই শতাব্দী ধরে মুসলমানরা ঔপনিবেশিক শক্তির কাছ থেকে শুধু অত্যাচারই ভোগ করে এসেছে। মুসলমানদেরকে ভুলভাবে, এমনকি বিকৃতরূপে জনপ্রিয় মিডিয়ায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এ লেখাটি জারগেন টডেনহফারের 'Why do you kill Zaid?' গ্রন্থের Ten Theses এর সংকলন যেখানে একজন মুসলমানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। ইসলাম ও 'সন্ত্রাসবাদ'-এর সম্পর্কে বা মুসলমানদের ব্যাপারে এরকম আরও যেসব প্রচলিত ধারণা রয়েছে, লেখক এখানে থিসিস বা অলোচ্য বিষয়ে তার বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবাদ প্রকাশের প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি উপসংহারে পাশ্চাত্য সরকারসমূহকে তার পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে, যুদ্ধের কুশলতার চেয়ে কুটনৈতিক দক্ষতা ও প্রজ্ঞার ওপর অধিক মনোনিবেশ করার আহ্বান জানিয়েছেন। আশা করা যায় যে, তাঁর এ দশটি বিষয় তথা এ থিসিস মুসলিম বিশ্বকে ভিন্নভাবে দেখার নতুন দ্বার উন্মোচন করবে।

থিসিস ১ : পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিম বিশ্বের তুলনায় অধিক সহিংস– ঔপনিবেশিকতার সূচনালগ্ন থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমান হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে।

বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদ অ্যালেক্সিস ডি টক্‌ভিল ব্যক্তি স্বাধীনতার একজন উৎসাহী অগ্রদূত ছিলেন। ১৮৩৫ সালে প্রকাশিত তাঁর অন্যতম 'Democracy in America' গ্রন্থে টকভিল একটি মন্তব্য করেন যা সে যুগের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে :

---

* ড. জারগেন টডেনহফার ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ মিডিয়া গ্রুপের কর্মকর্তা হিসাবে ২০ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। তার পূর্বে তিনি ১৮ বছর যাবৎ জার্মান পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন এবং CDU/CSU এর উন্নয়ন ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ মুখপাত্র ছিলেন। তিনি আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধের ওপর দু'টি বেস্ট সেলার বই এর লেখক। এ প্রবন্ধ তাঁর 'Why do you kill Zaid?' বইয়ের Ten Theses অংশ থেকে সংকলিত।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

> 'আমরা যদি আমাদের চিন্তাধারার প্রতি লক্ষ্য করি, আমাদেরকে প্রায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, ইউরোপীয়রা মানবজাতির এক ভিন্ন গোত্রভুক্ত সম্প্রদায়, যেমন ইতর প্রাণীর বিপরীতে মানব সম্প্রদায়। সে তার নিজের প্রয়োজনে তাদেরকে বশীভূত করে এবং যখন তা করতে ব্যর্থ হয় তার বিনাশ সাধন করে।'

তাই উদার চিন্তাবিদদের নিকট 'পরিণতিতে' মুসলিম বিষয়বস্তুসমূহ নিজেদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচনা করার কোনো কারণ ছিল না'।

প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমাবিশ্ব গত দু'শ বছর ধরে মুসলিম বিশ্বের সাথে এ আচরণই করে এসেছে। ১৯ শতকের ঔপনিবেশিক শাসকরা তাদের 'Civilizing Mission' এর বিরোধিতা নস্যাতের জন্য যে কৌশল অবলম্বন করে তা ছিল 'ধ্বংস সাধন' 'লুণ্ঠন ও ভীতি সঞ্চার' (অলিভিয়ের লে কোর গ্র্যান্ডম্যায়সন) আলজেরিয়ার গুহায় আশ্রয় গ্রহণকারী একটি গোত্রকে সম্পূর্ণ ধোঁয়ায় আটকে মেরে ফেলা হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন অবশ্য তাঁর কাজে স্রষ্টার সহায়তা দেখতে পেয়েছিলেন; বলেছিলেন, ফ্রান্স আলজেরীয়ার উপপত্নী সম। কেননা, স্রষ্টা তেমনটাই চান। আলজেরীয়রা অবশ্য বিষয়টিকে সেভাবে দেখেনি। স্বাধীনতার জন্য তাদেরকে অত্যন্ত চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। ফরাসী বিমান বাহিনী ১৯৫৪ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতার যুদ্ধে আলজেরিয়ার ৮০০০টি গ্রাম নাপাম বোমা দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। আলজেরিয়ান ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট ঘৃণ্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত করেছে, যেমন অ্যালবার্ট কামু সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরিমাণের দিক থেকে এসকল সহিংসতা এবং উপনিবেশবাদীদের দ্বারা সংঘটিত সহিংসতার কোনো পর্যালোচনা করা হয়নি। আলজেরীয় তথ্যসূত্র মতে ১৩০ বছরের 'Civilizing Mission' এ তারা বিশ লক্ষের অধিক আলজেরীয়কে হত্যা করেছে। ফ্রান্সের হিসাব অনুযায়ী দশ লক্ষ আলজেরীয় এবং একলক্ষ ফ্রেঞ্চকে হত্যা করা হয়।

ব্রিটিশ উপনিবেশকবলিত ইরাকীদের ভাগ্যে এর চেয়ে ভালো কিছু ঘটেনি। ১৯২০ সালে যখন তারা ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন, উইনস্টন চার্চিল তাদের বিরুদ্ধে 'অকৃতজ্ঞতা'র অভিযোগ এনে রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করেন যা ছিল তাঁর ভাষায় 'সর্বোচ্চ নৈতিক বাস্তবতার সাথে'। মরোক্কতে কাবিল বিদ্রোহের সময় স্পেনীয়রা রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে এবং একই রকম ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করে। আমেরিকান আদিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার ক্ষেত্রে যে কৌশল অবলম্বন করা সেই একই কৌশল প্রয়োগ করা হয় আরবদের ক্ষেত্রে।

সে সময়ের জাতিগত ও সংস্কৃতিগত শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার বিকৃত চিন্তাভাবনাগুলোর কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। Mass Psychology-এর প্রতিষ্ঠাতা ও 'সমতার কুসংস্কার' মতবাদ বিরোধী গুস্তাভলেবন মানবজাতিকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন : আদি অস্ট্রেলিয়ান ও আমেরিকানদেরকে 'প্রাচীন গোত্র', 'নিগ্রো'দেরকে নিম্নস্তর, চীনাদের 'মধ্যবর্তী' এবং ইন্দো-ইউরোপিয়ানদেরকে 'উচ্চতর গোত্র' হিসাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে পশ্চিমা বিশ্বও অধিকাংশ সময়ে আরবদের উপ-মানব হিসাবে বিবেচনা করে এসেছে যারা বনমানুষের মধ্যে উচ্চ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পর্যায়ভুক্ত। (জাঁ পল সাত্রে) এ কথা সত্য হয়ে দেখা দেয় ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং কাঁচামালের যোগান সুরক্ষা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য কর্তৃক ইরাকের ওপর চাপিয়ে দেয়া অবরোধের মাধ্যমে। ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী এ সকল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, যাকে ভ্যাটিকান 'উচ্ছৃঙ্খলতা' নামে অভিহিত করেছে, তা ১৫ লক্ষ সাধারণ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে যার মধ্যে ৫ লক্ষই শিশু। একটি মেডিকেল জার্নাল 'The Lance' এ প্রকাশিত স্বতন্ত্র আমেরিকান ও ইরাকী চিকিৎসকদের দ্বারা পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায় ২০০৬-এর জুনের মধ্যে ৬ লক্ষাধিক ইরাকী সহিংস মৃত্যুর শিকার হয়েছে। এতে বলা হয়েছে ৩১ শতাংশের মৃত্যু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বাহিনীর হাতে এবং ২৪ শতাংশ সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও আত্মঘাতি হামলায়।

স্বশাসিত ব্রিটিশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ORD -এর ২০০৭ -এর শরৎকালীন গবেষণার হিসাব মতে দশ লক্ষাধিক ইরাকী হত্যা করা হয়েছে এবং প্রায় একই সংখ্যক আহত হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে আরো দেখা যায় যে, বাগদাদে প্রায় প্রতি ২টি পরিবার অন্তত একজন সদস্য হারিয়েছেন। Human Rights Watch -এর তথ্যমতে সাদ্দাম হোসেন তাঁর ২৩ বছর শাসনামলে ২,৯০,০০০ সাধারণ ইরাকীর মৃত্যুর জন্য দায়ী।

২০০৭ এর শরৎপরবর্তী সময়ে ইরাকে সংঘর্ষের ফলে মৃত্যুর হার কমে এসেছে, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের রক্ষণশীল হিসাব মতে ৬০০০-এরও অধিক সাধারণ ইরাকী এখনও প্রতি মাসে যুদ্ধের ডামাডোলে প্রাণ হারাচ্ছে।

গত দু'শ বছর ধরে কোনো মুসলিম রাষ্ট্র পশ্চিমা বিশ্বে কখনই কোনো আক্রমণ চালায়নি। অপরদিকে ইউরোপীয় পরাশক্তিবর্গ এবং যুক্তরাষ্ট্র সবসময়ই আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে কিন্তু কখনই আক্রান্ত হয়নি। ঔপনিবেশিক যুগের শুরু থেকে লক্ষ লক্ষ সাধারণ আরবকে হত্যা করা হয়েছে এবং হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্বের অবস্থান সুস্পষ্টভাবেই তার মিত্রদের মধ্যে শীর্ষে। আনুপাতিক হিসাবে যা ১ এর বিপরীতে ১০ এরও অধিক। বর্তমান কালের মুসলিম বিশ্বের সহিংসতার প্রতি ঝোঁক প্রবণতার বিতর্ক ঐতিহাসিক সত্যের সাথে ঠাট্টা মাত্র। পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিম বিশ্বের তুলনায় অধিক সহিংস ছিল এবং এখনও আছে। আমাদের বর্তমান কালের সমস্যা মুসলিম বিশ্বের সহিংসতা নয়, বরং তা কতিপয় পশ্চিমা রাষ্ট্রের হিংসাত্মক আচরণ।

মুসলিম চরমপন্থা বুঝতে হলে আমাদের এক মুহূর্তের জন্য হলেও উচিত একজন মুসলমানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ পৃথিবীকে দেখার চেষ্টা করা। আমাদের দৃষ্টিসীমাই পৃথিবীর শেষ প্রান্ত নয়। একজন মুসলমান তরুণ যে টেলিভিশনের সংবাদগুলোর খোঁজ রাখে, সে প্রতিনিয়তই দেখতে পাবে কিভাবে মুসলিম নারী ও শিশুরা পশ্চিমা অস্ত্র, তাদের মিত্র ও তাদের সৈন্যদের দ্বারা ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, লেবানন, সোমালিয়া বা অন্য কোথাও নিহত হচ্ছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আরব সভ্যতা যা এক সময় সামরিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে সুউচ্চ অবস্থানে ছিল Hans Magnus Entensberger তার ক্ষয় ও পতনের ব্যাপারে ভ্রূ-কুঞ্চিত করে গবেষণায় মগ্ন হওয়াটা আমাদের মহান পশ্চিমা দার্শনিকদের জন্য অযথা ছিদ্রান্বেষণের সমপর্যায়ভুক্ত। বরং পশ্চিমাবিশ্ব নিজেই এ অবস্থা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে এসেছে; তারা উপনিবেশগুলোকে লুটপাট করে ধ্বংস করেছে এবং তারপর সেগুলোকে ছেড়ে এসেছে। ১৮৩০ সালে আলজেরিয়ায় যখন উপনিবেশীকরণ শুরু হয় তখন সেখানে শিক্ষিতের হার ছিল ৪০ শতাংশ যা ছিল ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের চাইতেও অধিক। অপরদিকে ১৯৬২ সালে যখন দখলদার ফরাসী বাহিনী প্রত্যাহার করা হয় তখন সে হার ছিল ২০ শতাংশেরও নিচে। উপনিবেশবাদ আরব বিশ্ব থেকে শতবর্ষের অধিক কালের অগ্রগতিকে হরণ করেছে। ফ্রান্স কর্তৃক আলজেরিয়া দখলের সতের বছর পর টক ভাইল অত্যন্ত দুঃখের সাথে উল্লেখ করেছেন 'সকল আলো নিভিয়ে ফেলা হয়েছে... আমরা মুসলিম সমাজকে আরও অধিক দুর্দশাগ্রস্ত, বিশৃঙ্খল, অজ্ঞ ও বর্বর জাতিতে পরিণত করেছি'।

থিসিস ২ : পশ্চিমা নিপীড়ন মুসলিম চরমপন্থা গড়ে ওঠার সহায়ক।

পশ্চিমা উপনিবেশবাদ পৃথিবীর প্রায় সকল অংশেই দুর্বার হানা দিয়েছে। কিন্তু তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে তা কখনও থামেনি; এ অঞ্চলকে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্রভাবে পৃথক করেছে এবং সন্ত্রাসবাদের সূতিকাগারে পরিণত করেছে।

সন্ত্রাসবাদ কোনো মুসলিম সমস্যা নয়; বরং তা বৈশ্বিক সমস্যা। এটা সবসময়ই ছিল এবং সবধরনের আন্দোলনেই তা ব্যবহৃত হয়েছে। ইয়াহুদী বসতি স্থাপনকারীদের হত্যাকারী আবর সন্ত্রাসীদের পাশাপাশি যায়নবাদী সন্ত্রাসী সংগঠনসমূহও সক্রিয় ছিল; যেমন মেনাচেম বেগিন-এর নেতৃত্বাধীন ইরগুন এবং আইজাক শামির-এর নেতৃত্বাধীন ফাইটার্স ফর ফ্রিডম অব ইসরাইল; যারা নিজেদেরকে সন্ত্রাসী হিসাবে অভিহিত করেছে। তারা স্বাধীন ইসরাইলের জন্য সন্ত্রাসী কর্মপন্থা ব্যবহার করে লড়াই করেছে, এমনকি সাধারণ মানুষ, ব্রিটিশ ও আরবদের বিরুদ্ধেও।

বর্তমান কালের সন্ত্রাসবাদের বিতর্কে একথা প্রায়শই বলা হয় যে, 'সকল মুসলমান সন্ত্রাসী নয়, কিন্তু সকল সন্ত্রাসীই মুসলমান' তা নিতান্তই ভ্রান্ত। ২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বর এর পূর্ব পর্যন্ত শ্রীলংকায় তামিল টাইগারকে তর্কাতীতভাবে পৃথিবীর ভয়ংকরতম সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করা হতো। তারা হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে এবং আত্মঘাতী হামলাকে পেশাদারিত্ব ও নিপুণতা দান করেছে। যা পরবর্তীকালে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নকল করা হয়েছে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে। এখন পর্যন্ত তারা বোমা হামলা এবং হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। এ সংগঠনটির সদস্যরা হিন্দু, তারা মুসলমান নয় এবং তারা যাদেরকে হত্যা করছে তারাও পশ্চিমা নয়। আর এ কারণে তাদের হামলার বিস্তারিত বর্ণনা প্রকাশিত হয় না। ২০০৬ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক যে ৪৮টি সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকা করা হয়েছে তার মধ্যে ৩৬টিরই

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইসলামের সাথে কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। এ সকল 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী', 'পুঁজিবাদ বিরোধী', 'ভারতীয় বিরোধী' অথবা 'সিংহলী বিরোধী' সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া ও সাব-সাহারার আফ্রিকান দেশগুলোতে অগণিত সাধারণ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। পশ্চিমা বিশ্বে জনসচেতনতার জন্য এ বিষয়গুলো তেমন গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয় না। যেহেতু তারা যাদেরকে হত্যা করে তারা আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের কেউ নয়।

উপনিবেশবাদী শাসনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির পর ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো আর্থিক ও সামরিকভাবে নির্ভরশীল পুতুল সরকার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে এবং ভূ-রাজনৈতিক খেলায় পশ্চিমা পরাশক্তিবর্গের দাবার গুটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যারা সে খেলায় অংশগ্রহণ করেনি তাদেরকে শাসানো হয়েছে যে, একটি জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত তার নিজস্ব পথ নির্বাচনের অধিকার রাখে যতক্ষণ তা পশ্চিমা স্বার্থের সাথে সংঘাতের সৃষ্টি না করে। স্বাধীনতার অর্থ কখনও এটা ছিল না যে, তারা আমাদের পক্ষ থেকেও স্বাধীন। কেউ এটাকে ইরানের 'Lex Mossadeq' নামে অভিহিত করতে পারেন, প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেক এর স্মরণে, যিনি ১৯৫১ সালে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং দুই বছরের মাথায় সিআইএ ও ব্রিটেন কর্তৃক অপসারিত হন।

যখনই কেউ এ নীতির বাইরে কাজ করেছে তখনই তাকে কোনো অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করা হয়েছে অথবা মিডিয়ার নানাবিধ সুপরিকল্পিত প্রচারণার মাধ্যমে 'দুর্বৃত্ত' সিল সেঁটে দেয়া হয়েছে।' 'খলনায়ক' সৃষ্টি করতে মিডিয়ার ব্যবহার পশ্চিমা পররাষ্ট্রনীতির একটি বিশেষত্ব। গাদ্দাফির উদাহারণ দেখে যা মনে হচ্ছে 'দুর্বৃত্ত' উপাধিটি যে কোনো সময়ই উঠিয়ে নেয়া হতে পারে।

এমনকি সাদ্দাম হোসেন যার উপাধি 'সহযোগী' থেকে 'দুর্বৃত্ত'তে রূপান্তরিত করা হয় হয়ত আজ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারতেন যদি তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী হিসাবে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। দুজাইল হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় ২৬ বছর আগে ১৯৮২ সালে যাতে ১৪৮ ব্যক্তি নিহত হয় এবং পরিণামে সাদ্দামকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। সে সময় সাদ্দাম ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মধ্যপ্রাচ্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়, যিনি খোমেইনীর ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। ডোনাল্ড রামসফেল্ড যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত হিসাবে ১৯৮৩ সালে সাদ্দামের সাথে দেখা করেন, যদিও তাকে দুজাইল সর্ম্পকে বিস্তারিত আগেই জানানো হয়। আসলে সর্বোপরি সাদ্দাম ছিলেন আমাদের ইসলামী মতবাদ বিরোধী কমরেড-ইন-আর্মস, যাকে জার্মানী কর্তৃক রাসায়নিক অস্ত্রের উপকরণ, ফ্রান্স কর্তৃক বোমারু বিমান এবং যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরানী অবস্থানসমূহের স্যাটেলাইট তথ্য সরবরাহ করা হয়। মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমা বিশ্ব কখনই মানবাধিকার বা গণতন্ত্রের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখায়নি; বরং তা ছিল তেলের জন্য যুদ্ধ এবং এখনও তা-ই আছে।

মানবাধিকারের নামে প্রতারণাপূর্ণ মানবাধিকার লঙ্ঘন যা ইরাক, আফগানিস্তান ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের রক্তাক্ত প্রতিচ্ছবি প্রতিনিয়ত প্রমাণ উপস্থাপন করে যাচ্ছে– মুসলমানদের সাংস্কৃতিক স্মৃতিতে এক গভীর ও বেদনাদায়ক ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। স্যামুয়েল হান্টিংটন অন্ততপক্ষে একটি বিষয়ে সঠিক ছিলেন : 'পশ্চিমা বিশ্ব তার চিন্তাভাবনা, মূল্যবোধ ও ধর্মীয় উৎকর্ষ দ্বারা পৃথিবীকে জয়

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করেনি, বরঞ্চ তারা তা করেছে তাদের সংঘটিত সহিংসতা প্রয়োগের উৎকর্ষ দ্বারা'। পশ্চিমারা প্রায়শই এ সত্যটি ভুলে যান, কিন্তু অ-পশ্চিমারা কখনই তা ভোলে না।' কী করে মুসলিম বিশ্ব আমাদের মূল্যবোধ, মানবীয় মর্যাদা, আইনের শাসন এবং গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা স্থাপন করবে যদি তারা দেখে যে, এটা হচ্ছে আমাদের জন্য নিপীড়ন, অপমান ও স্বার্থসিদ্ধির একটি উপায়! এটা কি আসলেই অবাক হওয়ার মতো কোনো বিষয় যে, চরমপন্থীরা দিন দিন অধিকতর সমর্থন অর্জন করেছে? অথবা যখন তাদের পরিবারগুলো আমাদের বিধ্বংসী ব্যবস্থার শিকারে নিহত হওয়ায় যখন প্রত্যাঘাত করে তখনও কি আবাক হওয়ার কিছু আছে? কেউ-ই আসলে সন্ত্রাসী হয়ে জন্মায় না।

এসব সত্ত্বেও পশ্চিমা দর্শনার্থীদের প্রতি যে অনুগ্রহ ও আতিথেয়তা প্রাচ্যের দেশগুলো প্রদর্শন করে তা আবেগে আপ্লুত করার মতোই। যে কেউ কোনো সমস্যা ছাড়াই ধর্ম নিরপেক্ষ সিরিয়ার, এমনকি ধর্ম শাসিত ইরানের ধর্মীয় সিনাগগ, চার্চ এবং মসজিদে ভ্রমণ করতে পারেন। অধিকাংশ মুসলমানই ইয়াহুদী ও খ্রিস্ট ধর্মের প্রতি আমাদের চেয়ে অধিক শ্রদ্ধা পোষণ করেন।

পশ্চিমা মিডিয়া কর্তৃক অংকিত মুসলিম বিশ্বের ছবি প্রকৃত অবস্থা থেকে অনেক দূরে। পশ্চিমা টেলিভিশনের সম্প্রচারকগণ পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে জড়ো হওয়া দাঙ্গাকারীদের একটি স্বনির্মিত ও বিকৃত ছবি উপস্থাপন করে। ২০০১ এর সেপ্টেম্বরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার পর অনেক টেলিভিশন স্টেশন উল্লাসরত ফিলিস্তিনী শিশুদের দেখিয়েছে। কিন্তু সে ধারণকৃত দৃশ্যটি ছিল মঞ্চায়িত। ইসরাইলী সংবাদপত্র হারিৎজ এর প্রতিবেদন বলছে, ঐ শিশুগুলোর মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছিল যাতে তারা ক্যামেরার সামনে উল্লাস করে। আরবের 'স্বতঃস্ফূর্ত' পশ্চিমা-বিরোধী মিছিলগুলো তখনই দেখা যায় যখন তাদের পশ্চিমা সম্প্রচারকদের সহযোগিতায় সতর্কতার সাথে সংগঠিত করা হয় ও তা মঞ্চায়িত হয়। যখনই কাজ শেষে ক্যামেরা বন্ধ করা হয়, এ সকল টিভি মিছিলকারীদের কিছু বখশিশ দেয়া হয় এবং যে ট্রাকে করে তারা এসেছিল তাতে করেই তাদেরকে বাড়ি পৌঁছে দেয়া হয়। পশ্চিমা বিশ্বের সাথে বিপরীতক্রমে জেনোফোবিয়া (বিদেশীদের ব্যাপারে অহেতুক ভয়) মুসলিম বিশ্বে একটি অপরিচিত বিষয়। আমরা হয়ত অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে এ সকল রাষ্ট্রের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছি, কিন্তু মানবিক দিক থেকে নয়, যখন প্রতিবেশীর প্রতি দয়া ও ভালোবাসা, পারিপার্শ্বিক ও আতিথেয়তার অনুভূতির মতো বিষয়গুলো সামনে আসে তখন আমরা মুসলমানদের কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখতে পারি।

এ সৌহার্দ, যেমনটি ইরাকে ঘটেছে, ক্রোধোন্মত্ততায় পরিবর্তিত হতে পারে যেখানে পশ্চিমা বিশ্ব এতদসত্ত্বেও ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে মুসলমানদের অধিকার পদদলিত করছে। জাঁ পল সার্ত্রে ১৯৬১ সালে আলজেরিয়ার স্বাধীনতার যুদ্ধকালে এ ধরনের আত্মবিধ্বংসী হতাশার বর্ণনা দিয়েছেন :

> 'যদি চেপে রাখা এ উন্মত্ত ক্রোধ বেরিয়ে আসার কোনো পথ খুঁজে না পায়, তবে তা শূন্যতায় রূপ নেয় যার মাধ্যমে অত্যাচারিত নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে ফেলে। নিজেদের মুক্তির জন্য এমনকি তারা নিজেদের মধ্যে হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হয়। যেহেতু তারা প্রকৃত শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে না তাই ভিন্ন ভিন্ন গোত্র তখন নিজেদের মধ্যে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

> সংঘর্ষ শুরু করে, আর তাদের এ সংঘর্ষ অব্যাহত রাখার জন্য ঔপনিবেশিক নীতির ওপর আপনি পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন, সহিংসতার এ উত্তাল তরঙ্গ সব বাধাই ভাসিয়ে নিয়ে যায়... । আমাদের কর্মকাণ্ডগুলো বুমেরাং হয়ে ফিরে আসার এটাই সে সময়; এটা হচ্ছে সহিংসতার তৃতীয় স্তর যা আমাদের দিকে ফিরে আসে এবং আমাদেরকে আঘাত করে। আর বরাবরের মতোই আমরা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হই যে, তা আমাদেরই সৃষ্ট ।'

ইরাকীদের সে সুযোগ দেয়া গেলে তারাও হয়তো আমাদের মতো 'মহৎ, সদয় ও ভালো' হতে পারত, তাদের সবকিছুই 'আগ্রহী জোট' (Coalition of the willing) কেড়ে নিয়েছি। তারা (আগ্রহী জোট) তাদের সকল রাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংস করে দিয়েছে, আর তাদের সম্মান ও আত্মমর্যাদাকে পদদলিত করেছে এবং পদ্ধতিগতভাবে ইরাকীদেরকে একে অপরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে। এটা পাশ্চাত্যের এমন এক ভণ্ডামী যে, তারা তাদের কৌশলের কর্যকারিতা দেখে 'অভিভূত' হয় অথচ কোনো কোনো ইরাকীর হতাশা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাকে আত্মবিধ্বংসী করে তোলে। এটা নিছক ফালতু দাবি যে, 'এ ধরনের কোনো কিছু আমাদের এখানে কখনই ঘটত না'। প্রায়শ উচ্চারিত এ দাবির মধ্যে এক ধরনের জাতিগত ঘৃণা ও বিদ্বেষের সুর খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু এতটুকু বিবেচনা করাই যথেষ্ট যে, ১৯৭৭ সালে নিউ ইয়র্কে কিছু সময়ের জন্য বিদ্যুতের অনুপস্থিতি এবং ২০০৫ এ নিউ অর্লিন্সের প্রবল ঝড়ে কী ধরনের ব্যাপক লুটতরাজ হত্যা ও হাঙ্গামার সূচনা করেছিল। 'মানুষ মানুষের শিকার', (Thomas Hobbes) এ কথা সত্য, আর তা শুধু মুসলমানদের ক্ষেত্রে নয়, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রেও তা একই ।

থিসিসি ৩ : ইসলামের ছদ্মবেশ ধারণকারী সন্ত্রাসীরা খুনী, কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে আগ্রাসী যুদ্ধ পরিচালনাকারী খ্রিস্ট ধর্মের মুখোশধারীদের ক্ষেত্রেও তা সত্য ।

মধ্য-নব্বই থেকে পশ্চিমা স্থাপনাগুলোতে আরব সন্ত্রাসীদের যে হামলা শুরু হয় তা তাদের দৃষ্টিতে পাশ্চাত্যের আব্যাহত 'সংঘটিত লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডে'র জবাব। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারসহ এ সকল আক্রমণে ৫০০০ পশ্চিমা নাগরিক নিহত হয়েছে এবং তা নৈতিকভাবে সর্বৈব অগ্রহণযোগ্য। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে কোনো ধরনের কর্মপন্থা নির্বাচনের কোনো বৈধতা নেই। এ কারণেই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার বিষয়টি সকল মুসলিম রাষ্ট্র, সিরিয়া, ইরান এবং এমনকি হিজবুল্লাহ্ ও হামাস কর্তৃক নিন্দিত হয়। অনেক মুসলিম দেশে বিষন্ন ও ক্ষুব্ধ মানুষ আমেরিকার দূতাবাসগুলোর সামনে ফুল রেখে সমবেদনা জানিয়েছে। যেসব সন্ত্রাসী নিরীহ মানুষ হত্যা করে তারা মুক্তিযোদ্ধা নয়– প্রতিরোধ যোদ্ধা, খোদার সৈনিক বা শহীদও নয়। তারা স্রেফ্ খুনী ।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কিন্তু যে সকল ব্যক্তি অবৈধ আগ্রাসী যুদ্ধের পরিকল্পনার নায়ক তারাও কি সন্ত্রাসী ও খুনী নয়? তারা কি, এমনকি, তাদের সৈনিকদেরও হত্যাকারী নয়? কেউ যদি আলকায়েদা কর্তৃক ৫০০০ পশ্চিমা ব্যক্তির হত্যার বিষয়টি উত্থাপন করেন তাহলে তার কি জর্জ ডব্লিউ বুশের অবৈধ যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ ইরাকীর হত্যার বিষয়টিও উত্থাপন করা সমীচীন নয়? যে আইনী মানদণ্ড আমরা সাদ্দাম হোসেন ও স্লোবোদান মেলোসেবিচের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি সেই একই মানদণ্ড কি পাশ্চাত্য সরকার প্রধানদের বেলায়ও প্রযোজ্য নয়? কেনো পশ্চিমা এলিটদের এ প্রশ্নটুকুও উপস্থাপনের সাহস হয় না যে, মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে ইরাকে যুদ্ধ করার জন্য জর্জ ডাব্লিউ বুশ ও টনি ব্লেয়ারকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে হাজির করানো যায় কিনা? ন্যুরেমবার্গ যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের মতানুযায়ী আগ্রাসী যুদ্ধের সূচনা শুধু একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ নয়, 'এটি হচ্ছে সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক অপরাধ যা অন্যান্য যুদ্ধাপরাধ থেকে আলাদা– যেহেতু তা যুদ্ধকালে সংঘটিত সম্মিলিত সকল অন্যায় ও অপরাধের ধারণকারী'। প্রধান মার্কিন প্রসিকিউটর রবার্ট এইচ. জ্যাকসন বলেন :

> 'আমাদের কখনই ভুলে গেলে চলবে না যে, যে দলিলের ওপর ভিত্তি করে আমরা আজ আপরাধীদের বিচার করছি তা পরিণত হচ্ছে আগামী কালের দলীলে যার ওপর ভিত্তি করে ইতিহাস আমাদের বিচার করবে'।

পিটার উস্তিনভ এর মতে 'আগ্রাসী যুদ্ধ হচ্ছে ধনীর সন্ত্রাস।' বোমার আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন একটি ইরাকী শিশুর জন্য 'ইসলামিক' আত্মঘাতি বোমাবাজ ও 'খ্রিস্টীয়' বোমা কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে না। সে শিশুর কাছে জর্জ ডব্লিউ বুশ বা টনি ব্লেয়ার, আমাদের কাছে বিন লাদেনের মতো একই রকম সন্ত্রাসী।'

সামরিক অভিযানে অধিক সংখ্যক সাধারণ জনগণের আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি এ যুক্তিতে এড়িয়ে যাওয়া হয় যে, এ ধরনের 'আনুষঙ্গিক ক্ষতি' ইচ্ছাকৃত নয়। এটা এক ধরনের কপটতা, অন্তত বিমান আক্রমণের ক্ষেত্রে। কেননা, এ সকল ক্ষেত্রে বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যুতে নীরব সম্মতি থাকে। যদিও উন্নত আইনী ব্যবস্থায় নীরব সম্মতি মানে হলো 'ইচ্ছাকৃত', অধিকন্তু আকাশ থেকে বোমাবাজি খুব কমই ফলদায়ক। ভূমিতে বিশেষ বাহিনীর অভিযান সাধারণত অধিক কার্যকর। কিন্তু সেক্ষেত্রে নিজের দলে অধিক সংখ্যক সৈন্যের হতাহতের ঘটনা মেনে নিতে হয় এবং তার প্রতিক্রিয়া ভোটপ্রাপ্তির ওপর গিয়ে পড়ে। তাই সেক্ষেত্রে গুচ্ছবোমা ফেলে সাধারণ নাগরিকের মৃত্যুকে নীরবে মেনে নেয়া হয়। বিমানের নিরাপদ ককপিট থেকে গুচ্ছবোমা বর্ষণ হচ্ছে শক্তিধরদের কাপুরুষোচিত সন্ত্রাস। সম্মানিত যুদ্ধের পৌরকাহিনী হচ্ছে মানবজাতির সবচেয়ে বড় মিথ্যা। 'Dulce bellum in Experstis' – যুদ্ধ তাদের কাছে আমোদের, যাদের সে অভিজ্ঞতা হয়নি'।

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী অবৈধ যুদ্ধ ও দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ কেবল তখনই আইনসিদ্ধ হয় যদি তা সশস্ত্র সংঘর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মানবিক আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। ভিন্ন বিশ্বাস পোষণকারী জনসাধারণের ওপর আত্মঘাতী হামলা, সেটা ইরাকে হোক বা অন্য

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কোথাও তা সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড। এর সাথে বৈধ প্রতিরোধের কোনো সম্পর্ক নেই। ইরাকে সাধারণ জনগণের ওপর সবচেয়ে দৃষ্টি আর্কষণকারী হামলাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাইরে থেকে করা হয়েছে। ১১ জুলাই ২০০৭ এ ইরাকে নিয়োজিত বহুজাতিক বাহিনীর মুখপাত্র জেনারেল বার্গনারের প্রকাশিত বক্তব্য অনুযায়ী ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী ইরাকের বাইরে থেকে আসে। আমাদেরকে বিদেশী দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে বৈধ আত্মস্বীকৃত প্রতিরোধ এবং সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রায় অর্ধেক বিজাতীয় সন্ত্রাসের বিপরীতে পরিষ্কার ভেদ রেখা টানতে হবে। ইরাকীদের কাছ থেকে কেউই তাদের প্রতিরোধের অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। এটা হচ্ছে মানুষের সময়নিরপেক্ষ অলঙ্ঘনীয় এক অধিকার। ইরাকী জনগণের বৃহৎ অংশ এ প্রতিরোধ আন্দোলনকে সমর্থন করে যারা স্পষ্টতই সাধারণ মানুষের ওপর হামলাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং প্রতিরোধ শুধু সুন্নী ও শিয়াদের কেউই অন্তর্ভুক্ত করেনি; রবং তা খ্রিস্টানদেরকেও শামিল করেছে। আল কায়েদা যোদ্ধাদের চেয়ে ইরাকে খ্রিস্টান প্রতিরোধী যোদ্ধাদের সংখ্যা অধিক। মহিলারাও ইরাকী আত্মস্বীকৃত প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে। আর এতে কি আসলে আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছু আছে? আমাদের রাস্তাগুলোতে যদি শত্রুসেনার ট্যাংক নিয়োজিত থাকত তাহলে আমরা কি করতাম? আমাদের পক্ষের প্রতিরোধী যোদ্ধারাই শুধু 'মক্তিযোদ্ধা' আর বাকীরা সব 'সন্ত্রাসী'?...

নিশ্চয়ই মহাত্মা গান্ধী অথবা মার্টিন লুথার কিং এর অহিংস আন্দোলনের প্রেরণা, এমনকি বৈধ সহিংস আন্দোলনের ক্ষেত্রেও বিবেচনার দাবি রাখে। মদিনার ধর্মীয় যুদ্ধে যখন তার শত্রুদেরকে অবাক করে দিয়ে মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীরা তাদের অস্ত্র সংবরণ করে পবিত্র শহরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন তখনই মুহাম্মাদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়টি অর্জিত হয়। বিশ্বাসের শক্তিতে বলীয়ান পরোক্ষ প্রতিরোধ ইরাকী আন্দোলনকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলত। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমরা কি পৃথিবীকে এই শিক্ষাই দেইনি যে, কেবল নিষ্ঠুর শক্তি প্রয়োগ সাফল্যের নিশ্চয়তা বিধান করে?

থিসিস ৪ : মুসলমানরা পূর্বে এবং এখনও নিদেনপক্ষে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের মতোই সহনশীল। পশ্চিমা সভ্যতায় তাদেরও অবদান রয়েছে।

'পবিত্র যুদ্ধের' উদ্ভাবনকারীরা মুসলমান ছিল না যারা ঐশী ইচ্ছার জিগির তুলে ক্রুসেডে যোগ দিয়ে চল্লিশ লক্ষ মুসলমান ও ইয়াহুদীর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। যারা আমাদের রক্ষাকর্তা যিশুর সমাধি ক্ষেত্রে প্রার্থনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এসেছিল তারাও মুসলমান ছিল না। সে সময়ের প্রতিবেদনে যেমন বলা হয়েছে– তারা আনন্দের আতিশয্যে উল্লাস ও কান্না শুরুর পূর্বে জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিল গোড়ালি সমান রক্ত বইয়ে দিয়ে। ইসলাম কখনই 'পবিত্র' শব্দটি যুদ্ধের সাথে সংযুক্ত করে না। জিহাদ মানে হচ্ছে 'স্রষ্টার পথে কঠোর প্রচেষ্টা চালানো' (হান্স কুং) এবং সে প্রচেষ্টা কখনও প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধকে অন্তর্ভুক্ত করে। কুরআনের কোথাও জিহাদকে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

'পবিত্র যুদ্ধ' এ অর্থ প্রদান করা হয়নি। যুদ্ধ কখনওই পবিত্র হতে পারে না, কেবল শান্তি হচ্ছে পবিত্র। দুঃখজনকভাবে 'পবিত্র যুদ্ধ'-এর ধারণাটি ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে নেয়া (দেখুন জেরেমিয়াহ-৫১ : ২৭)

যারা আফ্রিকা ও এশিয়ায় উপনিবেশকরণের নামে ৫ কোটি মানুষের হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল তারাও মুসলমান ছিল না। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যাতে ৭ কোটি মানুষ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, তার ইন্ধনদাতা ও মুসলমানরা ছিল না এবং মুসলমানরা নয়, বরং আমরা জার্মানীতে ৬০ লক্ষ ইয়াহুদী সঙ্গী, নাগরিক, বন্ধু ও প্রতিবেশীকে কলংকজনকভাবে হত্যা করেছি যা ছিল সভ্যতার ওপর অধ্যবসায়ের সাথে সুসংগঠিত এক আঘাত। পাশ্চাত্য সভ্যতার চেয়ে অন্য কোনো সংস্কৃতিই বিগত শতাব্দীগুলোতে এত অধিক মাত্রায় সহিংস ও রক্তপিপাসু ছিল না। তথাকথিত খ্রিস্টান রাজনীতিকরা খ্রিস্টধর্মের মতো এত চমৎকার ভালোবাসাপূর্ণ ধর্মের প্রতি কবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন?

এ কথা কারও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ৭ম থেকে ১৭শ শতকের মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি একই সময়ে ইউরোপীয় শক্তির মতোই মূলত অস্ত্রের মাধ্যমে ঘটেছে। মুসলিম পক্ষেও অমার্জনীয় হত্যাযজ্ঞের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু মুসলমান বিজেতারা খ্রিস্টান ও ইয়াহুদীদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেনি কিংবা তাদের বহিষ্কার বা নিশ্চিহ্নও করে দেয়নি। যখন সালাউদ্দিন কঠিন যুদ্ধের পর ১১৮৭ সালে পুনরায় জেরুজালেম জয় করেন তখন তিনি পূর্ণ রূপে প্রতিশোধ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং দরিদ্র খ্রিস্টানদের মুক্তিপণ মওকুফ করেন। খ্রিস্টান ও ইয়াহুদীদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন মুসলিম সভ্যতার বিধান ও গৌরব ছিল। মুসলিম শাসনে সকল খ্রিস্টান ও ইয়াহুদী নিজেদের ধর্মেই বহাল ছিল যেখানে 'খ্রিস্টীয়' যাজক কর্তৃক বিচারে ভিন্ন বিশ্বাস পোষণকারীদের আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হতো।

যখন মুসলিম সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদ ৭১১ সালে আইবেরিয়ান উপদ্বীপে পদার্পণ করেন, তখন সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক বিকাশের এক নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটে যা সাত শতাব্দীরও অধিককাল টিকে থাকে এবং পশ্চিমা সভ্যতায় ব্যাপক অবদান রাখে। ইউরোপের সবচেয়ে আধুনিক অবস্থায় মুসলিম, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের সহাবস্থান একটি অতুলনীয় সাফল্যকে প্রমাণ করে। ইয়াহুদীরা খ্রিস্টান আধিপত্যের অধীনের চাইতে মুসলিম শাসনাধীনে অধিকতর ভালো অবস্থায় ছিল। অ্যারাগানের খ্রিস্টান রাজা ফার্ডিনান্ড কর্তৃক স্পেনে মুসলমানদের শেষ দুর্গ গ্রানাডা অধিকার ১৪৯২ সালে তাঁর রিকনকুইস্তা (Reconquista) সম্পন্নের পরে ইয়াহুদীদের নির্দয়ভাবে বহিষ্কার করা শুরু হয়। লক্ষ লক্ষ ইয়াহুদীকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। বহু শতাব্দী ধরে ইয়াহুদীরা তাদের সমসাময়িক মুসলমানদের সাথে সম্মান, উচ্চপদ লাভ করে এসেছে এবং শান্তিতে বসবাস করেছে। তাই অধিকাংশ ইয়াহুদীই ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোতে পালিয়ে যায়। খ্রিস্টান, ইয়াহুদী ও মুসলমানের সহাবস্থান ১৯শ ও ২০শ শতাব্দীতে কেবল ঔপনিবেশিকতার ও জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে সমস্যা সংকুল হয়ে ওঠে। তুরস্কে আর্মেনীয় হত্যাকাণ্ডের দুঃখজনক ঘটনা ছিল জাতীয়তাবাদের ফসল, কোনো ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ফল নয়। আলোকিত আন্দালুসিয়া যুগে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মুসলমানরা আমাদের জন্য হারিয়ে যাওয়া গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতি ও দর্শনই শুধু উদ্ধার করে আনেনি, তারা নতুন নতুন বিজ্ঞানেরও জন্ম দিয়েছে। তারা ছিল গবেষণালব্ধ আলোক বিজ্ঞানের প্রবর্তক, কম্পাস, গ্রহসমূহের পথপরিক্রমা এবং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ঔষধের বহু গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য বিষয়ের আবিষ্কারক। আমরা বিশ্বাস করি বা না করি আমরা এমন এক সংস্কৃতিতে বাস করি যা ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম কর্তৃক সগঠিত হয়েছে।

থিসিস ৫ : স্রষ্টার প্রতি এবং প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা পোষণ, শুধু বাইবেলেরই নয়, কুরআনেরও কেন্দ্রীয় নির্দেশনা।

মূলপাঠের পারস্পরিক তুলনা এ কথাই প্রমাণ করে যে, কুরআন নিদেনপক্ষে ওল্ড নিউটেস্টামেন্টের মতো একই রকম সহনশীল। স্রষ্টা এবং তাঁর নবিগণ দৃঢ়তা প্রদর্শনের জন্য তিনটি ঐশী গ্রন্থেই কখনও কখনও সামরিক স্বরে নিজেদেরকে প্রকাশ করেছেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের বুক অব নাম্বরস ৩১ : ৭, ১৫, ১৭ তে বলা হয়েছে : 'তারা মাদায়েনবাসীর সাথে যুদ্ধ করেছিল, যে রকমটি প্রভু মূসাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সকল পুরুষ লোককেই হত্যা করেছিল... 'মূসা তাদেরকে বললেন, তোমরা কি সকল স্ত্রী লোককে বেঁচে থাকার অনুমতি দিয়েছ? সুতরাং এখন তোমরা শিশুদের মধ্য থেকে ছেলেদেরকে হত্যা করো এবং সকল নারীকে হত্যা করো যারা কোনো পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে।'

নিউ টেস্টামেন্ট-এর ম্যাথিউ ১০ : ৩৪ এ যিশু বলেছেন : 'মনে করো না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি, আমি শান্তি আনয়নের জন্য আসিনি। কিন্তু একই তলোয়ারের নিয়ে এসেছি'। শক্তিশালী বাগ্মী প্রটেস্ট্যান মার্টিকন লুথার তাঁর Table Talk বইয়ে বলেন : 'কেউ হয়তো বিরুদ্ধ ধর্মমত পোষণকারীকে সামান্য সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পারে, একদিকে যখন তারা আগুনে জ্বলে ধ্বংস হয়ে যাবে তখন বিশ্বাসীদের উচিত বিশপ এবং পোপের রক্তে তাদের হাত ধুয়ে সকল পাপের মূলোৎপাটন করা।'

কুরআনের সূরা ৭৪ (মুদ্দাসসির)-এর ৮৯ নং আয়াত কম জোরালো ও প্রচণ্ড নয় : 'তারা চায় তারা যেমন অবিশ্বাস করছে, তোমরা তেমনি অবিশ্বাস করো এবং তাদের সবাই আল্লাহ্‌র পথে গৃহত্যাগ না করা পর্যন্ত কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেখানেই পাও তাদেরকে গ্রেফতার করো এবং হত্যা করো।' উগ্রপন্থী এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঘৃণা প্রচারকারীরা অধিকাংশ সময়ই এ সকল উদ্ধৃতির ঐতিহাসিক প্রসংগ উপেক্ষা করেছেন। মূসা, যীশু এবং মুহাম্মাদ কোনো ঐতিহাসিক শূন্যতার ভিতর জন্মগ্রহণ করেননি, রবং তাঁরা জন্মেছিলেন একটি যুদ্ধবিগ্রহসংকুল পৃথিবীতে। প্রাথমিক দৃষ্টিতে ওল্ডটেস্টামেন্টের বিশেষত ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিগুলো, তিনটি পবিত্র গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক রক্তাক্ত বলে মনে হয়, কুরআনের তুলনায়ও তা অধিক। কিন্তু যিনি ওল্ডটেস্টামেন্ট ভালোভাবে পড়েছেন, তিনি জানেন যে, স্রষ্টা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ভালোবাসা ছাড়াও এর নির্দেশনা হচ্ছে 'তুমি তোমার প্রতিবেশীকে তোমার নিজের মতোই ভালোবাসবে।' (লেভিটিকাস ১৯ : ১৮) খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেও স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসার পর প্রতিবেশী ও ন্যায়বিচারের প্রতি ভালোবাসা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। (ম্যাথিউ ৫ : ৬, ৫ : ১০)

কুরআন মুসলমানদেরকে 'প্রতিবেশী ও পথচারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে' এ নির্দেশনা দেয় [সূরা ৪ (নিসা) : ৩৬]। কুরআন 'অধিকতর মানবতা ও ন্যায়বিচারের' প্রতি আহ্বান জানায়। (হ্যান্স কুং)

কুরআন নিয়ে পশ্চিমা বিতর্কের মূল সমস্যা হচ্ছে সবাই এ বিষয়ে আলোচনা করে থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই তা পড়ে দেখেছে। কুরআনের মারমুখী বক্তব্যগুলো মক্কা মদীনার ধর্মযুদ্ধের সময়কার এবং কেবল ঐ সময়ের মক্কা-মদীনার জনগণের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমনটি মিশরীয় ধর্মমন্ত্রী মাহমুদ যাকযৌক সঠিকভাবেই নির্দেশ করেছেন।

সূরা ২৯ (আনকাবুত) : ৪৬-এ বলা হয়েছে : 'আমাদের প্রভু ও তোমাদের প্রভু এক'। যদিও স্রষ্টাকে হিব্রুতে জেহোভা এবং আরবিতে যা খ্রিস্টানরাও আল্লাহ বলে থাকে। সুতরাং যে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলমানরা এই এক স্রষ্টার ব্যাপারে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেয়ার জন্য বাইবেল ও কুরআনকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে তা কি সাংঘাতিক ধর্মবিরুদ্ধতা নয়? সন্ত্রাসবাদ কখনই ধর্মীয় নয়। সন্ত্রাসী হওয়ার জন্য শয়তানী উপায়-উপকরণ গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে, স্রষ্টার কাছে সাহায্য প্রার্থনার দরকার পড়ে না। 'ইসলামিক' সন্ত্রাস বলে কিছু নেই। যেমনটি উত্তর আয়ারল্যান্ডের আইআর-এর সন্ত্রাস কোনো 'খ্রিস্টান' বা 'ক্যাথলিক' সন্ত্রাস নয়। কিছু সন্ত্রাসবাদ আছে যা ইসলামী মুখোশ চাপায় যা তাদেরকে স্বর্গের পরিবর্তে নরকের দিকেই পরিচালিত করে আর খ্রিস্টান ও গণতান্ত্রিক মুখোশ আঁটা আগ্রাসী যুদ্ধগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সবকিছুর উর্ধ্বে ধর্মের ওপর সহিংসতার দায় চাপানোর দাবি একটি নাস্তিক্যবাদী পৌরাণিক কাহিনী। ধর্মের অস্তিত্বের আগে থেকে মানুষ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে এসেছে এবং তখন থেকেই তা অব্যাহত আছে। ন্যাশনাল সোশালিস্ট এবং সেভিয়েত ও চীনা কম্যুনিস্টদের গণহত্যা দুঃখজনকভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে নিষ্ঠুর জীব– সে ধার্মিক হোক কিংবা অধার্মিক।

থিসিস ৬ : মুসলিম বিশ্বের প্রতি পাশ্চাত্যনীতি. এমনকি অতি সাধারণ বিষয়গুলোও শোচনীয় রকমের অজ্ঞতা দ্বারা আক্রান্ত।

পানশালার কক্ষে বসে কৌশল প্রনয়ণকারীদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় উক্তি হচ্ছে, 'যে কেউ আমাদের শহরে মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে চায় তার উচিত সে যেন তেহরানে চার্চের ঘণ্টাধ্বনি শোনার অধিকার দাবি করে।' তথাপি বাস্তবতা হচ্ছে তেহরানে ৩৪টি চার্চে নিয়মিত ঘণ্টা বাজে এবং খ্রিস্টান শিশুরা তাদের নিজ ধর্মের দিক নির্দেশনা লাভ করে। তেহরানে ৭টি সিনাগগ রয়েছে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এবং ৪০০ ইয়াহুদী শিশু ইয়াহুদী স্কুলে পড়াশুনা করে। সেখানে ছয়টি কোশার (ইয়াহুদী ধর্মের বিধান সম্মত) কসাইখানা, দু'টি কোশার রেস্টুরেন্ট এবং একটি ইয়াহুদী হাসপাতাল রয়েছে যেখানে নিন্দিত ও সংকট সৃষ্টিকারী মাহমুদ আহমাদীনেযাদ সম্প্রতি কিছু আর্থিক সাহায্য করেছেন। খ্রিস্টানদের মতোই ২৫০০০ ইয়াহুদীর পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব লাভের সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। ১৯৭৯ সালে বিপ্লবের পর আয়াতুল্লাহ্ খোমেইনী এমন একটি ফতওয়া জারি করেন যে, ইয়াহুদীদের সুরক্ষা দিতে হবে। ইরানের বহু সিনাগগের দেয়ালে তাঁর সে বাণী অংকিত রয়েছে : 'আমরা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম্মান করি, তারা আমাদের জনগণের অংশ। ইসলাম তাদের ওপর অত্যাচার অনুমোদন করে না।' প্রাচীনকাল থেকেই ইয়াহুদী এবং পারসিকদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮ এ পারস্যের রাজা মহান সাইরাস ইয়াহুদীদেরকে ব্যাবিলনীয় বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করেন। বাইবেলে তাঁকে অভিহিত করা হয়েছে 'প্রভুর প্রিয় এবং মনোনীত মেষপালক বলে'। একথা সত্য যে, ইরানে সুরক্ষিত সংখ্যালঘু হিসাবে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা মুসলমানদের মতো সমান রাজনৈতিক অধিকার লাভ ও দায়িত্ব পালন করে না। কিন্তু আমরাও কি ইউরোপে মুসলমানদের ক্ষেত্রে খ্রিস্টান ও ইয়াহুদীদের মতো একই অধিকার স্বীকার করে থাকি? ইসরাইল কি দৈনন্দিন জীবনে সত্যিকারভাবে তার সঙ্গী আরব নাগরিকদের ইয়াহুদী নাগরিকদের মতোই অধিকার প্রদান করে?

আহমাদীনেযাদ প্রকৃতপক্ষে একটি বিদ্বেষপূর্ণ 'যায়নবাদবিরুদ্ধ' ও ইসরাইলবিরোধী মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তাঁর এ আগবাড়ানো মনোভাব ইয়াহুদীদের প্রতি ঘৃণা বা ইয়াহুদী বিদ্বেষের সাথে মিলিয়ে ফেলা উচিত নয়। গোঁড়া ইয়াহুদীরা, যেমন হেসিডিক সাতমার (Hesidic Satmer) ত্রাণকর্তার পুনরাবির্ভাবের পূর্বে ইসরাইলী রাষ্ট্র প্রত্যাখ্যান করে এবং ফলে তারাও 'যায়নবাদ বিরোধী' অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে।

ইরান বা অন্য কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে ইউরোপের মতো রাষ্ট্র কর্তৃক ইয়াহুদী বিদ্বেষ বা ইয়াহুদী নির্যাতনের প্রকৃত কোনো ঘটনা কখনও ঘটেনি। নাজি যুগে বহু ইউরোপীয় ইয়াহুদী ইরানের মধ্য দিয়ে পালিয়ে বেঁচে গিয়েছে। ইরানে ইয়াহুদীরা সম্মানিত নাগরিক। তেহরানের ইয়াহুদী হাসপাতালের ইয়াহুদী পরিচালক সিমাক মোরসাযেঘ যেমনটি বলেন : 'ইয়াহুদী বিদ্বেষ কোনো ইসলামিক ঘটনা নয়, বরং তা ইউরোপীয় আচরণ'।

মুসলিম বিশ্বের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের অজ্ঞতা ইরান সমস্যার চেয়েও অতি সাধারণ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও প্রমাণিত। উদাহরণস্বরূপ ইউরোপে ব্যাপক প্রচলিত ধারণাটি এই যে, স্কার্ফে মাথা ঢাকার বিষয়টি আসলে নারীদের প্রতিবাদী চিৎকার অথবা তা নারীর প্রতি নির্যাতনের প্রতীক। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র অনেক বেশি সহনশীল। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের মন্তব্য হচ্ছে মাথার স্কার্ফ নিষিদ্ধকরণের মতো অসহনশীল আচরণ অ-আমেরিকান এবং তা সামাজিকভাবে নিন্দনীয়।'

জার্মান সাপ্তাহিক ডিজিত (Diezeit) ধর্মযুদ্ধের (Crusade) ওপর উপহাসচ্ছলে মন্তব্য করতে গিয়ে ইউরোপকে মাথার স্কার্ফ মুক্ত করতে বলেছে! 'আপনি যদি পাঁচজন মুসলমান মহিলাকে জিজ্ঞাসা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করেন, কেনো তারা মাথায় স্কার্ফ ব্যবহার করেন, আপনি পাঁচ রকমের উত্তর পাবেন। একজন তা করেন স্রষ্টার জন্য, অপরজনের কাছে তা তাঁর এইচ অ্যান্ড এম এর ফ্যাশনেবল পোশাকের সাথে মানানসই, তৃতীয়জন উত্তর দেবেন তিনি একজন প্রচণ্ড নারীবাদী। চতুর্থজন তাঁর গ্রামের ঐতিহ্য তুলে ধরবেন। পঞ্চমজন হয়তো তাঁর অতি সেক্যুলার মায়ের বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করবেন, যিনি তাঁকে স্কার্ফ পরতে বাধা দেন। কাউকে মাথায় স্কার্ফ পরতে বাধ্য করা নিঃসন্দেহে অগ্রহণযোগ্য, কিন্তু কারো মাথা থেকে স্কার্ফ খুলে নিতে বাধ্য করা কি একইভাবে অগ্রহণযোগ্য নয়?

বিবাহে বাধ্য করা, স্ত্রীর খতনা অথবা অনৈতিক কাজের জন্য দলগতভাবে অভিযুক্তকে হত্যার মতো বিষয়গুলো বিতর্ক ও শোচনীয় মাত্রার অজ্ঞতা দ্বারা পরিচালিত। কুরআন বা মুহাম্মাদের হাদীসের কোথাও এসব অগ্রণযোগ্য স্ত্রীদ্বেষী বিষয়ের কোনো উল্লেখ নেই, এর উৎপত্তি পুরুষশাসিত বর্বর যুগে। এসব রীতির কিছু কিছু কয়েক হাজার বছরের পুরোনো, যেমন প্রাচীন মিশরীয় স্ত্রীর খত্না। এই বর্বর অঙ্গচ্ছেদ কেবল মিশর ও সুদানের মতো মুসলিম দেশেই সংঘটিত হয় না, খ্রিস্টানপ্রধান ইথিওপিয়া ও কেনিয়ায়ও তা চর্চিত হয়। মুসলমান, খ্রিস্টান, ইয়াহুদী, ফালাশা ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও এ নির্যাতনের শিকার। তথাকথিত অনৈতিক কাজে অভিযুক্তকে দলগতভাবে হত্যা দুঃখজনকভাবে খ্রিস্টানদের মাঝেও খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা এবং ভেনিজুয়েলার মতো খ্রিস্টান দেশে। অধিকাংশ মুসলিম সরকার এ সকল দুঃখজনক প্রাক-ইসলামী ও অনৈসলামিক রীতি ও অপরাধের বিরুদ্ধে সঠিক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

কিছু সংখ্যক মুসলিম রাষ্ট্রে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতি পাশ্চাত্যের চেয়েও অধিক। মিশরে অধ্যাপকদের মধ্যে ৩০ শতাংশ নারী। ইরানে মোট শিক্ষার্থীর ৬০ শতাংশেরও অধিক নারী যা কিছু গোঁড়া-রক্ষণশীলদের পুরুষদের জন্য আলাদা কোটা ব্যবস্থার চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। পাশ্চাত্যের তুলনায় অনেক মুসলিম রাষ্ট্রেই মহিলা রাষ্ট্রপ্রধানের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে।

এতদসত্ত্বেও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে নারীর পূর্ণ ও সমমর্যাদা লাভের জন্য অনেক কিছুই করার রয়েছে। যা-ই হোক না কেনো, সেটা ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো সমস্যা নয়। সমস্যাটি রাজনৈতিক এবং সেকেলে পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত। পাশ্চাত্যে বারংবার আক্রমণের শিকার নারীদের আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যাপক সংখ্যাধিক্য এ কথাই প্রমাণ করে যে, এখানেও নারীর প্রতি সহিংসতা একটি দুঃখজনক সামাজিক সমস্যা, এখনও যার কোনো সমাধান হয়নি।

ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতার পরিসমাপ্তি টানতে চাইলে আগে নিজের অজ্ঞতাকে জয় করতে হবে। প্রত্যেকের তার নিজস্ব মতামত পোষণের অধিকার রয়েছে; কিন্তু সত্যের প্রতি ভিন্নমত পোষণের কোনো অধিকার নিশ্চিতভাবেই তার নেই। কী এমন বিষয় আমাদের সিরিয়া অথবা ইরান ভ্রমণ করে নিজস্ব মতামত গঠনে বিরত রেখেছে? দামেস্ক এবং ইরানের রাস্তাগুলো নিউইয়র্ক অথবা ডেট্রয়টের রাস্তাগুলোর চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ। জাতিসংঘের ২০০৬-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১,০০,০০০ অধিবাসীতে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ৫.৯, ইরানে যার হার ২.৯৩ এবং

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সিরিয়ায় ১.৪ । অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে নিরাপদ, এমনকি সুইজারল্যান্ডের চেয়েও যেখানে প্রতি ১,০০,০০০ অধিবাসীর মধ্যে উক্ত হার ২.৯৪ ।

আমরা কেনো আমাদের ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলে আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ শুরু করিনি, কেনো মুসলিম ও খ্রিস্টান ছাত্র বিনিময়ের কোনো কার্যক্রম শুরু করি না এমনকি ইসরাইলের সাথে? কেনো আমরা চমৎকার আরবি সাহিত্য সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা করি না । অথবা আলোকিত যুগের বিখ্যাত জার্মান লেখক গথহোল্ড এফ্রেইম লেসিং এর Nathan The Wise এ Ring Parable পড়ে দেখি না? একজন পিতা (স্রষ্টা) তাঁর সন্তান (ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম) যাদেরকে তিনি একই রকম ভালোবাসতেন, তিনটি একই রকমের আংটি দিয়ে যান । এর মধ্যে একটি আংটি আসল যা তার মালিককে স্রষ্টা ও মানবতার দৃষ্টিতে সুখ ও কল্যাণ এনে দিতে পারে । বাকী দু'টি নকল । সকল ভাই মিলে একজন বিচারকের কাছে যায় কোন্ আংটিটি আসল তা জানার জন্য । বিচারক সোলায়মানের প্রজ্ঞা দ্বারা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন যে, প্রকৃত আংটির মালিক সে যে তার সংগীদের ভালোবাসা অর্জন করতে পারে ।

জার্মান চ্যান্সেলর এঙ্গেলা মার্কেল-এর কাছে এ নাটকের সবচেয়ে সুন্দর উদ্ধৃতি হচ্ছে, যখন মুসলিম সালাহউদ্দিন ইয়াহুদী নাথানকে আহ্বান জানায় : 'আমার বন্ধু হও' । আমরা সবাই কি এই প্রাচীন সেফারডিক ইয়াহুদী রূপক কাহিনী থেকে এবং এতে বর্ণিত ধর্মসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার স্বপ্ন থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি না?

থিসিস ৭ : মুসলিম বিশ্বের সাথে পাশ্চাত্যের আচরণ, অবশ্যই ইসরাইলের সাথে তার আচরণের মতোই হওয়া উচিত । মুসলমানরা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের মতো একই রকম গুরুত্বপূর্ণ ।

পাশ্চাত্যের অনেকেই নিজেদের নির্ভুলতা, অজ্ঞতা এবং ঘৃণার সংমিশ্রণে উৎপন্ন চিন্তাধারা থেকে ইসলামকে একটি রক্তপিপাসু ধর্ম এবং মুসলমানদেরকে সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হিসাবে ধরে নেন যারা গণতন্ত্র, নারী, ইয়াহুদী এবং খ্রিস্টানদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন । যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের বন্ধু এবং আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা, ফ্রংক গ্রাহাম ইসলামকে অত্যন্ত অশুভ ও মন্দ ধর্ম হিসাবে অভিহিত করেছেন । আমেরিকান রক্ষণশীলদের জনপ্রিয় টিভি ব্যক্তিত্ব বিল ও রেইলি মন্তব্য করেছেন : 'আমরা পুনরায় মুসলিম বিশ্বের ঝামেলায় জড়াতে পারি না । আমরা যা পারি তা হচ্ছে বোমা মেরে তাদের বেঁচে থাকার আলো নিভিয়ে দিতে' । আমেরিকান টিভি আলোচক এ্যান কোলটার মনে করেন : 'আমাদের উচিত তাদের দেশগুলো আক্রমণ করা, তাদের নেতাদের হত্যা করা এবং তাদেরকে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা' । তিনি আরও বলেন : 'মুসলমানদের সাথে আমরা হয়তো ৯/১১ পরবর্তী ফালতু ভালো ব্যবহারের প্রতিযোগিতা বাদ দিয়ে এ মুহূর্তে আমাদের যা করা দরকার তাতে মনোনিবেশ করতে পারি : সিরিয়াকে বোমা মেরে প্রস্তর যুগে ফিরিয়ে আনতে পারি

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এবং তারপর ইরানকে চিরস্থায়ী রূপে অস্ত্রহীন করতে পারি।' এ ধরনের বক্তৃতা-বিবৃতির তালিকা সীমাহীনভাবে দীর্ঘ করা সম্ভব।

এক মুহূর্তের জন্য ভেবে দেখুন গ্রাহাম ও রেইলি অথবা কোলটার যদি 'ইসলামের' পরিবর্তে 'ইয়াহুদী ধর্ম' এবং 'মুসলিম রাষ্ট্রের' বিপরীতে 'ইসরাইল' উচ্চারণ করতেন তবে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যেত এবং সেটাই স্বাভাবিক। কেনো মুসলমান এবং তাদের ধর্মের প্রতি কোনো ফ্যাসিস্ট মন্তব্য মেনে নেয়া হবে এবং তা খ্রিস্টান ও ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে হলে অগ্রহণযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করা হবে? ইসলাম ও মুসলমানদেরকে দানবীয় রূপদানের এ প্রচেষ্টা আমাদের বন্ধ করতে হবে। এটা শুধু নিন্দনীয়ই নয় তা আমাদের স্বার্থের জন্যও ক্ষতিকারক।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অব্যাহত গভীর বিভক্তি ইসরাইলের নিরাপত্তাকেও বিপদসংকুল করে তুলছে। ইসরাইল এবং তার ৫০ লক্ষ ইয়াহুদীর নিরাপত্তার সর্বাধিক দৃঢ় নিশ্চয়তা শত্রুতা নয় রবং তার পার্শ্ববর্তী ও দূববর্তী ৩০ কোটি আরব অধিবাসীর সাথে বন্ধুত্ব। তা অর্জনের জন্য পাশ্চাত্য এবং ইসরাইলকেও ন্যায়সংগত অবদান রাখতে হবে। ইয়াহুদী জনগোষ্ঠী তাদের নৈতিক গরিমা সামরিক বিজয় অথবা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃতী ও পারদর্শী সদস্যের কারণে অর্জন করেনি; রবং তা তারা অর্জন করেছে ধার্মিকতা, প্রজ্ঞা, মানবিকতা, উদ্ভাবনী শক্তি এবং একই সাথে ন্যায়বিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের দীর্ঘ সাহসী এবং প্রায়শ চতুর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এটা বোধগম্য যে, হলোকাস্টের পরে ইসরাইল তার সামরিক শক্তি নিশ্চিত করা এবং তার স্বার্থ রক্ষায় আশ্রয় নিয়েছে সক্রিয় শক্তি ও কঠোরতার, কিন্তু ন্যায়বিচারহীন কঠোরতা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য। ইসরাইল কেবল ধ্বংসই করতে জানে তাহলে সে নিজেকেও ধ্বংস করে ফেলবে। অবশ্যই ইসরাইল এবং সমগ্র পাশ্চাত্যকে নিদেনপক্ষে অস্ত্রের পিছনে বিনিয়োগকৃত সমপরিমাণ অর্থ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ করতে হবে। ফিলিস্তিনী জনগণের সাথে যে ব্যবহার করা হচ্ছে তা ইয়াহুদী জনগণের নৈতিক গুণ ও উৎকর্ষের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়– ইয়াহুদী সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণকারী কোনো ব্যক্তির পক্ষে কেবল এ উপসংহারেই পৌঁছা সম্ভব।

ফিলিস্তিনীদেরও তাদের নীতির পরিবর্তন করতে হবে। পাশ্চাত্য সঠিকভাবেই এ দাবি তুলতে পারে যে, তারা ইসরাইলের বিরুদ্ধে তাদের আচরণ পরিত্যাগ করবে। কিন্তু তাহলে তাদের কি এ দাবি উত্থাপন করাও উচিত নয় যে, ইসরাইল ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা পরিত্যাগ করবে? ইসরাইলের মানবাধিকার সংস্থা বি'সোলেম এর তথ্যমতে ২০০৭ সালে ইসরাইল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্বে ১৩ জন ইসরাইলী নিহত হয় অপরদিকে ইসরাইলী নিরাপত্তা রক্ষীরা ৩৮৪ জন ফিলিস্তিনীকে হত্যা করে।

ইয়াহুদী ও আরবের মধ্যকার সমঝোতা জার্মানী ও ফরাসীদের মধ্যকার অবিশ্বাস্য সমঝোতার মতোই সম্ভবপর। অধিকাংশ মানুষ যেমন মনে করে ইয়াহুদী ও আরবের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে তার চেয়েও অধিক পারস্পরিক অংশীদারিত্ব রয়েছে। যেমন ইসরাইলী

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

প্রেসিডেন্ট শিমন পেরেজ বলেছেন যে, তাঁদের রয়েছে একই পিতা, ইবরাহীম ও মূসা। বহু শতাব্দী ধরেই ইয়াহুদী এবং আরবরা নির্যাতিত হয়েছে এবং তা শুধু ক্রুসেড ও রিকনকুইস্তার সময়ই নয়। ফ্রান্সের সরকার ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে তার জাতিবিদ্বেষী বৈষম্যমূলক নীতি প্রয়োগ করেছিল যা তারা পূর্বে আলজেরীয়দের ওপর 'সফলভাবে' পরীক্ষা করেছিল (Oliver Le Cour Grandmaison) ।...

আমাদের বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষত সারিয়ে তোলার জন্য সহযোগিতা করা এবং তা অর্জনে ইউরোপকে ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দৃঢ় সামরিক সহায়তা প্রদান করতে হবে এবং একই সাথে একটি কার্যকর ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়ও সহযোগিতা দিতে হবে। আমাদেরকে সেতু রচনা করতে হবে– দেয়াল নয়।

পাশ্চাত্যের সমর্থনে একটি মডেল ফিলিস্তিন রাষ্ট্র যা তার সীমান্তে ইসরাইলের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেবে[১] এবং সকল ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করবে– তা পাশ্চাত্য ও মুসলিম বিশ্বের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নব সূচনা ঘটাতে পারে। আমরা আমাদের বর্তমান পথে আর চলতে পারি না। মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তান এবং ইরাকে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে' ইতিমধ্যে ৭০০ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে যা ভিয়েতনাম যুদ্ধের চেয়েও বেশি। যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে যুদ্ধের পিছনে প্রতি বছর একশ বিলিয়ন ডলার খরচ করে, অথচ অর্থনৈতিক সংস্কারে ব্যয় করে ৫ বিলিয়ন ডলারেরও কম। এ হিসাবের পরিপ্রেক্ষিতে, আন্তরিকতার সাথে কি এ প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় যে, বর্তমানে 'সন্ত্রাসবিরোধী' নীতির একটি সফল ব্যবস্থা কেমন হতে পারে? আমাদেরকে আসলে অনুপাতের এ হিসাবটাকে উল্টে দিতে হবে। মুসলিম বিশ্বের সাথে আমাদের আচরণ ন্যায় ও উদারতার সাথে হতে হবে। যেমনটি আমরা সঠিকভাবেই ইসরাইলের সাথে করে থাকি। আর এভাবে পরিণামে আমাদেরকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে তার পক্ষাবলম্বনের সকল অজুহাত থেকে বঞ্চিত করতে হবে।

থিসিস ৮ : মুসলমানদেরকে অবশ্যই তাদের নবী মুহাম্মাদের মতোই সহনশীল ইসলামের অধ্যবসায় চালাতে হবে। তাদেরকে সন্ত্রাসবাদের মুখ থেকে ধর্মীয় মুখোশ খুলে ফেলতে হবে।

মুহাম্মাদ সামাজিক পরিবর্তনের জন্য অত্যন্ত দরদের সাথে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি দ্ররিদ্র ও দুর্বলদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর অনেক পুরুষ সঙ্গীর অসন্তুষ্টি উপেক্ষা করে নারী অধিকারের ব্যাপক উন্নতি সাধনে অগ্রবর্তী হয়েছেন, যারা প্রাক্-ইসলামী যুগে প্রায় সকল কৃষ্টির অধীনেই ন্যূনতম অধিকারও ভোগ করতো না। যে পুরুষরা নারীর ওপর অত্যাচার চালায় তারা মুহাম্মাদের অথবা কুরআনের সমর্থন পেতে পারে না।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আমাদের ইয়াহুদী পূর্বপুরুষরা ইবরাহীম, মূসা, রাজা সোলায়মান, বাইবেলের বক্তব্য অনুযায়ী যাঁর এক হাজার পত্নী ও উপপত্নী ছিল; তাদের মতোই মুহাম্মাদও কয়েকজন নারীকে বিবাহ করেছিলেন যাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ইয়াহুদী এবং অপরজন খ্রিস্টান। মুহাম্মাদ তাঁর সঙ্গী সাথীদের এ বলে সাবধান করেছেন : 'যে কেউ কোনো ইয়াহুদী বা খ্রিস্টানের সাথে অন্যায় আচরণ করবে শেষ বিচারের দিন আমাকে তার মোকাবিলায় দেখতে পাবে।' মুহাম্মাদ গোঁড়াও ছিলেন না, চরমপন্থীও ছিলেন না। তিনি তাঁর সময়কার ঈশ্বরবাদী আরবদের, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের স্রষ্টার প্রকৃত ও অবিকৃত ধারণা দিতে চেয়েছিলেন। কুরআন আংশিকভাবে অনেকটা বাইবেলের মূল বক্তব্যের চমৎকার পুনরাবৃত্তি : 'এর পূর্বে মূসার গ্রন্থ ছিল পথপ্রদর্শক ও অনুগ্রহস্বরূপ এবং এ গ্রন্থ (কুরআন) যা আরবি ভাষায়, মূসার গ্রন্থের সমর্থক।' [সূরা ৪৬ (আহকাফ) : ১২] মুসলমানদের জন্য কুরআন হচ্ছে 'নবতর টেস্টামেন্ট'।

৬২৮ খ্রিস্টাব্দে মক্কা নগরীর আত্মসমর্পণের পর মুহাম্মাদ কাবায় প্রবেশ করেন এবং সকল মূর্তি ধ্বংস করেন, যেমনভাবে ঈসা গীর্জা পরিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তিনি শ্রদ্ধাবশত যীশু ও তাঁর মাতা মরিয়মের মূর্তিতে হাত দেননি, কেননা, তাঁরা উভয়ই তাঁর কাছে ছিলেন নিষ্পাপ ও পবিত্র। মুহাম্মাদ বহুবার প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, শেষ বিচারের পূর্বে ঈসা পুনরায় আগমন করবেন। 'তোমরা কতই না আনন্দিত হবে যখন মারিয়ম-পুত্র ঈসা তোমাদের সামনে আসবেন'। ঈসা ও মারিয়মকে কুরআন অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে 'মানবজাতির জন্য নিদর্শন' [সূরা ২১ (আম্বিয়া) : ৯১] হিসাবে উল্লেখ করেছে। কুরআন ইয়াহুদীদের মহান নবীদেরকে বিশেষ করে মূসাকে তাদের নবী হিসাবে গণ্য করে। 'কোনো মুসলমান যে মুহাম্মাদের পূর্ববর্তী নবী মূসা ও ঈসাকে বিশ্বাস না করে, সে আসলে মুসলমান নয়' (মাহমুদ যাকযৌক)।

আজকের সন্ত্রাসবাদ মুহাম্মাদের শিক্ষার উদ্ভট বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলামের বিরুদ্ধে এটি একটি অপরাধ। ইসলাম অর্থ স্রষ্টা ও শান্তির প্রতি আত্মসমর্পণ। মুসলিম বিশ্ব হয়তো তাদের মহান ও গর্বিত ধর্ম এবং এর মানবতা ও ন্যায়বিচারের বৈশিষ্ট্যসমূহকে উন্মত্ত ও ঘৃণ্য সন্ত্রাসীদের দ্বারা কলংকিত হতে দেবে না। মুসলমান বেশধারী সন্ত্রাসীদের চেয়ে চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসে আর কেউই ইসলামের অবস্থানের ওপর এত বড় ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। মুসলিম বিশ্বকে অবশ্যই সন্ত্রাসীদের ধর্মীয় মুখোশ টেনে ছিঁড়ে ফেলতে হবে মুহাম্মাদ কর্তৃক প্রাক-ইসলামী যুগের মূর্তি ধ্বংসের মতো। আজকে তাদের সন্ত্রাসবাদের মূর্তি বিনাশ করতে হবে।

থিসিস ৯ : পাশ্চাত্যের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' মতো অন্য আর কিছুই সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করে না। মুসলিম দেশসমূহকে মৌলবাদী ইসলামের সাথে তাদের সমস্যা নিজেদেরই সমাধান করতে হবে।

আমাদেরকে অবশ্যই পাশ্চাত্যের আগ্রাসী যোদ্ধাদের মুখোশও উন্মোচন করতে হবে। আগ্রাসী যুদ্ধ শুধু অনৈতিকই নয়; বরং তা সন্ত্রাসবাদের সাথে লড়াই করবার একেবারেই নিম্নবুদ্ধির পরিচায়ক।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইসলামের বেশধারী সন্ত্রাসবাদ একটি মতাদর্শ আর মতাদর্শকে গুলি করে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। এর ভিত্তিকে আগে দুর্বল করতে হবে এবং তা ভুল প্রমাণ করতে হবে।

নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে আল-কায়েদা হামলা শুধু প্রতিশোধমূলক ছিল না, এটা ছিল সুবিধাজনক অবস্থান অর্জনেরও একটি প্রচেষ্টা। কলংকিত ধৃষ্টতা ও তৎপরবর্তী মিডিয়া প্রদর্শনীর মাধ্যমে মৌলবাদী ইসলামপন্থীরা সাধারণ জনগণের সহানুভূতি ফিরে পেতে চেয়েছে। তারা যুক্তরাষ্ট্রকে অতিমাত্রায় কঠোর প্রতিক্রিয়া প্রকাশে প্ররোচিত করেছে যা মৌলবাদী ইসলামে বিপরীতক্রমে গতি সঞ্চার করবে। সে কৌশল যথাযথভাবেই কাজ করেছে। তালেবান শাসনাধীনে ক্লান্ত আফগান জনগণের ওপর নিক্ষিপ্ত অগণিত বোমা তাদেরকে মৌলবাদী ইসলামের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে এবং তা নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে পুনর্জাগরিত করেছে। আফগান জনগণ যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব ও পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক সৃষ্ট তালেবান ও আল-কায়েদার হাত থেকে নিশ্চিত রূপেই মুক্তি পেতে চেয়েছিল। কিন্তু সেজন্য অসংখ্য সাধারণ নাগরিককে বোমা মেরে হত্যা করার কোনো যৌক্তিকতা তারা খুঁজে পায়নি।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আক্রমণকারী কোনো সন্ত্রাসীই আফগানিস্তান বা ইরাকের ছিল না। তারা এসেছিল জার্মানী, সৌদী আরব এবং মিশর থেকে; কাবুলে বোমা বর্ষণ ও তা দখল করার চাইতে আরও অধিক সূক্ষ্ম কৌশলি পদ্ধতি গ্রহণ করে। তাদের সৌদী আরবীয় আদর্শিক নেতা ওসামা বিন লাদেনকে নিষ্ক্রিয় করা যেত যখন হিন্দুকুশ পর্বতমালায় সে পশ্চাদপসরণ করছিল।

ফলে মৌলবাদী ইসলামপন্থীরা বিদেশী-অনুপ্রবেশকারী এবং তাদের পাশ্চাত্যপন্থী কর্তৃত্বশীল সরকারসমূহের বিরুদ্ধে পৃথিবীজুড়ে অস্ত্রধারণের পুনরায় কারণ খুঁজে পেলো। যেমনটি তারা এর আগে ১৯৭৯ সালে করেছিল, যখন সোভিয়েত রাশিয়া সেখানে অনুপ্রবেশ করে।

পৃথিবীব্যাপী মৌলবাদী ইসলামী আন্দোলন, মৌলবাদী বা বামপন্থী অথবা কট্টর ডানপন্থী আন্দোলনসমূহের বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম গ্রহণের অধিকার পাশ্চাত্যের নেই। একটি বিশ্বব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার জন্য পৃথিবীটাকে রক্তাক্ত ও বিশৃংখল যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করার অধিকারও তার নেই।

ইরাক, আফগানিস্তান বা সোমালিয়ায় পাশ্চাত্য সেনাদলের যুদ্ধ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই। মুসলিম দেশসমূহকে মৌলবাদী ইসলামের সাথে তাদের সমস্যা নিজেদেরই মেটাতে হবে। এমনকি যেখানে মৌলবাদী ইসলাম বিচ্যুত হয়ে সন্ত্রাসবাদে পরিবর্তিত হয় সেক্ষেত্রে তা মোকাবিলার প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় বাহিনীর। শুধু চরম ও ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিলের নিরপেক্ষ সম্মতিতে আন্তর্জাতিক বাহিনী অতিরিক্ত শক্তি বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হতে পারে।

অধিকাংশ সময়েই এ ধরনের হস্তক্ষেপ লাভের চাইতে অধিক ক্ষতি সাধন করে থাকে, এমনকি যখন উদ্দেশ্য সৎ এবং মানবিক। শুধু ভালো কাজ করতে 'চাওয়া'ই যথেষ্ট নয়, প্রকৃত অর্থেই তা করতে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হবে। সামরিক উপায়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা যাবে না। তা সে হিন্দুকুশেই হোক অথবা বাগদাদে। জয় করতে হবে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিত ১.৪ বিলিয়ন মুসলমানের হৃদয় যারা খুব কাছ থেকে পাশ্চাত্যের রাজনীতিকে পর্যবেক্ষণ করছে। পাশ্চাতের বোমার আঘাতে প্রতিটি শিশুর মৃত্যুতে সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। একটি করে দিন অতিবাহিত হচ্ছে আর আমরা ক্রমেই আমাদের নীতির ঘোলাজলের অতল তলে হারিয়ে যাচ্ছি।

সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় বিমান যুদ্ধ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেছে। আকাশ থেকে অব্যাহত বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও বিন লাদেন তোরাবোরা পাহাড়ের যে গুহায় লুকিয়ে ছিল বলে ধারণা করা হয়, সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কারণ, সে গুহা ঘিরে থাকা সৈন্য সংখ্যার চেয়ে সাংবাদিক সংখ্যই অধিক ছিল এবং প্রায় একই সময় তালেবান নেতা মোল্লা ওমর আমেরিকান পাতলা সৈন্যসারি ভেদ করে মটরসাইকেলে চড়ে পালিয়ে যায়। হয়ত এমনকি ডন কুইক্সোট (Don Quixote) এর স্রষ্টা সারভান্তেসও এরচেয়ে উদ্ভট হাস্যকর সমাপনী কল্পনা করতে পারেননি।

থিসিস ১০ : এ মুহূর্তে যা দরকার তা হলো দক্ষতাপূর্ণ কূটনৈতিক আচরণ– যুদ্ধের পারঙ্গমতা নয়, বিশেষ করে ইরান, ইরাক ও ফিলিস্তিন সমস্যার ক্ষেত্রে।

বছরের পর বছর ধরে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কর্তৃক তাঁর অপছন্দের রাজনীতিবিদ, যেমন আরাফাত, আসাদ, সাদ্দাম অথবা আহমাদীনেযাদের সাথে সরাসরি আলোচনার বিষয়টিতে শিশুসূলভ অস্বীকৃতি এবং একই সাথে 'ঈশ্বরের সাথে পরামর্শক্রমে' তাদের বোমা মেরে ক্ষমতাচ্যুত করার কৌশল নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এ সময়ের সবচেয়ে উদ্ভট ও বিকৃত মস্তিষ্কের চিন্তা। 'একজন রাজনীতিক যিনি শান্তি স্থাপনে আগ্রহী অবশ্যই তাঁকে বিরোধী পক্ষের রাজনীতিকের সাথে আলোচনা করতে হবে।'-(হেলমুত শ্মিদত, জার্মানির সাবেক চ্যান্সেলর)। যুদ্ধ পরবর্তী দিনগুলোতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংকট সমাধান কেবল এ কারণেই সম্ভব হয়েছিল যে, রোনাল্ড রিগ্যান যাদের 'শয়তানের রাজ্য' বলে অভিহিতি করেছিলেন তাদের শাসকদের সাথে আলোচনায় বসতে কখনও বিতৃষ্ণা বোধ করেননি।

এটা একেবারেই অসত্য যে, ইরান সংকটের ক্ষেত্রে কঠিনতম অবরোধ আরোপ ব্যতীত একমাত্র 'বিপর্যয়কর বিকল্প' হচ্ছে 'ইরানী বোমা দ্বারা আক্রান্ত হওয়া অথবা ইরানে বোমাবর্ষণ করা' (নিকোলাস সারকোজী)। ইরানের মতো কোনো মহৎ জাতির দানবীয় রূপদানের প্রকৃত বিকল্প হচ্ছে অন্যান্য সদস্যের মতোই একই অধিকার ও দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে তাকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে পুনরায় একত্র করা। ইরান সমস্যার মূল কারণ নিহিত, পাশ্চাত্য কর্তৃক একঘরে করে এবং সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে শাস্তি প্রদানের মধ্যে যে শাস্তি তার পাওনা হয়েছে পাশ্চাত্যপন্থী শাহ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার মধ্য দিয়ে, যার ফলে ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের প্রভাব বিনষ্ট হয়েছে। বিষয়টি এমন নয় যে, এ অপ্রীতিকর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। একটি প্রবাদ রয়েছে, 'যদি তুমি তোমার শত্রুকে পরাজিত করতে না পার তবে তাকে গ্রহণ কর।'

মধ্যপাচ্য যে জটিল সমস্যার মোকাবিলা করছে তা কেবল রাজনৈতিকভাবেই সমাধান করা সম্ভব। তাদেরকে সামলানোর সবচেয়ে উত্তম পন্থা হচ্ছে OSCE[২] এর CSCE[৩] অগ্রদূত কর্তৃক গঠনকৃত, সমগ্র অঞ্চলের জন্য একটি দীর্ঘ মেয়াদী আলোচনা এবং সেখানে সিরিয়া, ইরান, ফিলিস্তিনের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি, এবং ইরাকে বৈধ প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতাদেরসহ এ অঞ্চলের সকল গুরুত্বপূর্ণ দেশের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের মতো যদি যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতাদের সাথে আলোচনার টেবিলে বসেন তা হলেই কেবল ইরাক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে আল কায়েদার সাথে তেমন আলোচনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। জাতীয়তাবাদী, বাথপন্থী এবং মধ্যপন্থী ইসলামী দলগুলোর নেতারা এরকম একটি আলোচনায় বসার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন।

১৯৮০-এর দশকের প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বের মতোই, সামগ্রিকভাবে দুরূহ কিন্তু ন্যায়সংগত সমঝোতা বর্তমানের দায়িত্বজ্ঞানহীন যুদ্ধ এবং একই রকম দায়িত্বহীন নিষ্ক্রিয়তার কার্যকর বিকল্প উপস্থাপন করতে পারে। সকল দলই এরকম একটি উদ্যোগ থেকে উপকৃত হবে। যেমনটি OSCE-এর প্রক্রিয়া থেকে ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। দুই বছরের কষ্টসাধ্য আলোচনা থেকে তা পূর্ব ইউরোপের জনগণের জন্য স্বাধীনতা, মানবাধিকার, গণতন্ত্র এবং বর্ধনশীল সমৃদ্ধি বয়ে এনেছে। CSCE প্রক্রিয়া ইউরোপে সামগ্রিক নিরস্ত্রীকরণ, স্বাধীনতা ও সামগ্রিক স্থিতিশীলতা নিয়ে এসেছে। একটিও গুলি না ছুঁড়েই খুনীশত্রু বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। (হ্যান্স দিয়েত্রিচ জেনশার) 'মধ্যপ্রাচ্য CSCE'-এর লক্ষ্যও সেটাই হওয়া উচিত। হয়ত এক সময় এ অঞ্চলে একটি একক অর্থনৈতিক এলাকা বা তার বেশি কিছুও গড়ে উঠতে পারে। ৬০ বছর আগে কে চিন্তা করতে পেরেছিল যে, ইউরোপ একত্র হতে পারবে? রাজনীতির জন্য মহৎ লক্ষ্য নির্ধারণ প্রয়োজন এবং তা মধ্যপ্রাচ্যের জন্যও একইভাবে সত্য।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক সামরিক উৎকর্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব কাপুরুষোচিত আপোস-রফার নীতির বিপরীতে এখনকার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে, তা Neocon Secret হিসাবেই রয়ে যাবে। যদি যুক্তরাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে ভয়ংকর গল্প উদ্ভাবন বন্ধ করে, অথবা যদি সে প্রাকৃতিক সম্পদ হস্তগত করতে বোমা মারা বন্ধ করে কিংবা যে মূল্যবোধের কারণে এক সময় মানুষ আমেরিকার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করতো এবং যে কারণে আবার আমেরিকাকে ভালোবাসতে চাইবে, যদি সেই মূল্যবোধগুলোকে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস করা বন্ধ করে, তাহলে তা কাপুরুষতা হবে না।

কেনো মুসলিম রাষ্ট্র পাশ্চাত্য আথবা ইসরাইলে এমনকি ন্যূনতম সফলতার প্রত্যাশায় আক্রমণ করতে চাইবে যখন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের পরবর্তী আক্রমণের অপরিমিত পারমাণবিক এবং প্রচলিত অস্ত্র রয়েছে? এমনকি যদি ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র থাকত, যদিও তা কখনই কাঙ্ক্ষিত

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নয় তবুও পারমাণবিক কৌশলের মূলনীতি এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতো। যে প্রথমে আঘাত করবে পরবর্তী আঘাতে ধ্বংস হবে। যে-ই যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরাইলে পারমাণবিক বোমা হামলা চালাবে সে নিজেকেই সরাসরি ধ্বংস করে ফেলবে। সংখ্যার দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ২০ মিলিয়ন মানুষ হত্যা করার পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে ৭ কোটি ইরানিকে ৩০০ বার পুড়িয়ে কয়লা বানানো সম্ভব। ইরান তা জানে। এমনকি সেদেশের প্রেসিডেন্টও তা জানেন। তাঁর প্রতিরক্ষা বাজেট যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বাজেটের একশ ভাগের একভাগ। পাশ্চাত্যের বৃহৎ শক্তিবর্গের মতো ইরান গত ১৫০ বছরে অন্য কোনো দেশ আক্রমণ করেনি, যদিও তারা বহুবার আক্রান্ত হয়েছে এবং কখনও কখনও তা পাশ্চাত্যের সহায়তায়। ইরাকের সাথে যুদ্ধে ৪,০০,০০০ ইরানী আহত হয়েছে যার মধ্যে ৫০,০০০ রাসায়নিক অস্ত্রের শিকার। আমরা তাদের সে দুর্দশার জন্য অংশত দায়ী।

ইরান সংকটের সমাধান সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই তার পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে এবং আলোচনার টেবিলে ইরানী নেতৃত্বের সাথে উচ্চ পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসতে হবে অথবা তা হতে পারে মধ্যপ্রাচ্য CSCE-এর কাঠামো অনুযায়ী। পারমাণবিক কর্মসূচিতে যথেষ্ট ছাড় দেয়া এবং ইরাকের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অযাচিত হস্তক্ষেপ বন্ধ করার যাচাইযোগ্য প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তাদেরকে অবশ্যই ইরানের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে হবে। যেমন উত্তর কোরিয়া এবং পরিশেষে লিবিয়ার ক্ষেত্রে দেয়া হয়েছে।

শুধু ইরানের অতিরঞ্জিত পারমাণবিক পরিকল্পনাই নয়, আজকের পারমাণবিক শক্তিধরদের প্রকৃত পারমাণবিক অস্ত্রগুলোও ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা উচিত। যুক্তরাষ্ট্রের সহ সকল পারমাণবিক অস্ত্রই– যেমনটি যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবাজ রাজনীতিক রোনাল্ড রিগ্যান ১৯৮৬ সালে বলেছেন– 'একেবারে অযৌক্তিক, সম্পূর্ণ অমানবিক, হত্যার প্রয়োজন ব্যতীত অর্থহীন এবং পৃথিবীতে জীবন ও সভ্যতা ধ্বংসকারী।' এমনকি ২০০৭ সালে হেনরি কিসিঞ্জার একটি 'পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্বের জন্য সাহসী লক্ষ্যের' পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধ চুক্তি একটি পরিপূর্ণ পারমাণবিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণে আহ্বান জানায়। কিন্তু পারমাণবিক শক্তিধর দেশসমূহ স্থায়ীভাবে সে চুক্তিভংগের দায়ে দোষী।

বিনা আক্রমণে মীমাংসায় পৌঁছানো আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় বিপদ নয়, সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে আরাম কেদারায় বসে থাকা আমাদের দেশপ্রেমী কৌশলবিদগণ যাঁরা এ বিশ্বের ব্যাপারে একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও গুপ্ত জাতিবিদ্বেষ আঁকড়ে আছেন। তাঁরা এ পৃথিবীকে হিংসা ও প্রতিহিংসার এমন এক হটকারী চক্রে গড়িয়ে দিচ্ছেন যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছিল।

মুসলিম বিশ্বের সাথে যথার্থ কৌশল হচ্ছে যুদ্ধবিগ্রহের পরিবর্তে দক্ষ কূটনীতি, সতর্ক, সহিষ্ণু ও সুদৃঢ় আলোচনা যেমন ঘটেছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংকটের সময়। একটি ন্যায়সংগত বিশ্বব্যবস্থায় সন্ত্রাসবাদ টিকে থাকতে পারে না এবং প্রতিষ্ঠা লাভে ব্যর্থ হবে। এক কথায়, আমাদের অবশ্যই

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কঠোরতা ও ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে– সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে কঠোরতা এবং মুসলিম বিশ্বের প্রতি ন্যায়বিচার।

মূল লক্ষ্য হতে হবে এমন একটি বিশ্বব্যবস্থা যা সকল রাষ্ট্র ন্যায়ানুগ হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে। তা এমন এক বিশ্ব যেখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এবং মুসলিম বিশ্বে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে কোনো বৈষম্য থাকবে না, এমন এক বিশ্ব যেখানে কেউ আর একে অপরের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে দানবীয় রূপে উপস্থাপন করবে না, সে বিশ্বে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রসমূহ নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং মিথ্যা প্রচারের কারখানাগুলো বন্ধ করা হবে। সে বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধ ও দমন-নিপীড়নের পরিবর্তে শান্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং সবশেষে তা এমন এক বিশ্ব যেখানে প্রত্যেকে শুধু অন্যের ক্ষুদ্র ত্রুটি নয় নিজের বৃহৎ ত্রুটিগুলোও দেখতে পাবে।

টীকা

১. লেখকের ঐ অবৈধ দাবি কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না।– সম্পাদক
২. Organization for Security & Cooperation in Europe
৩. Organization for Security & Cooperation in Europe

(তেহরান থেকে প্রকাশিত পত্রিকা AL-TAQRIB, Winter 2009/Number 4 সংখ্যা থেকে অনূদিত)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com